প্রকাশ ☐ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ প্রচ্ছদ ☐ অমিয় ভট্টাচার্য

প্রতিভাস-এর পক্ষে রাজেশ সাহা কর্তৃক ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা ৭০
থেকে প্রকাশিত, স্বপন কুমার রায় কর্তৃক সুবোধ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৯ই/এইচ/৬ গোয়াবাগান স্ট্রীট- কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।



ভূমিকা

'সুকুমার রায় ঃ শিল্প ও সাহিত্য' প্রকাশিত হল। আশা ছিল সুকুমার রায়ের জন্মশতবর্ষেই বইখানি প্রকাশ পাবে। কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও তা সম্ভব হয় নি।

একথা আজ আর নতুন করে বলবার দরকার হয় না যে সুকুমার রায় বাংলা সাহিত্যের একজন বিরল ব্যক্তিত্ব। একদা তিনি খ্যাত ছিলেন প্রধানত শিশু অথবা কিশোর পাঠ্য লেখক হিশেবে। সম্ভবত বুদ্ধদেব বসুই প্রথম ব্যক্তি যিনি সুকুমারকে স্থাপন করেছিলেন তাঁর সঠিক ও উপযুক্ত স্থানে। তারপর দিন কেটেছে। সুকুমার সম্পর্কে পাঠকের মনস্কতা ও আগ্রহ ক্রমে গভীর হয়েছে। এখনত তিনি জড়িয়ে গেছেন আমাদের মনন ও আবেগের সঙ্গে। তাঁর আপাত সরল রচনাসমূহের মধ্য দিয়েই যেন আমরা ছুঁতে পারি এক অনন্য তির্যক আধুনিকতাকে।

বর্তমান সংকলনখানিতে সুকুমার রায়ের সেই আধুনিকতাকেই ধরার চেষ্টা করা হয়েছে বিভিন্ন দিক থেকে। তাঁর সৃষ্টিশীলতার নানা পর্যায় ও প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে এ সংকলনে। সর্বাঙ্গীন সুকুমারকে পাঠকদের কাছে পরিবেশনের ইচ্ছে হয়ত পুরোপুরি সফল হয় নি। তবু যথাসাধ্য পূর্ণাঙ্গ করার প্রয়াশ নিশ্চয়ই অলক্ষ্য থাকে নি। একটি বিশেষ পরিকল্পনার বশ্যতা অনুযায়ী প্রবন্ধগুলো সন্নিবেশিত

করার বাসনা ছিল রচনাগত নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করে। কিন্তু স্বভাবতই প্রবন্ধগুলো সংগৃহীত হতে পারে নি আমাদেরই স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের জন্য। সম্পাদক হিশেবে এ ত্রুটি স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য তাঁর রচনাটি শর্তসাপেক্ষে প্রকাশের অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁর সে শর্ত পালন করতে পারি নি বলে ক্ষমাপ্রার্থী।

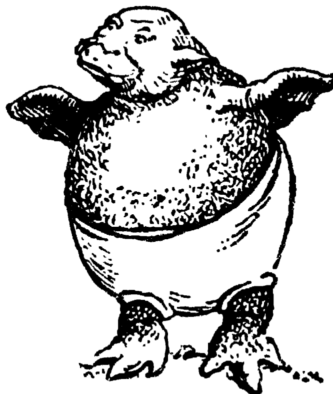
যাঁরা লেখা দিয়ে এ সংকলনখানিকে ধনী করেছেন তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। সংকলনের কাজে আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন অনুজপ্রতিম অধ্যাপক অভ্র ঘোষ। শ্রীঅশোককুমার মিত্র কিছু দরকারি সাহায্য করেছেন। ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণেই এদের প্রতি ঋণী থাকার প্রশ্ন নেই।

বইখানি প্রকাশের ব্যাপারে শ্রীবীজেশ সাহার উদ্যম ও ঝুঁকি নেবার দুঃসাহসকে সাধুবাদ জানাই। প্রধানত তাঁরই আগ্রহ ও উৎসাহে এ বই প্রকাশিত হল। শ্রীমতী মল্লিকার সহযোগিতাও উল্লেখযোগ্য। অলমিতি।

জুলাই ১৯৮৯ বিষ্ণু বসু

শ্রীপ্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের 'অর্থ-অনর্থ' প্রবন্ধের ৩২ নং পৃষ্ঠার ১ম লাইনে 'ভাষা ভাববাহন কার্যেই নিযুক্ত থাকুক; সে আবার চিন্তার আসরে নামিয়া আপনার জের টানিতে থাকিবে কেন?' এই বাক্যটির সঙ্গে নিম্নলিখিত অংশটি পাদটীকা হিসেবে অবশ্যই পড়তে হবে।

'এখানে এ কথাটা বলা জরুরি: শব্দ আর অর্থের সম্বন্ধ বিষয়ে যে-সবল ছকটিকে সুকুমার রায় এ প্রবন্ধে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হিশেবে ধরে নিয়েছেন, সেটা আজকের ভাষাতত্ত্ব আর মানতে নারাজ।'





☐ সূচিপত্র ☐


SR



স্মৃতিচারণ

সুশোভন সরকার

প্রস্তুতিপর্ব ঃ সুকুমার রায়কে খুব কাছ থেকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল যাঁদের আপনি তাঁদের অন্যতম। আমাদের জানতে ইচ্ছে করে, সুকুমার রায় মানুষটি কেমন ছিলেন, কেমন ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব ?

সুশোভন সরকার ঃ ছাত্রদের নিয়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একটা সংগঠন ছিল— 'ছাত্র সমাজ'। তাতাদা ছিলেন তার মধ্যমণি। আমরা ছিলাম তাঁর চেলা। তাতাদা আসলে খুবই serious প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। নিছক 'মজার লোক' বলতে যা বোঝায় তিনি তা ছিলেন না। 'ছাত্র সমাজ'-কে reform করবার জন্য তাতাদা উঠেপড়ে লেগেছিলেন। তখন সমাজের কর্তব্যবিধির মধ্যে সবই ছিল 'না'—থিয়েটার দেখবে 'না', সিগারেট খাবে 'না'—এমনি আরো কত 'না', সব এখন মনেও নেই। তাতাদা আন্দোলন শুরু করে দিলেন—কী কী করব 'না', সে তো বুঝলাম, করব কী কী ? তিনি একটা positive programme দিলেন—সাংস্কৃতিক সমাজসেবামূলক ইত্যাদি কাজের।

তাতাদা তো খুব গম্ভীর লোক ছিলেন, নিজের মজার মজার লেখাগুলোও খুব গম্ভীর হয়ে পড়তে পারতেন। তাতে যেন মজাটা আরো বাড়ত।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে, সমাজের আদর্শের সঙ্গে তিনি নিজেকে একেবারে জড়িয়ে রেখেছিলেন। ওটা তাঁর জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

প্রস্তুতিপর্ব ঃ কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ সম্পর্কে ওঁর ধারণা যে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খেয়েছিল তার কিছু কিছু প্রমাণ এখন পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, ১৯২০'র ২৩শে আগস্ট

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা একটি আট পাতা জোড়া চিঠিতে উনি খুব তীব্র, আবেগময় ভাষায় বলেছেন, এই যে আনন্দের, অমৃতের কথা সর্বদা বলা হচ্ছে, চারপাশে তাকিয়ে এসব কথার কোনো বাস্তব তাৎপর্য তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি বলেছেন যে এই যুগের মানুষের "আশার প্রদীপ নির্বাপিত" হয়ে গেছে, তারা "আশা করতে জানেনা।" তিনি একটা "rampant, morbid pessimism"-এ আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁর সমস্ত 'cherished illusions" ভেঙে পড়ছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, সুকুমার রায় বলছেন যে এই ভাবনা তাঁর "নতুন নয়, অল্পবয়স থেকেই এ চিন্তা রয়েছে"।

শুধু তাই নয়, সত্যজিৎ রায়ের সৌজন্যে সুকুমারের ব্যক্তিগত ডায়েরী—'হর্জিবাজ খাতা'—দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে আমাদের। তাতেও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁর তীব্র মোহভঙ্গের কথা রয়েছে। এক জায়গায় বলছেন, "ideal obscured by false analogies."

এর থেকে কিন্তু সুকুমার রায়ের একেবারে অন্য একটা চেহারা বেরিয়ে আসছে।

সুশোভন সরকার: চিঠিটার কথা সম্প্রতি শুনেছি। ওটা কী উপলক্ষ্যে লেখা?

প্রস্তুতিপর্ব: রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের honorary member হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

সুশোভন সরকার: ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, সমাজে ঐ ঘটনাটা নিয়ে প্রচণ্ড তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ আবার ভাঙে আর কী। তখন বয়স্কদের আর তরুণদের দুটো গোষ্ঠী হয়ে গিয়েছিল। হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, নবদ্বীপচন্দ্র দাস এঁরা সব ছিলেন বয়স্কদের দলে। আর তাতাদা, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এঁরা ছিলেন তরুণ দলের নেতা। তরুণদের পক্ষ থেকে সাধারণত প্রস্তাব উত্থাপন করতেন তাতাদা, আর তাঁকে সমর্থন করতেন প্রশান্তচন্দ্র। বয়স্ক দলের সঙ্গে এঁদের এমনই বিরোধ, যে যে-প্রস্তাবই তাঁরা আনুন, বয়স্কদের পক্ষ কোনো না কোনো একটু technical ফ্যাকড়া তুলে তাকে out of order ক'রে দেন। তরুণদল প্রস্তাব করলেন যে রবীন্দ্রনাথকে সমাজের honorary member করা হোক। বয়স্করা এর তীব্র বিরোধিতা করলেন। তাঁরা তো রবীন্দ্রনাথকে ব্রাহ্ম বলে মনে করতেন না। প্রশান্তচন্দ্র 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই' বলে পুস্তিকা লিখলেন। তাতে একটা liberal humanist অবস্থান থেকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগস্থাপনের উপকারিতা প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা একটা deadlock-এ পৌঁছে গেল। Split প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াল। ১৯২১-এর জানুয়ারীতে তাতাদার নেতৃত্বে তরুণদল স্থির করেন যে সমাজের মাঘোৎসবে তাঁরা যোগ দেবেন না, আলাদা উৎসব করবেন। আমার মনে আছে, প্রশান্তচন্দ্রের ঘরে আমরা ক'জন বসে আছি, এমন সময় ঢুকলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র। বললেন, "কী আলোচনা করছ?" আমাদের spokesman তাতাদা বললেন, "আপনাদের অন্যায়ের প্রতিবাদে কী করা যায়, তাই নিয়ে আলোচনা করছি। কৃষ্ণ-

কুমার বললেন, "এসব ক'রে কী হবে ? তোমরাই দায়িত্ব নাও, আমরা সরে যাচ্ছি।" তাতাদা বলে উঠলেন, "আগে আপনাদের অন্যায়গুলো withdraw করুন, তারপর সকলে মিলে স্থির করা যাবে কী করা হবে।" কৃষ্ণকুমার তখন জিজ্ঞাসা করলেন, "শুনেছি তোমরা নাকি আলাদা উৎসব করার কথা ভাবছ ?" তাতাদা জবাব দিলেন : "হ্যাঁ, আলাদা উৎসব করব।"

এবং সত্যি সত্যিই আলাদা উৎসব শুরু হয়েছিল। হয়েছিল প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরীর বাড়ির ছাদে।

অবস্থাটা এইরকম জায়গায় এসে যখন দাঁড়িয়ে গেল, তখন সমাজের eminent lawyer-রা compromise formula দিলেন যে একটা referendum হোক! শেষ পর্যন্ত compromise একটা হয়েছিল।

এই তিক্ততার ব্যাপারটা চলেছিল অনেকদিন ধরে। তাতাদাকে এটা নিশ্চয়ই ভেতরে ভেতরে খুবই আঘাত দিয়ে থাকবে। কারণ তাতাদা ছিলেন sentimental, প্রশান্তচন্দ্রের মতো কাটা-কাটা কথার মানুষ নয়! কাজেই এইরকম একটা তিক্ততার পরিস্থিতিতে তাতাদার মতো লোকের পক্ষে ঐরকম চিঠি লেখা খুবই সম্ভব।

চিঠিটা তো বলছ ১৯২০'র আগস্টে লেখা। তার প্রায় ৮/৯ মাস পরে, ১৯২১'র মে'র শেষে আমি B.A. পাশ করে দার্জিলিঙে বেড়াতে গিয়েছি। তখন তাতাদার ঘরে স্যানিট্যারিয়ামে সাত দিন কাটিয়েছিলাম। তাতাদা তখন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সেই কারণেই বোধহয় দার্জিলিং গিয়েছিলেন। সাত দিন পর আমি অবশ্য অন্য সস্তা ঘরে উঠে যাই। যাহোক, সেইসময় খুব আড্ডা মেরেছি। তখন কিন্তু তাঁর মনের এইসব তিক্ততার এতটুকুও আভাস পাইনি। ঐ সময়েই মনে আছে একদিন তাতাদা শোনালেন তাঁর নতুন কবিতা—বাবুরাম সাপুড়ে।

প্রস্তুতিপর্ব : সুকুমার রায়ের যে 'ননসেন্স', তার মধ্যে সমসাময়িক বাস্তবের তির্যক আভাস একেবারেই নেই বলে কি মনে হয় আপনার ? যেমন এই 'বাবুরাম সাপুড়ে' কবিতায়, তখনকার রাজনৈতিক ঘটনাবলীর কোনো প্রতিফলন ?

সুশোভন সরকার : সেভাবে ভাবতে চাইলে ভাবতে পারো। তবে আমি তাতাদার কাছে কখনো রাজনৈতিক বিষয়ের কোনো আলোচনা শুনেছি বলে মনে পড়ে না। তাছাড়া তখন ঐসব ব্যাপারে আমার নিজেরও তো কোনো আগ্রহ ছিল না।

তবে, নানান সামাজিক ব্যাপারের প্রতি ব্যঙ্গ তো তাতাদার লেখায় থাকতই। 'চলচিত্তচঞ্চরী' নাটকের কথা মনে পড়ছে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মূলে সংগঠনের পাশাপাশি কয়েকটি 'fraternity' তৈরী হয়েছিল—যেমন, Educational Fraternity, Social Fraternity, Literary Fraternity। উদ্দেশ্য ছিল, ব্রাহ্মসমাজের বাইরে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কাছাকাছি যাঁরা আছেন, তাঁদের involve করানো। একবার আমরা স্থির করলাম Fraternity-তে নাটক করব। তাতাদাকে বললাম। তাতাদা গম্ভীরমুখে পাণ্ডুলিপি থেকে পড়ে শোনালেন নাটক। পাণ্ডুলিপি থেকে খাতায় কপি করে নিয়েছিলাম, মনে আছে। এই 'চলচিত্তচঞ্চরী' নাটকে তো ধরো ব্রাহ্মসমাজের

ভেতরকার জ্ঞানমার্গ বনাম ভক্তিমার্গের যে বিরোধ তার reflection রয়েছে। আর শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রম হয়তো শান্তিনিকেতনের গুরুভজা আশ্রমের প্যারডি। শুনেছি রবীন্দ্রনাথ এই নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন।

প্রস্তুতিপর্ব: Burden of the Common Man—প্রবন্ধে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ সম্পর্কে উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এক ধরণের সহানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। সুকুমার রায়ের এই দিকটা সম্পর্কে আপনার কিছু মনে পড়ে?

সুশোভন সরকার: Burden of the Common Man উনি পড়েন ছাত্র-সমাজের একটি সভায়। আমি ছিলাম সেখানে। তার মধ্যে একটা লাইন মনে পড়ছে: Blessed is the Common Man…

না, এটা তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বলে আমরা মনে করিনি। এটা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেরই tradition—'সাধারণ' কথাটার মধ্যেই সেই ইংগিতটা আছে। আমরা মনে করতাম, ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্যান্য ধারার সঙ্গে ঐখানেই আমাদের তফাৎ। 'তত্ত্বকৌমুদী'র মাথায় শাস্ত্রীমশাইয়ের সেই "মহাসাধারণতন্ত্রে"র কথা আদর্শ হিসেবে ছাপা হতো।

প্রস্তুতিপর্ব: ১৮৭১ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী যে গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেছিলেন, যার আদর্শ ছিল 'অন্যায়ের উপর ন্যায়ের, অসাম্যের উপর সাম্যের, রাজশক্তির উপর প্রজাশক্তির প্রতিষ্ঠা দ্বারা পৃথিবীব্যাপী এক মহাসাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা"—কথাটা কি তার থেকেই নেওয়া?

সুশোভন সরকার: আমার মনে হচ্ছে সেযুগে 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকার উপরে কতকগুলি সংকল্প ছাপা হত, তার মধ্যে ছিল "পৃথিবীব্যাপী এক মহাসাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা"র কথা।

[এই সাক্ষাৎকারটি 'প্রস্তুতিপর্ব' পত্রিকার সৌজন্যে গৃহীত। সাক্ষাৎকারটি ৮.৭.৮২ তারিখে গৃহীত হয়। ২৫.৭.৮২ তারিখে সুশোভন সরকার এটি সংশোধন ও অনুমোদন করেন। কিন্তু তিনি এটি মুদ্রিত আকারে দেখে যেতে পারেননি।]



দাদা সুকুমার রায়

মাধুরী মহলানবীশ

সেই বাইশ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে জ্ঞান হওয়া অবধি দাদাকে, মানে সুকুমার রায়কে দেখে আসছি। তারপর ১৯২৩-এ গড়পাড়ের বাড়ি থেকে দাদা যখন চিরকালের মত চলে গেলেন তখন আমার বয়স বাইশ বছর।

সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে আমরা, অনেকগুলি ভাইবোন, বড়দি সুখলতা, তারপর পুণ্যলতা শান্তিলতা, আমি, আমার বোন প্রীতিলতা ছিলেন; দাদা ছাড়া সুবিনয় সুবিমল আর আমার নিজের ভাই করুণারঞ্জন। আমরা তখন খুব ছোটবেলায় দেখতাম সকালবেলায় এক মেমসাহেব আসতেন। সেই মেম পিয়ানো বাজনা শেখাতেন। দাদা বলতেন, 'ওসব আমার ভাল লাগে না। ছবি আঁকো, গান কর, এটা কর সেটা কর। যতসব ড্রয়িংরুম অ্যাকমপ্লিশমেণ্ট। আমরা বরং সন্ধ্যাবেলা নাটক করব।'

আরেকটা নিয়ম দাদার পছন্দ ছিল না সেটা এখানে বলে নিই। জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম বা গোঁড়া ব্রাহ্ম। রোজ খেতে বসার আগে প্রার্থনা করতে হত আমাদের। দাদা হয়ত মুখে গ্রাস তুলতে যাবেন, পাশের ঘর থেকে জ্যাঠামশাই বলতেন, মন্ত্র পড়ে তারপর খাওয়া শুরু হবে। দাদা বলতেন, 'ধ্যাৎ, এসব একদম ভাল লাগে না। কেন যে বাবা এগুলো করেন বুঝতে পারি না। খাওয়ার আগে কোনো কিছু পড়ব না, ভগবানকে ডাকব না'। আমাদেরই বলত এসব কথা।

জ্যাঠামশাইয়ের গোঁড়ামির কথা যখন উঠল তখন আরেকটা ঘটনা বলে নিই। একবার বাবা লখনৌ না লাহোর, কোথায় যেন ক্রিকেট খেলতে গেলেন, সেখান থেকে আমাদের জন্য জরির নাগরা জুতো নিয়ে এলেন। জ্যাঠামশাই দেখেই বললেন, এসব

কি ? এগুলো কাদের জন্য ? যেই শুনলেন আমাদের সকলের জন্য আনা হয়েছে, অমনি বললেন, 'না না। এসব পরতে হবে না। এগুলো বাইজিরা পরে। এসব ফেলে দাও। ঝুড়িশুদ্ধ ফেলে দিয়ে এস'। আমাদের কী মন খারাপ যে হয়েছিল। দুঃখে মরে যাই আর কী !

জ্যাঠামশাই যেমন গোঁড়া ছিলেন, দাদা একেবারেই তা ছিলেন না।

যাই হোক, তা সন্ধ্যেবেলার সেই নাটক সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ির উপরে প্রকাণ্ড হলঘরে খুব জমত। সব জ্যাঠতুতো ভাই-বোনেরা আসতেন, হীতেন বোস, আসান বোস, শৈলজারঞ্জন, হেমেন্দ্ররঞ্জন। ময়না মালতী আমরা সব ছোট ছোট গুড়ি গুড়ি মেয়েরা বসে, আর সবাই দাঁড়িয়ে। প্রকাণ্ড এক বিছানার চাদর মুড়ি দিয়ে লাইন করে আঠারোজন দাঁড়ালেন। দাদা বললেন, 'সব স্তোত্র পড়। স্বর্গে যাবার মন্ত্র পড়।' অমনি তালে তালে বলা হল,

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁটপাটকেল চিৎপটাং।
গন্ধগোকুল হিজিবিজি
নো অ্যাডমিশন ভেরি বিজি

হঠাৎ সেই চাদরের মধ্য থেকে দাদা বলে উঠলেন, 'এই রে উল্টোদিকে নেমে যাচ্ছি। স্বর্গে যাচ্ছি না, নেমে যাচ্ছি পাতালে। ভুল হল। ভুল মন্ত্র। আরেকটা পড়।' তখন আবার,

ভাব একে ভাব, ভাব দুগুণে ধোঁয়া,
তিনভাবে ডিসপেপশিয়া ঢেকুর
উঠবে চোঁয়া
ইত্যাদি।

তারপর এ ওর ঘাড়ে গুঁতো দিয়ে, ধাক্কা লাগিয়ে সব গড়াগড়ি যেতে লাগলেন। আমাদের খুব মজা লাগত।

ছাদের সেই ঘরে দাদার যে কত দুষ্টুমি ছিল। মেজদি পুণ্যলতার তখন বিয়ে হবে। ছাদেই একটা টিনের ছাদওয়ালা রান্নাঘর মত ছিল। সেখানে বসে মেজদি তার ভাবি কর্তাকে চিঠি লিখছে। একটা ভাঙা টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়ে দাদা সেখানে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে যেতে লাগলেন, 'প্রিয়তম, তুমি কবে আসিবে' এই সব। আর মেজদির চিৎকার, দাদা, দাদা মা দেখো দাদা যা-তা বলছে। দাদা বললেন, আমি তো চারদিকের আকাশ দেখছি। এসব ছিল দাদার মজা। নির্দোষ আনন্দ।

তারপর দাদা তো বিলেত গেলেন। আমরা তখন কিছু বড় হয়েছি। দাদার চিঠি আসত। দু-বছর পরে দাদা ফিরে এলেন। দাদার বিয়ের কথা তখনই উঠল। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্যর বাড়িতে থেকে টুলু বৌদি কলেজে পড়তেন তখন, প্রাণকৃষ্ণ এবং সুবালা আচার্যর সংসারেই তিনি বড় হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে দাদার বিয়ে ঠিক হল ;

কনে দেখার আসরে সুপ্রভাকে বলা হল, একটা গান শোনাও। চমৎকার গান করতেন। খুবই ভাল গাইতেন। তিনি তখনও পর্যন্ত জানতেন না যে আমাদের দাদার ডাক-নাম 'তাতা'। গান ধরলেন, 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।' আমরা যারা তখন অল্প বয়সের, বলাবলি করছি, ঐ দেখ তাতা বলছে, আবার তাতা বলছে। নতুন বৌদি হবে তাই দাদার নাম তাতা বলছে। বৌদি তো পরে ভীষণ অপ্রস্তুত হয়েছিলেন!

ব্রাহ্মসমাজ পাড়ায় বিমলাংশুপ্রকাশ রায়ের বাড়ি; দাদার সেই বন্ধুর বাড়ির ছাদে ফ্রেটারনিটি ক্লাব হল। সেখানে সব জমা হতেন, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলে আসতেন, জংলু মামাও আসতেন। একবার ঠিক হল, কবিতা লেখার আসর হবে। দাদা বললেন, যে যা পার এখানেই কবিতা লিখে আমাকে দাও। তারপর দাদা একটা করে কাগজ খুলছেন আর পড়ছেন। একটাতে লেখা ছিল—

ভীষণ ডিগবাজি
খেতেন শিবাজী।

তলায় লেখা, প্রভাত গাঙ্গুলি। প্রভাত গাঙ্গুলি অর্থাৎ জংলু মামা তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠেছেন, আমি লিখিনি। আমি মোটেই লিখিনি। নানকুদা পালিয়ে গেলেন। দাদা ধরতে পারলেন, নানকু (সুবিমল রায়) লিখেছেন। নানকুদার মধ্যেও খুব 'হিউমার' ছিল। সেই ছাদে বসে দাদার বন্ধুরা নানারকম খেলা হত।

সমাজ পাড়ায় একবার বিমলাংশুবাবুদের বাড়ির ছাদেই মাঘোৎসবে ব্রাহ্ম যুবকদের আলাদা উপাসনা হয়। দাদার নেতৃত্বেই সেই ঘটনাটি ঘটল। দাদারা চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সদস্যপদ দিতে, কিন্তু সমাজের যাঁরা পুরনো, প্রবীণ যেমন কৃষ্ণকুমার মিত্র হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এঁরা রাজি হলেন না। সেই নিয়ে তো প্রবীণে আর নবীনে বিরোধ বেধে গেল। দাদার পরামর্শ আর পরিকল্পনামত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ একটি বইও লিখে ছাপিয়ে বিলি করলেন, 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই?' সেবার সমাজ-মন্দিরে মাঘোৎসবের উপাসনা হল, আর সেসময়েই দাদারা সব বন্ধুরা মিলে আলাদা উপাসনা করলেন। স্যার নীলরতন সরকারের মেয়ে অরুন্ধতী গান করলেন, 'নতুন জীবন তোমার হাতে এবার কর দান...।' ওখানে বৃদ্ধদের উপাসনা, এখানে তরুণদের!

একদিন রামমোহন রায়ের উপর রামমোহন লাইব্রেরিতে বক্তৃতা দিয়ে দাদা বাড়ি ফিরলেন। এসেই বৌদিকে বললেন, 'টুলু, আমি বেশিদিন বাঁচব না।' বললেন যে, যখন লেকচার দিচ্ছি তখন যেন আমার ভিতর থেকে স্পিরিট বেরিয়ে গেল; আমি বুঝতে পারলাম যে সে আমারই আত্মা। একেই বোধহয় এখনকার সাইকোলজির ভাষায় বলে, একস্ট্রা সেনসিটিভ পারসেপশন। শুনে আমাদের খুব অদ্ভুত লাগল।

তারপর দাদা নিজের দেশ ময়মনসিংহের মসূয়াতে গেলেন। সেখানকার সবাই

ডেকেছিলেন। জমিদারের 'কর' দেবেন তাঁরা। যেতে হল বাধ্য হয়েই। সেখানে যেতেই দাদাকে শুনতে হল, এই খাজনা বাকি, ওই ওদের খাজনা বাকি। তারপর অনেক গিনি এসে পায়ের কাছে রাখল। দাদা জিগেস করলেন, এসব কি? এসব আমাদের প্রণামী। এসব আমি চাই না। না, নিয়ে যাও এসব, সব ফিরিয়ে দাও, বলে সব দিয়ে এলেন। বললেন যে, আমি আর আসছি না, তোমরা হিসেবমত যার যেমন কাজ কর। সেখান থেকে চলে এলেন আর আসবার সময় কালাজ্বর অসুখটি নিয়ে এলেন।

কলকাতায় এসে দাদার প্রায়ই জ্বর হত। ওই অসুখের ওষুধ তখন তো বেরোয়নি। নানকুদা তিব্বতিবাবা নামে এক সাধুকে নিয়ে এলেন; তিনি নিমের ডাল, লাউয়ের খোলা দিয়ে অনেককিছু চেষ্টা করলেন। কিছুতেই কিছু হল না। ভীষণ জ্বর হয়, আবার ছাড়ে। ভীষণ জ্বর হয়, আবার ছাড়ে। খেতে পারেন না কিছু। একেবারে বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন। বন্ধু প্রশান্ত মহলানবীশ প্রায় রোজই আসতেন। দাদা বলতেন, 'প্রশান্ত, আমি বইটা লিখে নিই। শেষ করে নিই। তারপর যাব।' হয়ত 'আবোল-তাবোল' বইটার কথাই হত।

দাদা বিছানায় শুয়ে শুয়ে লিখতেন, ছবি আঁকতেন। কখনও মুখে বলে যেতেন, বৌদি পাশে বসে লিখে নিতেন। ছবি আঁকার রঙ তুলি সব বিছানার পাশেই থাকত। অনেকসময় বলতেন, এই রঙ দাও, ঐ রঙ দাও। বৌদি রঙ দিতেন, আমিও রঙ দিতাম, মানে ফিল-আপ করতাম। ছোট্ট ছেলে মাণিক এসে বিরক্ত করত। এটা নাড়ত, ওটা ফেলত। দাদা বলতেন, 'নিয়ে যাও একে'। দাদার মুখের তলায় একটা বড় আঁচিল ছিল, মাণিক সেইটা ধরে টানাটানি করত। ওইরকম অসুস্থ অবস্থাতেও কীভাবে মাথায় আসত এতসব লেখা। বৌদি সব লেখাপত্র জোগাড় করে রাখতেন।

এর মধ্যেই আমি বেথুন কলেজ থেকে বি-এ পাশ করলাম। ঘোড়ার গাড়িতে করে কলেজে যাওয়া, আর ঘোড়ার গাড়িতে করেই ফিরে আসা। আমার বিষয় ছিল বটানি, বায়োলজি ইত্যাদি। তারপর তো আর পড়া হল না, ইউনিভার্সিটিতে 'কো-এডুকেশন'—বাবা পাঠালেন না। সায়েন্সে স্কলারশিপ পেয়েছি শুনে দাদা বললেন, "না রে, তোকে দেয়নি। বানিয়ে বানিয়ে লিখে দিয়েছে।' আমি ভাবলাম, তাই বুঝি হবে। গেজেটে নাম বেরিয়েছে কিন্তু দাদার কথাই সত্যি বলে ভেবেছি। তারপর সরকারি স্কলারশিপের টাকা যখন এল দাদাকে বললাম, তুমি যে বলেছিলে এসব মিথ্যে! দাদা বললেন, 'তোকে একটু ভয় দেখালাম'।

দাদা বিছানায় শয্যাশায়ী, বৌদি লিখতে লিখতে কখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছেন। দাদা চুপি চুপি একটি চিঠি লিখে বৌদির হাতের তলায় রেখে দিয়েছেন; তাতে লেখা, 'ডিয়ারেস্ট এঞ্জেল, সেই যে তুমি যখন ডায়োসিশনে পড়তে তখন তোমায় কতবার দেখেছি। আজ এতদিন পরে দেখা পেলাম।' এইসব কথা। অনেকক্ষণ পরে বৌদি জেগে উঠে চিঠিটা দেখেছেন, একী! এটা কে দিল? দাদা গম্ভীরভাবে, 'তা তো

আমি জানি না কে দিল। জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছে।' বৌদি বললেন, 'কক্ষনো না মিথ্যে কথা। কক্ষনো হতে পারে না।' দাদা বললেন, 'আমি কি কিছু বলছি? আমি তো সাক্ষী মানছি না। তুমি অমন করছ কেন?' সেই কঠিন অসুখেও রসিকতাটি ঠিক ছিল। দমে যেতেন না কিছুতেই।

শরীর খুব খারাপ যখন, একদিন প্রশান্তচন্দ্রকে বললেন, 'প্রশান্ত, রবীন্দ্রনাথকে খুব দেখেতে ইচ্ছে করে।' রবীন্দ্রনাথ আসতেন, এসে পাশে বসতেন। একদিন খুবই খারাপ অবস্থা তখন, বন্ধুকে বললেন, 'প্রশান্ত, তুমি রবীন্দ্রনাথকে একবার আন।' প্রশান্তচন্দ্র গিয়ে জানালেন যে সুকুমারের খুব খারাপ অবস্থা; আপনি একবার যেতে পারবেন? রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'নিশ্চয় যাব।' রবীন্দ্রনাথ এলেন। পাশে বসতেই দাদা তাঁর কাছে গান শুনতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ শোনালেন গান। তার মধ্যে একটি ছিল, 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে।' আমার স্পষ্ট মনে আছে এই গানের কথা।

কয়েকদিন পরে ভীষণ ভূমিকম্প হল। ঘরদোর সব নড়ে উঠল। আমি দাদার পায়ের কাছে খাট ধরে দাঁড়িয়েছিলাম। একসময় থেমেও গেল। কিছুক্ষণ পরে দাদা বললেন, 'এবার চলি। টুলু, প্রস্তুত হও।' ওই কথাই ছিল দাদার শেষ কথা।



অসম্ভবের ছন্দ

শঙ্খ ঘোষ

ইংরেজ স্যুরিয়ালিস্ট কবিরা অনেক সময়ে ভেবেছেন, টেনিসনের চেয়ে বড়ো কবি ছিলেন বরং এডোয়ার্ড লিয়ার। বিশুদ্ধ এক আজগবি জগতের স্রষ্টা হিসাবে লিয়ার বা লুইস ক্যারলের মহিমার কথা সকলেই মানবেন। কিন্তু কেবল সেই উদ্ভটের হিসেবে নয়, কবিতার হিসেবেই যদি লিয়ারের কথা ভাবতে চান কেউ, ব্যাপারটাকে প্রথমে মনে হতে পারে একটু-বা বাড়িয়ে বলা। কেন তবু ও-রকম মনে হতো ওই কবিদের? তার একটা কারণ নিশ্চয় এই যে আপাত-আজগবি এই জগৎটা আমাদের অনেকদিনের লালিত কিছু অনড় অভ্যাসকে ভেঙে দেয়, ভেঙে দেয় অনেক সুসামাজিক যুক্তি, আর এই যুক্তির মধ্য দিয়ে অলক্ষ্যেভাবে তা ছুঁয়ে যেতেও পারে কোনো সত্যকে। তাই, যাকে আমরা আজগবি বা উদ্ভট বা ননসেন্স বলি, গভীরতর অর্থে তার সঙ্গে এক আত্মীয়সম্পর্ক গড়ে ওঠে স্যুরিয়ালিজম আন্দোলনে। সে-আন্দোলনের কবিরাও ইন্দ্রিয়শাসন বা যুক্তিশৃঙ্খলের বাধা পেরিয়ে জীবনের প্রচ্ছন্ন এবং মূল চেহারায় পৌঁছতে চেয়েছিলেন একদিন। এটা স্বাভাবিক যে তাঁদের কাছে টেনিসনের চেয়ে বেশি মর্যাদা পাবেন এডোয়ার্ড লিয়ার বা লুইস ক্যারলের মতো লেখকেরা।

ঠিক তেমনি, আমাদের দেশেও, পূর্বতন অধিকাংশ কবির বিষয়ে যিনি নিতান্ত উদাসীন, সেই জীবনানন্দ তাঁর মুগ্ধতা জানান সুকুমার রায়ের 'অনন্যসাধারণ শক্তি'র কথা ভেবে। মনে হয় তাঁর: 'সুকুমার রায়ের স্বকীয়তার কথা যতই ভাবা যায় ততই বিস্ময়ে ও আনন্দে স্তব্ধ হয়ে থাকতে হয়।' হাসির জগতের শিল্পী হিসেবে সুকুমার রায়ের প্রতিভা যে মুগ্ধ করছে কাউকে, এটা বিশেষ করে বলবার মতো কোনো কথাই

নয়। কিন্তু জীবনানন্দ কি কেবল কৌতুকের দিক থেকেই দেখতে পাচ্ছিলেন এই কবিকে, না তার চেয়ে বেশি কিছু? 'পাগলা দাশু'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন সুকুমারের 'অবিমিশ্র হাস্যরসে'র কথা, তিনিও লক্ষ করেছিলেন এ-কবির 'সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দ গতি, তাঁর ভাবসমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা'। প্রতিভার 'স্বকীয়তা'র কথাও বলেন রবীন্দ্রনাথ, যে-স্বকীয়তা তিনি দেখেন তাঁর 'বিশুদ্ধ হাসির গান'-এর মধ্যেই। কিন্তু জীবনানন্দ যখন লেখেন সুকুমার রায়ের প্রসঙ্গে, তখন নিজের ধরনেই তাঁর মনে পড়ে 'আমাদের এই পৃথিবীর ভিতরেই আরো অনেক পৃথিবীর' প্রসঙ্গ। এ-পৃথিবীকে খুঁজে পায় কোনো সৃষ্টিপরায়ণ মন, তার মধ্য দিয়ে সে-মন ধরে দেয় আমাদের পরিচিত জগতেরই একটা 'কুয়াশাচ্ছন্ন অথবা বিদ্যুতায়িত' রূপ। 'কিন্তু'—বলেন জীবনানন্দ—'সুকুমার রায়ের পৃথিবী আবোলতাবোল এ যা সত্য হয়ে ফলে উঠেছে তা মোটেই আমাদের চেনাজানা পৃথিবী কিংবা তার প্রতিচ্ছবির মতো বাস্তব না হয়েও তেমনি পরিচিত ও তেমনি সত্য।'

সৃষ্টিপরায়ণ অন্য মনের তুলনায় সুকুমার রায়ের একটা স্বাতন্ত্র্যই দেখেন জীবনানন্দ, কিন্তু সে-স্বাতন্ত্র্য নিছক হাসির কারণেই নয়, বাস্তব না হয়েও সত্যকে ধরবার ভিন্নতর একটা বৈশিষ্ট্যে। এই বৈশিষ্ট্যে সুকুমার রায়ের লঘু জগৎ হয়ে দাঁড়ায় উপলব্ধিরও এক জগৎ। অনভ্যস্ত পাঠক একদিন সুরিয়ালিজমের আন্দোলনে দেখেছিলেন কেবল অর্থহীন আবোলতাবোল, জীবনানন্দের মতো আধুনিক কবিরা একদিন ধিক্কৃত হচ্ছিলেন অসংলগ্ন প্রলাপ বলার দায়ে। আর জীবনানন্দের মতো কেউ কেউ উদ্ভট এই ছড়াছবির মধ্য দিয়েও পেয়ে যাচ্ছিলেন বাস্তবে-অবাস্তবে মেশানো একটা গণনীয় পৃথিবী, সৌন্দর্যের কোনো চকিত স্ফুরণ, কবিতারই কোনো অন্য ধরনের স্বাদ।

লিয়ার বা সুকুমার রায়ের মতো লেখকেরা তাই ঘুরে বেড়ান একই সঙ্গে দুই ভিন্ন তলে: ছোটোদের আর বড়োদের দুই তল, রঙ্গের আর সত্যের দুই তল। সুকুমার রায়ের বিষয়ে আরো একটু এগিয়ে হয়তো বলা যায়: খেয়ালের আর কল্পনার দুই তল। এ দুই তলের মিলনেরই একটা ইঙ্গিত ধরা আছে 'আবোলতাবোল'-এর সূচনা-কবিতায়। সে-কবিতায় খ্যাপামিকে আহ্বান করেন সুকুমার রায়, যেমন রবীন্দ্রনাথও একদিন করবেন তাঁর 'খাপছাড়া'য়। বৃদ্ধের খোলস খসিয়ে সেখানে একটু চপলতা করতে চাইবেন রবীন্দ্রনাথ, বলবেন, 'মনখানা পৌঁছয় খ্যাপামির প্রান্তিক,' আর তার কৈফিয়ৎ হিসেবে জানাবেন যে বিধির চারটে মুখে আছে চার রকমের রীতি। একটাতে দর্শন, একটাতে বেদ, একটাতে কবিতা, আর 'একটাতে হো হো রবে পাগলামি বেড়া ভেঙে উঠে উচ্ছ্বসিয়া।' রবীন্দ্রনাথের ছিল স্বতন্ত্র বহু মুখচ্ছবি, তাই এদের এত আলাদা করে নিতে পেরেছিলেন তিনি, কিন্তু সুকুমার রায়কে একই মুখে ধরতে হয় এই কবিতা আর পাগলামি, তাই 'খেয়ালখোলা'কে ডাক দেন তিনি 'স্বপনদোলা'য়। খ্যাপার গানে যে কোনো মানে নেই সুর নেই, সেকথা বলবার পরেই তিনি লিখতে পারেন 'উধাও হাওয়ায় মন ভেসে যায় কোন্ সুদূরে'-এর মতো নিছক রোম্যাণ্টিক কোনো লাইন। অসম্ভবের গানই তিনি করেন বটে, কিন্তু তারই ভিতরে ভিতরে তিনি রেখে যান সেই

অসম্ভবের এক ছন্দকেও। সেইখানে তিনি কবি।

২

কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা জীবনের একটা গড়ন খুঁজে নিতে চাই, পেতে চাই জীবনযাপনের একটা মানে। খানিকটা অগোচরে, খোঁজার এই কাজটা শুরু হয়ে যায় আমাদের ছেলেবেলা থেকেই। টুকরো টুকরো অসংলগ্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একটু একটু করে বড়ো হয় একজন, নিজের মনে বানানো তার আবছা জগতের সঙ্গে বড়োদের চালচলনের কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পায় না সে, কিন্তু খুঁজতে চায়। সে বুঝতে চায় নিজেকে, বুঝতে চায় তার চারপাশকে।

কিন্তু কীভাবে সে তা বুঝবে? এ কি অভিভাবকের কোনো উপদেশবাক্যের মধ্য দিয়ে সম্ভব? এ কি রচিত কোনো নীতিসূত্রের মধ্য দিয়ে সম্ভব? সেটা বরং অনেক-সময়ে উলটো কাজই করে, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া এই এক নিয়মের ছক তার মনকে বরং বিরূপ করেই তোলে। ছোটোরা তাদের আবছা মনের সঙ্গী করে নেয় শিল্পের জগৎকে। ছবিতে ছড়ায় রূপকথায় খামখেয়ালে তারা তৈরি করে নেয় একটা সমান্তরাল পৃথিবী, সেইখান থেকে তাদের কাছে জেগে উঠতে থাকে বাস্তব জীবনের একটা মানে।

ছোটোদের জন্য লেখা তাই খুব শক্ত কাজ। লেখক যদি মনে করেন চলতি সমাজের মূল্যগুলিকে ভাঙতে চান তিনি, ছোটোদের মন থেকে সরিয়ে দিতে চান ভুল সংস্কার-গুলিকে, আর এইভাবে তার সামনে সাজিয়ে দিতে চান জীবনযাপনের একটা স্বাস্থ্যময় ছবি, তাহলে কীভাবে সেটা করবেন তিনি? এই ভাঙার কাজটাও যাতে রূঢ়ভাবে আঘাত না করে কোনো কিশোরমনে, যাতে খুব সাবলীলভাবেই সে পৌঁছতে পারে বোধে, সেইদিকে তাঁর লক্ষ্য চাই তাই। তাই অনেকসময়ে তাঁকে খুঁজে নিতে হয় হাসির চাল, খেয়ালখুশির হালকা হাওয়ায় তিনি করতে পারেন সেই কাজ, আর বাঁচতে শেখানোর সে কাজে সবচেয়ে বড়ো দায়িত্বটাই হয়ে ওঠে সবকিছুর সঙ্গে নিজের কোনো যোগ দেখানো। সুকুমার রায়ের হাসির জগৎ এই যুক্ত করার যুক্ত হবার জগৎ।

'সবাই নাচে ফুর্তি করে সবাই গাহে গান/একলা বসে হাঁড়িচাঁচার মুখটি কেন ম্লান?' এই প্রশ্ন থেকে এক সংলাপধারা শুরু হয়েছিল 'সঙ্গীহারা' কবিতায়। শালিখ মাছরাঙা বা পায়রা কোকিল চন্দনা টুনটুনি, সবারই আছে কোনো-না-কোনো দোষ, এই ভেবে একলা হয়ে আছে একজন, কেননা সবারই সে খুঁৎ পেয়েছে, 'নিখুঁৎ কেবল নিজে'। এইসব হাঁড়িচাঁচা অথবা রামগরুড়ের কাছে পৃথিবীতে সবই কেবল সরিয়ে দেবার জিনিস, কিছুই আর আপন করে নেবার মতো নয়। যেন তারই একটা উল্টো দিক হিসেবে সুকুমার রায় আমাদের শোনান 'ভুমিও ভাল আমিও ভাল'র তালিকা, কিংবা 'হাসছি মোরা হাসছি দেখ'র উচ্ছ্বাস, আর অন্যদিকে আমাদের সামনে সাজিয়ে ধরেন বাতিকগ্রস্তদের এক দীর্ঘ মিছিল। বাতিকে-ভরা তাঁর পৃথিবীর প্রায় সব চরিত্রেরই

থেকে যায় কোনো-না-কোনো খঁৎ, সামাজিকের সুভদ্র হিসেবের বাইরে থেকে যায় তারা, কিন্তু তাদের আমরা দেখতে শিখি অনেকটাই প্রশ্রয়ের চোখে, নৈকট্যের টানে, হাসির ঔদার্যে। আর, হয়তোবা, তাদের দিকে তাকিয়ে নিজেদেরও আমরা দেখতে শিখে যাই ছোটোবেলা থেকেই। সুকুমার রায়ের এইসব হাসি অনেকসময়ে নিজেকে নিয়েই হাসি, নিজের একটা সম্ভাব্য রূপকে নিয়ে।

সম্ভাব্য এইসব রূপ নিয়ে একে একে এখানে দেখা দিতে থাকেন হেড-অফিসের বড়োবাবুটি, খোশমেজাজের গায়ক ভীষ্মলোচন, আজব কল বানানো চণ্ডীদাসের খুড়ো, লড়াইখ্যাপা পাগলা জগাই, গোটা ছয় জ্যান্ত রোগীর খোঁজে হাতুড়ে ডাক্তার টিফিন রক্ষায় সাবধানী ঢালধারী, বুঝিয়ে বলার নেশায় মাতা বুড়ো, ফুটোস্কোপধরা উৎসাহী বিজ্ঞানী, ষাঁড়ের তাড়ায় বিহ্বল কেতাবসর্বস্ব পণ্ডিত, শনির তাড়ায় ত্রস্ত নন্দখুড়ো, আর এই রকমই অনেক অনেক। এসব চরিত্রের মধ্যে অনেকসময়েই থেকে যায় আলতো একটা সমালোচনা, ব্যক্তিগত বা সামাজিক কোনো অসংগতির দিকে চকিত দৃষ্টিপাত, এমন কী সরাসরি কোনো সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়েও একটা কোনো কৌতুক। সেই অর্থে নিশ্চয় এরা নিছক খেয়াল নয়। সন্দেহ নেই যে লড়াইখ্যাপা পাগলা জগাই উঠে আসছে পৃথিবীজোড়া প্রথম যুদ্ধেরই পট থেকে। 'সাত জার্মান জগাই একা', তবুও যে সে তিড়িং বিড়িং নাচে, তার সঙ্গে নিশ্চয় আমরা মিলিয়ে নিতে পারি 'সন্দেশ' পত্রিকায় আরো একটি গদ্যলেখাকে ('বিলাতে শিখ সৈন্য'), ওই কবিতাটির পর পর ছাপা হয়েছিল যে লেখা, যেখানে একজন সেন্য চিঠি লিখছে তার বাবাকে : 'বোমা গায় লাগিল না, তাহার হাওয়াতেই শার্দুল সিং মরিয়া গেল। তারপর অসংখ্য জার্মান আসিল : আমরা তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিলাম···রাত্রে তাহারা আবার আসিয়া বিজলীতে আসমান ঝলসাইয়া ফেলিল···আমরা আবার তাহাদের সকলকে মারিয়া ফেলিলাম।···সেখানে একটা গাছ আছে, সেই গাছে হরেক জাতের সিপাহীর টুকরো বোমার চোটে হাওয়ায় উড়িয়া আসিয়া ঝুলিতে থাকে। হিন্দুস্থানী পাগড়ী আর সাহেবের টুপী আর বুট সব সেখানে আছে।' এর পাশাপাশি সাজিয়ে দেখলে, 'ভীষণ লড়াই হলো / পাঁচ ব্যাটাকে খতম করে জগাই দাদা মোলো'র মতো লাইন বিশেষ একটা তাৎপর্য পায় নিশ্চয়ই। কিন্তু ভিতরের সেই যোগ সত্ত্বেও এর ঝোঁকটা সমালোচনার দিকে তত নয়, যতটা আগ্রহ কেবল মজাদার এই আচরণগুলিকে সাজিয়ে দেখার দিকে।

এটাও লক্ষ করবার যে এসব বাতিকগ্রস্তদের অনেকেই বেশ বুড়ো। ছোটোদের চোখে বয়স্কদের ধরনধারণকেই মনে হয় উদ্ভট, লিয়ারের লিমেরিকগুলিতে প্রায়ই কেন্দ্রে থাকে বাহাত্তুরেরা : লম্বা-নাকের বুড়ো বা দাঁতখিঁচুনি বুড়ো, ট্রেনফেল্লকরা বা মগডালে-চড়া বুড়ো, খরগোশের বা ফড়িঙের পিঠে বুড়ো। সুকুমার রায়ও তেমনি দেখান কাঠবুড়ো বা কাতুকুতুবুড়ো খঁৎধরাবুড়ো বা মগজহীন উলটো-নাচের বুড়োদের ভিড়। এদের বেলায় নামের সঙ্গেই গেঁথে দেওয়া আছে বুড়ো শব্দটি। অন্য অনেক সময়ে শব্দটি হয়তো নেই কিন্তু বিবরণে আর ছবিতে বোঝা যায় যে, সব বাতিকই

পৌঁছচ্ছে তাদেরই বয়সের গণ্ডিতে। স্বাভাবিক এখানে কেবল একজন, বদ্যি বুড়ো। সারাদিন না খেলে তার খিদে পায়, চোখ দিয়ে সে দেখে, কান দিয়ে শোনে। এতই সে স্বাভাবিক যে সেটাই এক অস্বাভাবিক কাণ্ড।

আর ছোটোরা কী করে আবোলতাবোলের এই দেশে? তারা কখনো আহ্লাদী কখনো ভার্নাপটে কখনো কাঁদুনে, তারা কেউ ভুল করে কেউ ঝগড়া করে, হিংসুটে কেউ, কেউ-বা লোভী, আর তাদের অনেকেরই নিশ্চয় কেতাবের সঙ্গে আড়ি। এইখানে এসেই সুকুমার রায়ের শিশুকিশোর পাঠকেরা মস্ত এক বিস্তার পেয়ে যায়, 'ভালো ছেলে' হবার সুনৈতিক দায় থেকে মুক্তি পেয়ে যায় তারা, পরম স্বস্তিতে দেখে যে তাদেরই মতো ছেলেমেয়েদের সংসারে হৈ রৈ করে ঢুকে পড়ছে তারা, তাদেরই মতো পদে পদে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে যারা, অন্যকেও অপ্রস্তুত করে তোলে কখনো-বা।

চরিত্রের-এমনকী শরীরেরও—কয়েকটি মজাকে সাজিয়ে দেখবার ধরণটা লিয়ার থেকেই পেয়েছিলেন সুকুমার, এটা হয়তো অনুমান করা যায়। লিমেরিকগুলিতে নাকের দৈর্ঘ্য নিয়ে যে ব্যতিব্যস্ততা প্রায়ই দেখতে পাই, তাও এসে পৌছবে আমাদের কবির হাতে: 'এক যে ছিল সাহেব তাহার/গুণের মধ্যে নাকের বাহার', আর সেই নাকে মুলো ঝুলিয়ে গাধার পিঠে চলতে থাকবেন সাহেব অন্যদিকে, 'আবোলতাবোল' এর বাতিকগ্রস্তদের একটা প্রধান বাতিক যে কেবল অনিচ্ছুকদের তাড়া করে বেড়ানোতে- তার অনেক নজির মিলবে রবীন্দ্রনাথের 'হাস্যকৌতুক' এর মধ্যে। 'বলছিলাম কি, বস্তুপিণ্ড সূক্ষ্ম হতে স্থূলেতে, অর্থাৎ কিনা লাগছে ঠেলা পঞ্চভূতের মূলেতে' এসব ব্যাখ্যা থেকে অথবা 'অবুঝ' কবিতায় 'শ্মশানঘাটে শষ্পানি খায় শশব্যস্ত শশধর' কথাটির মানে বোঝাবার ধরণ থেকে আমাদের অবধারিত মনে পড়ে 'সূক্ষ্মবিচার' এর চণ্ডীচরণকে, কিংবা 'আর্য' ও অনার্য'র চিন্তামণিকে, অথবা 'গুরুবাক্যে'র শিরোমণিকে। তেমনি, 'গন্ধবিচার' পড়তে গিয়েও 'জুতা আবিষ্কার' বা হিংটিংছট' এর রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়া একেবারে অসম্ভব নয়। অর্থাৎ, এই চরিত্রমিছিলে একটা দিক আছে যেখানে সুকুমার একক নন, অনুণীও নন।

কিন্তু এইসব চরিত্রের সঙ্গে জীবজগৎ আর কাল্পনিককে মিলিয়ে নিয়ে যে খ্যাপামি ছড়িয়ে দেন তিনি, তার প্রবলতায় অনুজই আবার হয়ে দাঁড়ান উত্তমর্ণ, তখন অগ্রজেরাই যেন অনুসরণ করেন তাঁকে। ১৯৩১ সালের 'সন্দেশ' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'সে' গল্পটির সূচনা হলো যখন, তাঁর রচনায় তখন থেকে দেখা দিচ্ছে নূতন একটা উদ্ভটের ভঙ্গি, যেখানে তিনি চাইছেন 'বিশুদ্ধ হাসি, তাতে বুদ্ধির ভেজাল নেই।' অনেকদিন পর নির্ভেজাল এই হাসির মরিয়া চেষ্টায় স্মৃতিরত্নমশায়ের গোলকীপারি থেকে হাঁচিয়েন্দানি কোরুস্কুণা পর্যন্ত অনেক কিছুই শুনতে পাই আমরা 'সে' গল্পের অসম্ভব হিসেবে। এই অসম্ভবের সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের মনে সুকুমার রায়ের রীতি যে কাজ করে কিছুটা, তা লক্ষ করা শক্ত নয়। সংগতিহীনভাবে এক থেকে আরেকটায় ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে চলবার ভঙ্গিতেই শুধু নয়, হাঁচিয়েন্দানি ধরনের শব্দকল্পনাতেও সুকুমার রায়ের হ্যাংলাথেরিয়াম বা চিল্লানোসোরাসের কথা মনে পড়তে পারে কারো, প্রভেদ কেবল এই

একজন মানুষ, অন্যেরা জীব মাত্র। গেছোবাবা আর গেছোদাদার নামের সাদৃশ্যটাও নিশ্চয় উড়িয়ে দেবার নয়। আর তারপর, 'খাপছাড়া' বা 'ছড়া'য় যখন পৌঁছবেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর রচনায় তখন সুকুমার রায়ের চলাচল আরো প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে এইসব উচ্চারণে: 'জজ বলে, গোঁফ পেলে রবে মোর সম্মান' (ছড়া ৪) বা 'রামছাগলের গম্ভীরতা কেউ করে না মান্য' (ছড়া ১) কিংবা দণ্ডবিধান হিসেবে 'লাশা হতে শ্বেত কাক খুঁজিয়া / নাসাপথে পাখা দাও গুঁজিয়া / হাঁচি তবে হবে শত শতবার / নাক তার শুচি হবে ততবার' [ছড়া ১]। সুকুমার রায় জানবার পর এসব লাইন আমাদের আর অপরিচিত লাগে না।

কেবল রবীন্দ্রনাথ নন, অবনীন্দ্রনাথও তাঁর শেষ পর্বে যখন 'কল্পনার হিস্টিরিয়া'য় ভরিয়ে দিতে চান লেখা, তিনিও হয়তো কিছু ইশারা ইঙ্গিত পান সুকুমার রায়ের সান্নিধ্য থেকে। তাঁর 'খাতাঞ্চির খাতা' ছাপাও হয়েছিল 'সন্দেশ' পত্রিকায়। সুকুমার রায় বেঁচে ছিলেন তখন, আর এ-গল্পের জন্য ছবিও এঁকে দিয়েছিলেন তিনি। অবনীন্দ্রনাথের আরো অনেক লেখার মতো 'খাতাঞ্চির খাতা'তেও আছে ভাবানুবাদ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও ঠিক যে তাঁর স্বাধীন বর্ণনা-কল্পনাও জুড়ে আছে এর মধ্যে। এ-বইটির নিকটসময় থেকে তাঁর লেখায়ও আমরা দেখতে পাব মেজাজের একটা বদল। দেখব যে নিবিড় স্বপ্নাচ্ছন্নতার মণ্ডল থেকে, আবেশ বা কারুকার্যের রঙিন বা ধূসর পৃথিবী থেকে নিজেকে তিনি সরিয়ে আনছেন উদ্ভটের বুকে, যেখানে পুঁথিতে পালায় গল্পে-কবিতায় কেবলই উচ্ছল আর রঙ্গম' হয়ে উঠছে তাঁর কলম। সেসব রচনায় মর্যাদাময় অনেক পৌরাণিক চরিত্রকে একটানে তিনি নামিয়ে আনতে পারেন অবাধ পরিহাস্যতায় কিষ্কিন্ধ্যা বা লঙ্কাকে মিলিয়ে নিতে পারেন জোড়াসাঁকোর আশেপাশে এবং লিখতে পারেন:

> যেমনি এই কথা বলা, অমনি পুজোর কোশা ছুঁড়ে মেরেছে ইন্দ্রজিৎ বিভীষণের মাথায়। বিভীষণ চিৎপটাং—তেলো ফেটে রক্তপাত। পড়ে পড়েই বলছেন—লক্ষ্মণ, শীঘ্র বেটাকে পেড়ে ফেল। (মহাবীরের পুঁথি)

অথবা সেখানে তুড়িজুড়ি গান গায়:

> পাগলে কি না বলে রামছাগলে কি না খায়
> রামঃ, কান দিতে নাই লোকের কথায়।
>
> (যাত্রাগানে রামায়ণ)

কিংবা:

> চুপ দ্যান চুপ দ্যান রামচন্দ্র এসতেছেন
> পদশব্দ হতেছেন শ্রবণগোচর।

বা কুম্ভকর্ণের সংলাপ:

> কুম্ভকর্ণ অবতার রক্ত খায় ভারে ভার
> কুম্ভ কুম্ভ কুম্ভ ব্রহ্মরক্ত তপ্ত তপ্ত
> শক্ত শক্ত দুম্বার হাড় আছে জুস তার
> কুম্ভ কুম্ভ কুম্ভ করে পার।

তখন, এসব অংশের পাশে 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'-এর রচয়িতাকে মনে পড়তে পারে একবার। এটা হয়তো কাকতালীয় নয় যে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর এ ধরনের লেখাগুলি শুরু করেছিলেন 'সন্দেশ' পত্রিকায় 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ছাপা হবার বেশ কিছু পর থেকে।

অথচ, কৌতুকের চরিত্রে এঁদের রচনার পরিণাম ঠিক একরকম হয় না। অবনীন্দ্রনাথের পালাপুঁথিগুলি ভরাট হয়ে উঠছে ঘটনার পর ঘটনায়, খ্যাপামির পর খ্যাপামিতে যেন শেষ নেই তার। রবীন্দ্রনাথেরও গল্পছড়া কখনো শব্দের খেলায় কখনো চরিত্রের সমাবেশে ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে কেবলই। কিন্তু সুকুমার রায়ের লাবণ্য আর সাচ্ছন্দ্য সেখানে নেই। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা লেখার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন একবার, পরিমাণসামঞ্জস্য রাখতে পারেননি বলে তাঁর কবিতা আটকে গেছে গদ্যের সীমাতেই। সেই কথাটিকে আমরা ঘুরিয়ে আনতে পারি এখানে, রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের কৌতুকসৃষ্টির সমস্যাতেও। 'সে' এক হিসেবে নিশ্চয় স্মরণীয় রচনা, 'খাপছাড়া' বা 'ছড়া'র মধ্যে শব্দে-ছন্দে প্রতিমায় রবীন্দ্রনাথের সমস্ত শক্তির ঝলকানি দেখতে পাই নিশ্চয়, কিন্তু এর কোনোটাতেই মন খোলা-একটা জায়গা পায় না, উপাদানের বাহুল্যে একটু যেন আড়ষ্ট হয়ে আসে তাদের কল্পনা। সত্যজিৎ রায় অনুযোগ করেন, রবীন্দ্রনাথের ছড়ার প্রথম লাইনেই যখন দেখি 'শিরস্থ' তখনই আমাদের কৌতূহল চলে যায় মিলের দিকে, বক্তব্যটা হয়ে যায় গৌণ। সেকথা অনেকসময় ঠিক বটে, কিন্তু এই মিলের দিকেই যে রাবীন্দ্রিক ছড়ার একমাত্র টান তা নয়, আর অন্যপক্ষে সুকুমার রায়ের লেখাতেও মিলের চমৎকারিত্ব মাঝে মাঝে আমাদের মন কাড়ে। মর্যাদায় / লজ্জা পায়, বক্তৃতা / সত্যি তা, শাঁখচুনি / ডাঁকছুনি, দিন সে / হিংসেয়, চিৎপটাং / পিঠে-সটান, ঘেঁষ্‌টে / ভেস্তে, নাচন পায় / আচমকায়, বা এই ধরণের মিলে সুকুমার রায়ও আমাদের চমকে দেন মাঝে মাঝে। কথটা বরং এই যে, বক্তব্যের বা ছবিরই একটা ঠাসবুনোট তৈরি হয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের ছড়ায়, অতিবাচন এখানেও ভর করে তাঁকে, আর তাঁর খেয়ালটাও যেন গড়ে ওঠে প্রায় বুদ্ধির জোরে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বটে 'বিশুদ্ধ হাসি, তাতে বুদ্ধির ভেজাল নেই,' কিন্তু সেই বুদ্ধির চাতুর্য এখানে পদে পদে আচ্ছন্ন করে তাঁকে। খেয়ালী হিসেবে খেয়ালের জগতে যান না তিনি, সেটাকে বানিয়ে তোলেন কুশলী হিসেবেই। আর অবনীন্দ্রনাথের খেয়াল আসে অজস্রতায় ঝাঁপিয়ে, কুশলতাকে যেন তখন গ্রাহ্য করেন না একেবারেই, স্রোতের টানে ভেসে চলেন সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে, আর সেই কারণে সেখানেও খেই হারিয়ে ফেলে ছোটোদের মন। সুকুমার রায় জানেন এ-দুয়ের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্যের পথ। কৌশলকে কীভাবে লুকোতে হবে আর বলতে হবে কতটুকু, সে-বিষয়ে তাঁর পরিমিতি-বোধই তাঁর সবচেয়ে বড়ো সম্বল।

'পাগলা দাশু'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'তাঁর ভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল সেইজন্যেই তিনি তার বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরেছিলেন।' এখানে এই 'সেইজন্যেই' অব্যয়টি লক্ষ্য করবার মতো। এও আমাদের

মনে পড়ে যে লুইস ক্যারল বা লিয়ারও এই রকমই 'বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির' মানুষ, আর তাঁদের হাসির জগৎ গড়ে উঠেছিল এরই সঙ্গে এক আড়াআড়ি সম্পর্কে। বৈজ্ঞানিক এই মন মানবচরিত্রের অনুপুঙ্খগুলিকে দেখতেও পায় যেমন, তেমনি তাকে খেয়ালের মধ্যে সাজিয়ে নিতে পারে রচনাগত এক যাথার্থ্যে।

এই যাথার্থ্যে, তাঁর ছড়াগুলির শব্দ আর ছন্দ বিষয়ে কেবলই সতর্ক থাকতে হয় সুকুমারকে, স্বতঃস্ফূর্ত খুশির ওপর নির্ভর করেন না তিনি। 'প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি'র মতো লেখাটির মজাও যে তৈরি করতে হয়েছিল কত বদলের মধ্যে দিয়ে, মুদ্রিত পাণ্ডুলিপি থেকে সকলেই দেখতে পাবেন সেটা। কিন্তু কেবল পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রণে নয়, পত্রিকা থেকে বইতে নেবার সময়েও রোগাচ্ছন্ন কবি নিজেকে যে কতটাই ব্যস্ত রাখেন এই শোধনের কাজে, 'সন্দেশ' এর সঙ্গে 'আবোলতাবোল'-এর লেখাগুলি মিলিয়ে দেখলে তা বোঝা যায়। বোঝা যায় যে, পত্রিকাপাঠকদের প্রশ্রয় পাবার পরেও সুকুমার রায় তৃপ্ত হন না নিজে, গ্রহণবর্জনে সচেতন রাখেন তাঁর বৈজ্ঞানিক / শিল্পী মনকে। এই সচেতনতায় 'সাবধান' কবিতার 'মহামহোপাধ্যায় গজিয়েছে পুচ্ছ'র মতো অংশকে ছেড়ে দেন হয়তো একটু ভারি শোনাচ্ছে বলেই। ছেড়ে দেন 'দেখ না পাঁড়েজি সেথা স্নান করে নিত্য / তবু তো সারে না তার বায়ু কফ পিত্ত'র মতো দুটি লাইনও, কেননা এ-কথাটার একটা বাস্তব সংগতি আছে, মানে হয়ে যায়, গোটা কবিতার সঙ্গে বেমানান লাগে সেটা। ছেড়ে দেন 'কুমড়োপটাশ' থেকে শেষ স্তবকের অকারণ বিস্তার : 'কুমড়োপটাশ চটলে পরে ঘটবে তখন কি যে / বলব কি ছাই বুঝাই কারে বুঝতে না পাই নিজে,' কেননা এর সব কথাটাই বলা আছে এর আগে সারগর্ভ শব্দ তিনটিতে : 'বুঝবে তখন ঠেলা'!

শেষ এই কবিতাটিতে অবশ্য বাড়ানোও আছে একটা টুকরো। চারের স্তবকটা লেখা হয়েছে নূতন ক'রে, আর তারই ফলে আমরা পেয়েছি 'হুঁকোর জলে আলতা গুলে লাগায় গালে ঠোঁটে'র মতো অনবদ্য লাইন। একটি দুটি এ-রকম নূতন লাইনে অথবা ঈষৎ পালটে দেওয়া লাইনে কতখানি যে বদলে যায় স্বাদ, তার আরো দু-একটি উদাহরণ বলা যায় এখানে। আজ ভাবাই শক্ত যে 'গোঁফচুরি'র প্রসিদ্ধ শেষ লাইন দুটি আগে ছিল :

গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি কারো বোঝা?

'গোঁফের আমি গোঁফের তুমি এই ত বুঝি সোজা।' 'বোঝা'র বদলে 'কেনা' শব্দটি আসবার সঙ্গে সঙ্গে এখানে এসে যায় একটা বাড়তি মাত্রা, গোঁফের স্বাধীন সত্তা, আর 'তাই দিয়ে যায় চেনা'র ঘোষণাটি গোটা রচনাকে তুলে নিয়ে যায় চির স্মরণীয়তায়। কিংবা ধরা যাক 'কাঠবুড়ো'। দুটি লাইন বর্জিত হয় এখানেও, বেশ কয়েকটি শব্দেরও হয় বদল। কিন্তু সেসব বদলের চেয়ে অনেক জোর নিয়ে দেখা দেয় সামান্য একটি হেরফের, যখন 'আকাশেতে ঝুল নাই, কাঠে কেন গর্ত' থেকে সরে এসে লেখা হলো 'আকাশেতে ঝুল ঝোলে কাঠে তাই গর্ত।' প্রথমটিতে দুয়ের মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। আকাশেও কোনো অসংগতি নেই, কাঠেই বা তবে গর্ত থাকবে কেন,

এই সহজ প্রশ্ন সেখানে। কিন্তু আকাশে ঝুল আছে বলেই কাঠের মধ্যে গর্ত দেখা দিল, এই সম্পর্কের সৃষ্টিতে ছবিটির একেবারে মেজাজের বদল হয়ে গেল মনে হয়।

এই লেখাটি থেকে অবশ্য অন্য একটি ছোটো সমস্যার সামনেও পৌঁছই আমরা। এখানে বর্জিত একটি অংশ ঃ 'কাঠকে যে কাষ্ঠ কয়, এত বড় অন্যায়,' আর 'পূর্ণিমার রাত' পালটে হলো 'একাদশী রাত'। শেষ পরিবর্তনটা কেবল আলো কমাবার জন্যেই নয়, মাত্রা কমাবার জন্যেও বটে। প্রথমটির বর্জনও ছন্দসংগতির কারণেই। চারমাত্রা, ছমাত্রা, আর নানা বিন্যাসের স্বরবৃত্তের ছন্দসিদ্ধ এই কবি কীভাবে যে ওই 'কাষ্ঠ' আর 'পূর্ণিমা' ওখানে লিখতে পেরেছিলেন, সেই এক সমস্যা। দ্রুততা? আকস্মিকতা? প্রথম পাঠে এ রকম অল্প সল্প স্খলন আরো যে ঘটত তাঁর, 'অতীতের ছবি' নামের দীর্ঘ অসম্পূর্ণ এবং অশোধিত রচনাটির মধ্যে তার কিছু চিহ্ন থেকে গেছে। চিহ্ন থেকে গেছে 'বিষম কাণ্ড' ধরনের কোনো-কোনো লেখাতেও, যেখানে স্বরবৃত্ত মাত্রাবৃত্তে আছে এক অস্থির চলাচল! 'তড়বড়িয়ে বুক ফুলিয়ে শুতে যাচ্ছেন রাতে'র পরেই সেখানে দেখা দেয় 'তেড়ে হন হন চলে তিন জন যেন পল্টন চলে'! বইতে নেবার সময়ে এসব নিশ্চয় সামলে তুলতেন তিনি, তবু, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সমকালে ছন্দের টুংটাং না করেও ছন্দোবৈচিত্র্যে যিনি ভরে রেখেছেন লেখা, তাঁর এ-রকম দুচারটি অন্যমনস্কতাও বিস্ময়কর লাগে।

শব্দ আর ছন্দের ধ্বনিগত আকর্ষণ সুকুমার রায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, অনুকার শব্দে ভরে আছে তার লেখা, শব্দব্যবহারের ব্যাকারণগত কৌতুকও তিনি ধরিয়ে দিতে চান পাঠকদের, এসব কথা ঠিক। কিন্তু সঙ্গেসঙ্গেই আমাদের মনে রাখা উচিত যে এখানে আছে তাঁর দ্বিতীয় স্তরের রচনা, অন্তত সুকুমার নিজে নিশ্চয় মনে করতেন তা। আমরা লক্ষ করব যে 'সন্দেশ'এর পাতা থেকে যখন তাঁর প্রথম বইটির রচনা নির্বাচন করছেন তিনি, তখন রচনার বা প্রকাশের কোনো কালক্রম মানেননি সেখানে, বহু রচনা থেকে অল্প কয়েকটিকেই সাজিয়ে তুলেছেন তখন। সে-নির্বাচনে 'খিচুড়ি' আর 'শব্দকল্পদ্রুম' ছাড়া আর কোনো লেখাই নেই যেখানে পাঠককে ভর করতে হবে কেবল শব্দের খেলায় বা নানার্থক ক্রিয়াপদের দৃষ্টান্তে। সত্যি বলতে, এই ক্রিয়াকৌতুক বেশিক্ষণ তার টান ধরে রাখতে পারে না, 'খাই খাই' এর মতো রচনাকে একটু অস্বস্তিকর দীর্ঘ বলেই মনে হতে থাকে, মনে হতে থাকে কেবল লঘুচালে এক তালিকাতৈরির ছল, প্রকারান্তরে যেন ব্যাকরণ শেখানো।

সেই লেখাগুলিকে ছেড়ে দেন সুকুমার রায়। ছেড়ে দেন সেইসব লেখাও, যেখানে আছে সরল কবিত্ব, রাবীন্দ্রিক পদ্ধতিতেই যেখানে তিনি লিখতে পারেন 'আজব খেলা' বা 'মেঘ', 'আনন্দ' বা 'শিশুর দেহ'। 'শিশুর দেহে মূর্তি নিল আমার ভালবাসা' 'যে আনন্দ সকল সুখে যে আনন্দ রক্তধারায়' 'মাথায় জটা মেঘের ঘটা আকাশ বেয়ে ওঠে' বা 'ভোরের ছবি মিলিয়ে দিল দিনের আলো জেবলে'র মতো উচ্চারণে তেমন স্বতন্ত্র কোনো মহিমা নিশ্চয় নেই। কিন্তু 'সন্দেশ' পত্রিকায় যখন ছাপা হচ্ছে বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'ফলের কবিতা'র ছন্দোবদ্ধ তালিকা, কিংবা সত্যেন্দ্রনাথের

'তাতারসির গান', কিংবা নজরুলের 'রবিমামা দেয় হামা গায় রাঙা জামা ঐ'-এর মতো যাথার্থ্যহীন ছবি, যেসব লেখায় কেবল কাল্পনিকতা আছে কিন্তু কল্পনা নেই কোনো, তখন সুকুমার রায়ের ছোটো ছোটো এই লেখাগুলি তাঁর সহজ কবিপ্রকৃতির একটা স্পষ্ট পরিচয় দেয়। আর, এ কবি একেবারে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠেন তখন, যখন উদ্ভটের সঙ্গেই একাকার করে নিতে পারেন তাঁর এই কবিতার মন।

উদ্ভটের সঙ্গে কী ভাবে মিলিয়ে নেওয়া যায় কবিতা ?

আমরা যখন পড়ি 'বেড়াল মরে বিষম খেয়ে, চাঁদের ধরল মাথা' তখন মন থাকে শুধু খ্যাপামির প্রান্তে। কিন্তু তার পরেই যখন 'হঠাৎ দেখি ঘরবাড়ি সব ময়দা দিয়ে গাঁথা' তখনই সেই অসম্ভবের মধ্যে দেখা দিতে শুরু করে এক ছন্দ। চাঁদ শব্দটির সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্না এগিয়ে আসছে লেখাটিতে, আর সেই জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাওয়া ঘরবাড়ি যেন কোমল করে নিচ্ছে তার চেহারা, তখন তাকে 'ময়দা দিয়ে গাঁথা' বলে মনে করলে যে-খ্যাপামি আমরা পাই তা কবিতারই অন্য নাম। চোখের সামনে একটা রূপ ভেসে ওঠে তখন।

এ লেখাটি অবশ্য, বলেই দেওয়া আছে, একেবারে মৌলিক নয়। কিন্তু এরই ধরণ আমরা হঠাৎ-হঠাৎ দেখতে পাব সুকুমার রায়ের নিজস্ব রচনাতেও, সেইখানে বুঝতে পারি সমকালীন অন্য ছড়াকারদের সঙ্গে—এমনকী লিয়ারদের সঙ্গেও—তাঁর চরিত্রগত প্রভেদ। সেইখানে, গ্রীষ্ম বা বর্ষার লঘু বর্ণনার চালে হঠাৎ তিনি লিখতে পারেন 'তেড়ে আসে পালাজ্বর পৃথিবীর গাত্রে' 'তপ্ত ভীষণ চুলা জ্বালি নিজ বক্ষে' অথবা পৃথিবীর ছাত পিটে ঝমাঝম বারিধার'। ভুতুড়ে খেলার অবিশ্বাস্য সব আদুরে উপকরণের মধ্যে অনায়াসে তিনি মিলিয়ে নিতে পারেন 'জোছন হাওয়ার স্বপ্নঘোড়ার চড়নদার'কে। লুব্ধবেড়ালের মালপোয়া খাবার ইচ্ছের সঙ্গে দেখা দেয় 'গাছপালা মিশমিশে মখমলে ঢাকা' কিংবা 'জটবাঁধা ঝুলকালো বটগাছতলে / ধকধক জোনাকির চকমকি জ্বলে'। হাসির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তাঁর রামগরুড়ের ছানা এড়িয়ে চলতে চায় দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িকে, মেঘের কোণে কোণে হাসির বাষ্পকে, অথবা সেইসব কোণকে, যেখানে

ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাক জ্বলে আলোর তালে
হাসির ঠারে ঠারে।

যদি কোনো পাঠক না জানতেন যে কোন্ লেখা থেকে নেওয়া হচ্ছে এই লাইনকটি, অনায়াসে তিনি একে ভাবতে পারতেন এক স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক বর্ণনার আয়োজন। এইসব কবিতার নজিরেই বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন যে সুকুমার রায়কে 'কবি বলে না-মানতে হলে কবি কথাটায় অন্যায়ভাবে সীমানা টানতে হয়।'

কেবল এই কয়েকটিতে নয়। 'বুড়ীর বাড়ী' কবিতাটি যখন পড়ি, সে কি নিছকই আবোলতাবোল হয়ে থাকে ? থুরথুরে বুড়ির যে ঝুরঝুরে পোড়ো ঘরটি গড়ে উঠছে এ কবিতায় ধ্বনিতে-ছবিতে সে-রকম একটি আশ্চর্য বাস্তব ঘরের ছবি বাংলা কবিতাতে

খুব সুলভ নয়। ষোলো লাইনের এই রচনায় হসন্ত-ধ্বনিগুলির [গালভরা চালভাজা ঝুরঝুরে থুরথুরে ঝুলকালি মিটমিটে পিঠখানা খকখক ঠকঠক ঝাঁটদিলে কাঠকুটো ছাদগুলো বাদলায়] এমন অবিরল প্রয়োগ আছে যে, কাঁচা ওই ঘরের নড়বড়ে ভাবটা পর্যন্ত ধ্বনির মধ্য দিয়ে দেখা দিতে থাকে, পাঠকেরও এখানে 'ভর দিতে ভয় হয় ঘর বুঝি পড়ে'। সুতো দিয়ে বেঁধে রাখবার মতো কিংবা কাঁটা দিয়ে এঁটে নেবার মতো কত ঘরই তো পথে পথে দেখতে পাই আমরা—কলকাতার পথে—যেখানে 'ঝাঁট দিলে ঝরে পড়ে কাঠকুটো যত', যেখানে 'ছাদগুলো ঝুলে পড়ে বাদলায় ভিজে' আর 'একা বুড়ী ঠেকা দেয় কাঠি গুঁজে নিজে।'

বিশেষের মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করে তোলাটাই কবিতার একটা দায়। খামখেয়ালের জগতের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সে-কাজটা যে কত সহজেই করে যান সুকুমার রায়, তার অন্য দু-একটি নমুনা আছে 'কাঠবুড়ো' বা 'ছায়াবাজি'র মতো লেখাতেও। যখন আমরা তাঁর 'মেঘ' বা 'মেঘের খেয়াল' এর মতো কবিতায় নানারকম মেঘের কথা শুনি, তখন সেটা প্রত্যাশিতই থাকে, তার গোটা সুরটাই মূলত বর্ণনার। সেখানে তাঁর কবির চোখ কখনো দেখে 'কচি কচি থোপা থোপা মেঘেদের ছানা', ডানা মেলে চলে যায় তারা, কিংবা কখনো দেখে 'বুড়ো বুড়ো ধাড়ি মেঘ ঢিপি হয়ে' উঠছে, দেখে 'জটাধারী বুনো মেঘ' আর তার পর এক 'ঝুলকালো চারিধার'। এর মধ্যে হাসির কথাটা নেই, একমাত্রিক চালেই চলছে এ লেখা, আকাশের মেঘ 'পলে পলে কত রং কত রূপ ধরে' সেইটেই কবি জানিয়ে দিতে চান এখানে। কিন্তু 'ছায়াবাজি' বা 'কাঠবুড়ো'ও কি নয় এমনি রূপেরই কথা? এসব লেখায় সুকুমার রায়ের বাইরের চালটা সেই বাতিকগ্রস্ত মানুষদের ওপর ভর করছে, ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করছে একজন, সেদ্ধ করে ভিজে কাঠ চেটে খাচ্ছে একজন। কিন্তু আরেকটা ভিন্ন মাত্রায় এ রচনাগুলি আমাদের সামনে পৌঁছে দিচ্ছে দেখবারই একটা চোখ।

গাছের সবুজকে আমরা সবুজ বলেই জানি, নীল বলেই জানি আকাশের নীলকে; কিন্তু দেখতে যে জানে সে দেখে ওই সবুজেরই মধ্যে কত ভিন্ন রকমের সবুজ, নীলে কত ভিন্ন রকমের নীল। ছায়ারও কি নেই তেমনি নানারকম রূপ? রোদের ছায়া আর চাঁদের ছায়া কি এক হতে পারে? আর এই প্রশ্নটা মনে জাগবার পরেই দেখি কৌতুকের ওই 'ছায়াবাজি' কবিতায় পরতে-পরতে খুলে যাচ্ছে 'শিশিরভেজা সদ্য ছায়া' 'গ্রীষ্মকালে শুকনো ছায়া' 'হালকা মেঘের পানসে ছায়া'। আর তখন বুঝতে পারি যে এখানে একজন কবিরই চোখ ঘুরছে 'ছায়ার পিছু পিছু',* আর দেখতে পাচ্ছে কেমন করে প্রহরে প্রহরে ছটফটিয়ে সরে যায় ছায়া, আর নানারকমের রূপ নিয়ে হয়ে ওঠে

* একটি তথ্য এখানে মনে রাখবার যোগ্য। জৈষ্ঠ্য মাসের 'সন্দেশ'-এ ছাপা হয়েছিল একটি ধাঁধা ছ'লাইনের পদ্যে। 'সূর্যের প্রাসাদে আমি সবা সাথে ঘুরি / সারাদিন কত রূপে কত লুকোচুরি। কখন দখিনে বামে কভু আগে পিছে / বিনয়ে লুটাই সদা চরণের নীচে।'' পরের সংখ্যায় ছাপা হলো এর উত্তর 'ছায়া'। আর সেইসঙ্গে রইল 'ছায়াবাজি'র এই লেখাটি।

'পাৎলা ছায়া, ফোকলা ছায়া, ছায়া গভীর কালো।' 'চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া' 'আমড়া গাছের নোংরা ছায়া' 'তেঁতুলতলার তপ্ত ছায়া' আর 'মৌয়া গাছের মিষ্টি ছায়া'দের দেখতে শিখবার পর আমরাও কি এমনি এক ছায়াবাজিতে নেমে পড়তে চাই না? কাঠবুড়ো যে ভরপুর হয়ে আছে নানারকম কাঠের তত্ত্বেগন্ধেস্বাদে, সেটা অবশ্যই ও-কবিতার কৌতুকের ছটা, কিন্তু তারই মধ্য দিয়ে কাঠ জিনিসটাকেও কি নতুন করে দেখতে শিখছি না আমরা? দেখছি না ফাটা কাঠ ফুটো কাঠ টিমটিমে আর জ্যান্ত কাঠের স্পর্শগ্রাহ্য প্রভেদটুকু?

'আবোলতাবোল'-এর সূচনা-কবিতায় ভরসা দেওয়া ছিল যে এ বইতে আমরা পাব 'বেঠিক বেতাল'কে, কিন্তু ওরই সঙ্গে 'স্বপনদোলা'রও ইঙ্গিত ছিল সেখানে। গোটা বইটি পড়বার পর যখন শেষ কবিতায় পৌঁছই, সেখানেও শুনি 'তাল বেতালে খেয়াল সুরে'র কথা, সেখানেও আরেকবার আসে পনদোলা। কিন্তু শেষের এই লেখাটিতে স্বপ্নের জায়গা বেশি, সেখানে কবি সুরের নেশায় দেখতে পান ঝরনাকে, ধ্বনিতে-গন্ধে-দৃশ্যে একাকার করে দিয়ে সেখানে তিনি শুনতে পান 'আলোয় ঢাকা অন্ধকার/ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার।'

এইখানে এসে বুঝতে পারি কেন অনেক সুরিয়ালিস্ট কবির কাছে ননসেন্সকে মনে হয় এত আপনজগৎ। অন্ধকারের গন্ধে ঘণ্টা শুনতে পাওয়া কি উদ্ভট কথা না কবিতার কথা? সীতানাথ বন্দ্যো যে আকাশের গায়ে টকটক গন্ধ পেয়েছিল আর বৃষ্টির পর পেয়েছিল তার মিষ্টি স্বাদ, সে কি কেবল উদ্ভটের এলাকাতেই বন্দী হয়ে আছে, না কি খুলে গেছে কবিতারও দিকে? আর এইখানে এসে, 'শব্দকল্পদ্রুম'এর মতো লেখাকেও একবার উলটো দিক থেকে ছুঁতে ইচ্ছে করে। ফোটা বা ছোটা শব্দগুলির দ্ব্যর্থকতাতেই মন না রেখে, হয়তো লক্ষ করতে পারি যে ফুল ফোটার বা হিম পড়ারও শব্দ আছে একটা, আছে গন্ধ ছুটে যাওয়ারও অদৃশ্য একটা ছবি। ধ্বনিকৌতুকের সঙ্গে সঙ্গে এ কবিতায় সেখানেও একবার চলে যাই আমরা।

এটা ঠিক যে এই ধরনের রচনা অল্পই আছে 'আবোলতাবোল'এ বা তাঁর অন্যান্য কবিতায়। কিন্তু এই প্রবণতা থেকে চেনা যায় তাঁর প্রত্যক্ষণের চরিত্র। এই প্রবণতাতেই সমস্ত 'বিশেষ' চিহ্নিত হয়ে থাকে তাঁর সামনে, সেটা ছড়িয়ে যায় তাঁর সব লেখাতেই। ছায়াধরার খ্যাপা মানুষটি সব রকমের ছায়াকে দেখতে পাচ্ছিল তাদের সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্য, সুকুমার রায়ও আলাদা করে দেখছিলেন সব রকমের মানুষ, সব রকমের ছবি। কাঠ বুড়ো জানত কোন্ কোন্ কাঠের কী স্বভাব, সুকুমার রায়ও প্রায় তেমনিভাবেই যেন বাজিয়ে বাজিয়ে জেনে নেন কোন্ শব্দের কী স্বভাব। আর তারপর, প্রতিটি এই শব্দ প্রতিটি এই মানুষ তাঁর চোখের সামনে জীবনময় হয়ে চলতে থাকে, তাদের পরস্পরের মধ্যে ওলটপালট একটা সম্পর্ক তৈরি করে দেন তিনি, আর সম্পর্কের এই আনন্দই তাঁর কাছে আসে অফুরান এক হাসির রূপ নিয়ে। তখন, একসঙ্গে এসে দাঁড়ায় চাঁদের কলা জোলার মাকু জেলের দাঁড় নৌকো ফানুষ পিঁপড়ে মানুষ রেলের গাড়ি তেলের ভাঁড় এর সবটাই হয়ে ওঠে ভালো, সবটাকেই তিনি করে নেন আপন, আর সেইখানে, সব অসম্ভবের মধ্যে, তিনি পেয়ে যান তাঁর এক ছন্দ।



অর্থ অনর্থ

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য

'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।' শেষ কবিতার এই আঁটো লাইনে সুকুমার রায় নিজেই যেন তাঁর স্বরচিত বিশ্বের পরিচয়লিপি লিখেছেন। এক দিকে নিরর্থ (ননসেন্স), অন্য দিকে প্যাটার্ন—এই দুই বিপরীতের অবিরত টানাপোড়েন দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর শিল্পের বিশ্ব। মূলগত এই যে দ্বান্দ্বিক সংযোগ, এর পশ্চাদ্‌ভূমিতে রয়েছে আরও নানান বিপরীতের ঐক্য-সংঘাত, যার চাপ আমরা লক্ষ করি তাঁর শিল্পের স্তরেস্তরে। এক আজগুবি কল্পলোক আর এক আজগুবি বস্তুলোকের টানটান ভারসাম্যের ওপর উচ্ছ্রিত হয়ে ওঠে তাঁর সহাস্য, অসম্ভব ভুবন। এই সব কারণে তাঁর বিকীর্ণ রসিকতা বহুকৌণিক. একাধারে সরল আর তির্যক। অনাবিল (ইনোসেন্ট) এবং উদ্দেশ্যপ্রবণ (টেনডেনশাস): রসিকতার এই দুই শ্রেণীভাগ করেছিলেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড। কিন্তু এই শ্রেণীভেদ সুকুমার রায়ের ক্ষেত্রে অবান্তর। কারণ, এ-রকম দেওয়াল তুলে তাঁর ভুবনকে দ্বিখণ্ডিত করা সম্ভব নয়। তাঁর ননসেন্স একটা স্তরে হালকা, অনাবিল লীলাহসিত। আবার, অন্য স্তরে তাঁর এই হাসিই হয়ে ওঠে তীর: তীক্ষ্ণ, লক্ষ্যভেদী। এই প্রসঙ্গে 'স্তর' কথাটা হয়তো যথার্থ হলো না। এমন নয় যে ওপরের স্তরে রয়েছে তাৎপর্যহীন, তীব্রতাহীন, লক্ষ্যহীন হাসি ; আর, খানিকটা তফাতে, নিচের স্তরে, গূঢ় ব্যঙ্গ। আসলে, এ যেন পিঁয়াজের খোশা ; পর-পর খোশা ছাড়িয়ে গেলে আস্তরণের তলায় কোনও শাঁসালো লক্ষ্যের নাগাল পাবো না আমরা। খোশা আর শাঁস এখানে এক। শব্দসৃজিত এই খোশারই কোষে-কোষে বেমালুম মিলে-মিশে আছে ননসেন্স আর লক্ষ্যময় শ্লেষ।

এক

'শব্দসজ্জিত' বলতে বোঝাতে চাইছি : সুকুমার রায়ের এই সৃষ্টি শব্দ দিয়ে এবং শব্দ নিয়ে। শব্দের-পাশে-শব্দ গেঁথে, বুনে, তাঁর রঙ্গ; আবার শব্দ নিয়েই তাঁর পরিহাস। এই উভবলতার কারণে তাঁর লেখার অন্যতম থীম হিসেবে শব্দকল্পদ্রুমের (শব্দ আর অর্থের সম্পর্ক/নিঃসম্পর্ক নিয়ে রসিকতার) আবর্তন হ'তে থাকে। অর্থের অনুষঙ্গঘটিত যোগ আছে, 'শব্দকল্পদ্রুম'-এর সঙ্গে 'অভিধান'-এর। অভিধান বিষয়ে লুইস ক্যারল আর সুকুমার রায়ের দুটি চরিত্রের মন্তব্য এতই আলাদা যে তা থেকে আঁচ পাওয়া যায়, এই দুই লেখকের শরসন্ধানের লক্ষ্যও কতটা পৃথক। ক্যারলের লাল রানিবিবির কাছে অভিধান হচ্ছে অর্থবহতার প্রতিমান। সে ব'লে ওঠে : 'as sensible as a dictionary'। অন্য পক্ষে, সুকুমার রায়ের ভাবুকদাদা ফতোয়া দেয় : 'অভিধান···পঞ্জিকা'।

এই লক্ষ্যের তফাৎ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে মতান্তরের আরেকটা উদাহরণ থেকে। শব্দ আর অর্থের সম্পর্ক নিয়ে হাম্‌প্‌টি ডাম্‌প্‌টির সঙ্গে অ্যালিসের এই রকম কথাবার্তা হয় :

'I don't know what you mean by "glory",' Alice said.

Humpty Dumpty smiled contemptuously. 'Of course you don't —till I tell you. I meant "there's a nice knockdown argument for you!"'

'But "glory" doesn't mean "a nice knockdown argument"', Alice objected.

'When I use a word', Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, 'it means just what I choose it to mean—neither more nor less.'

'The question is,' said Alice, 'whether you can make words mean so many different things.'

'The question is,' said Humpty Dumpty, 'which is to be master —that's all.'

এ-বিষয়ে সুকুমার রায় ঠিক বিপরীত বক্তব্য সরাসরি নিজের জবানিতেই পেশ করেন 'ভাষার অত্যাচার' প্রবন্ধে। গুরুত্বময় এই প্রবন্ধ; সাহিত্যে উনি যা করতে চেয়েছেন এখানে তার অনেকটা বিবৃতি পেয়ে যাচ্ছি, মননের গদ্যে। দুঃখের বিষয় 'বর্ণমালাতত্ত্ব'-এ এর যে-পাঠ ছাপা হয়েছে, তাতে রয়ে গেছে গুরুতর প্রমাদ। এখানে 'ভাষার অত্যাচার' থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি : 'এক-একটা কথা আসে অতি নিরীহভাবে চিন্তার বাহনরূপে। কিন্তু চিন্তার আদর তো চিরকাল সমান থাকে না; সুতরাং তাহার আসনচ্যুতি ঘটিতে কতক্ষণ? বাহনটা কিন্তু অত সহজে হটিবার নয়; সে তখন একাই চিন্তার ক্ষেত্রে দাপাদাপি করিয়া আসন জমাইয়া রাখে। ইহাকেই বলি

ভাষার অত্যাচার। ভাষা ভাববাহন কার্যেই নিযুক্ত থাকুক ; সে আবার চিন্তার আসরে নামিয়া আপনার জের টানিতে থাকিবে কেন ?···শব্দঘটার সাহায্যে···গাম্ভীর্য সঞ্চয়ের জন্য অনেকেই সচেষ্ট, কিন্তু শব্দের মধ্যে যে ভাবটুকু ছিল, সে কোনকালে খোলস ছাড়াইয়া পলাইয়াছে কে তাহার খবর রাখে ?'

শব্দকে দিয়ে যথেচ্ছ অর্থ বওয়াতে চাইছে ক্যারলের এই চরিত্র-পাত্র ; অন্য পক্ষে, সুকুমার রায় চাইছেন শব্দের নির্দিষ্ট অর্থের নিষ্কাশন। যেখানে হাম্‌প্‌টি ডাম্‌প্‌টি ভাঙতে চাইছে অর্থের বেড়ি ; সেখানে সুকুমার রায় ঘটাতে চাইছেন, শব্দের দাসত্ব থেকে মনের মুক্তি। হাম্‌প্‌টি ডাম্‌প্‌টির কাম্য, শব্দঅর্থের বিয়োগ ; অথচ এই দুইয়ের সংযোগই সুকুমার রায়ের অভীষ্ট।

ননসেন্স আর অ্যাবসার্ড-এর মধ্যে সারূপ্য আছে, আছে চলাচল। তবে কি সুকুমার রায়কে বুঝতে অ্যাবসার্ডের ব্যাকরণ কিছু সাহায্য করে ? করে না ; কারণ, লক্ষ্য আর পটভূমির দিক দিয়ে সুকুমার রায়ের সঙ্গে অ্যাবসার্ডবাদীর মিলের চেয়ে গরমিলই ঢের বেশি। দর্শনে সাহিত্যে নাটকে 'অ্যাবসার্ড' বলতে বোঝায় ঃ অর্থহীন, উদ্দেশ্যরহিত। এ এক বোধ, যার উদ্ভব অস্তিত্বের তীব্রতম সংকট থেকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পশ্চিম জগতের বিশেষ পরিস্থিতি এই সংকটবোধের অব্যবহিত পটভূমি। ঈশ্বরহীন অনাত্মীয় অবোধ্য এক ভুবনের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ টের পেলো, সে আজ একেবারে হাঘরে নিঃস্ব উদ্বাস্তু ; ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে তার বিশ্বাসের শিকড়। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে, এমন কি নিজের সঙ্গেও, তার ঘটে গেছে অপ্রতিকার্য, চরম, বিচ্ছেদ। 'মুহূর্তে মুহূর্তে শুধু জন্মহীন মহাশূন্যে ঘেরা।' যে-মানুষ তার অস্তিত্বের চতুর্দিকে দেখছে সীমাহীন তলহীন শেষহীন 'না' ; যে-মানুষ প্রত্যেক মুহূর্তে পিষ্ট হচ্ছে জগদ্দল অর্থশূন্যতায়, তার কাছে—স্বভাবতই—শব্দও অর্থহীন। 'শব্দ আর কোনও কথা বলে না,' বলেছেন আইয়োনেসকো। অ্যাবসার্ডপন্থী তাই ভাষার পরিবহন-সামর্থ্যে অবিশ্বাসী ; শব্দ থেকেই সরে যেতে চান তিনি।

সুকুমার রায় যে-পরিস্থিতির মুকাবিলা করেছেন, তা সম্পূর্ণ পৃথক। কোথায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পশ্চিম জগৎ আর কোথায় ১৯১৪ থেকে ১৯২৩-এর বাংলাদেশ ! আশমান-জমিনের ফারাক এই দুই পরিস্থিতির মধ্যে। দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের বাংলাদেশে সংকটের রূপই ছিল অন্য জাতের। আর বিশ্বাসের সমস্যা ? বিশ্বাসের জমিতে তখন এখানে ওখানে ফাটল ধরলেও, আমূলে ভ্রষ্ট হয়ে যায় নি সমস্ত অস্তিত্বের অর্থ। স্থানকালের সমস্ত বিক্ষোভ আর 'না'-এর দাপটের উর্ধ্বে, অমোঘ 'হ্যাঁ' কে সমর্থন ক'রে তখন বিরাজ করছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, যাঁর সর্বান্তিক বিশ্বাসের সৌরবিশ্বে সুকুমার রায়ের অবস্থান। ১৯১৪ সালে সুকুমার রায় লিখছেন ঃ 'যখনই কোনো নৈতিক বা সামাজিক প্রশ্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হই, "কি করিব ?" "কেন করিতেছি ?" এই প্রশ্ন যখনই মনের মধ্যে উদিত হয়, তখনই দেখি সঙ্গে-সঙ্গেই আর একটা প্রশ্ন ছায়ার মতো ঘুরিতেছে, "আমি কে ?" "এই জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য কি ?"··· মানুষের চিন্তা দ্বারে দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিতেছে, "এ প্রশ্নের সমাধান

কোথায় ?" এবং বারবার একই উত্তর পাইতেছে, "অন্বেষণ করিয়া দেখ" ('চিরন্তন প্রশ্ন')। আবার, ব্রাহ্মসমাজের এক প্রবীণ নেতার প্রশ্নের উত্তরেও সেদিনের যুব ব্রাহ্মনেতা সুকুমার রায় বলেছিলেন, জীবনের আদর্শ হচ্ছে, 'সিরিয়স ইন্টারেস্ট ইন লাইফ।' বহু হতাশা আর সংঘাত সত্ত্বেও আমরণ এই বিশ্বাস তাঁর নিষ্কম্প ছিল বলেই নিরর্থের মধ্যে থেকে প্যাটার্ন উদ্ভিন্ন করার রোখ কোনও দিন তাঁর থামে নি। হয়তো তোড়া বাঁধার সঙ্গে আইডিয়লজির বিন্যাসের কোথাও প্রতিসাম্য আছে।

অ্যাবসার্ডবাদীর থেকে সুকুমার রায়ের পরিস্থিতি আরও এই কারণে পৃথক যে এক পরাধীন দেশের লেখক ছিলেন তিনি। পরাধীনতাই সেদিন আমাদের দেশে সৃষ্টি করেছিল তীব্রতম সংকট। শৃঙ্খলিত অবস্থায় স্বাধীনতা জিনিশটাই জল-হাওয়ার মতো এমনই জরুরি শারীরিক সত্যি হয়ে ওঠে যে তা টানটান ক'রে দেয় সমস্ত চেতনাকে। তারই চাপে জোট বাঁধে সাধারণ্য ; খুদে-খুদে আমি'র রেশমি গুটির মধ্যে থেকে খানিকটা বেরিয়ে এসে মানুষের মন খুঁজে পায় স্বাদেশিক ঐকাত্ম্যের কেন্দ্র ; দেশের শহর-থেকে-গ্রামে, প্রান্ত-থেকে-প্রান্তে, বাক-চলাচলের একটি সম্ভাবনা খুলে যায়। শব্দ তখন কথা বলে ; তখন শব্দ হয়ে ওঠে হাতিয়ার, ক্রিয়া। স্বাধীনতার এই সংবিৎ সত্যি বলার, সত্যি হয়ে-ওঠার প্রবর্তনা জোগায়। চেতনার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট এই পরিস্থিতিতে, সুকুমার রায়ের মতন সাহিত্যিকের তাড়না আসতেই পারে আবর্জনা-শব্দ মৃত-শব্দ ফসিল-শব্দ ছুঁড়ে ফেলে দেবার ; তাঁর আকাঙ্ক্ষা জাগতেই পারে শব্দের অন্তঃসার—মজ্জা—ছোঁবার।

শব্দ থেকে নিষ্ক্রমণ নয়, শব্দকে আক্রমণ—নিরর্থক শব্দের বিরুদ্ধে সহাস্য জেহাদ—তাহ'লে, এইটেই হলো তাঁর প্রধান লক্ষ্য। শব্দকে শব্দ দিয়ে ঘা মেরে হাসির ফুলকি জ্বালানোর এই প্রক্রিয়াকে বলতে পারি : শব্দদ্বন্দ্ব। এই শব্দদ্বন্দ্ব বহু ক্ষেত্রেই হয়ে ওঠে নিরর্থ-কে নিরর্থ দিয়ে প্রত্যাঘাত (যেমন : 'দ্রিঘাংচু')। তাঁর সাহিত্যচর্চার মোট ফসল তো বহরে বা পরিমাণে খুব বেশি নয় : তবু, এই নির্বহুল পরিসরের মধ্যেই, ঘুরে-ঘুরে এতবার তিনি ফাঁপা শব্দের গ্যাস বেলুনকে সূচীবিদ্ধ করতে থাকেন যে আমরা টের পাই, এইটেই হয়ে উঠেছিলো তাঁর দিনরাতের জরুরি ধ্যান-জ্ঞান-ক্রিয়া। তাঁর রচনার প্রায় যত্রতত্র থেকে এর কিছু নমুনা তুলে দিচ্ছি। একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে নীচের এই দৃষ্টান্তগুলির সঙ্গে কোথায় যেন মৌলিক মিল আছে রবীন্দ্রনাথে 'হিং টিং ছট' (১৮৯২), 'তোতাকাহিনী' (১৯১৮), 'কর্তার ভূত' (১৯১৯) বা 'তাসের দেশ' (১৯৩৩) ; পূর্বপাঠ : 'একটা আষাঢ়ে গল্প', (১৮৯২)-জাতীয় রচনার। কী সেই মিল ? এই মিল আইডিয়লজির। যা সমস্ত হাস্যব্যঙ্গের বনেদ।

১. বলছিলাম কি, বস্তুপিণ্ড সূক্ষ্ম হতে স্থূলেতে,
অর্থাৎ কিনা লাগছে ঠেলা পঞ্চভূতের মূলেতে—
গোড়ায় তবে দেখতে হবে কোত্থেকে আর কি ক'রে,
রস জমে এই প্রপঞ্চময় বিশ্বতরুর শিকড়ে।
অর্থাৎ কিনা, এই মনে কর্ রোদ পড়েছে ঘাসেতে,

এই মনে কর, চাঁদের আলো পড়লো তারি পাশেতে— ('বুঝিয়ে বলা')

২. তাইতে আছে 'দশমুখে চায়, হজম করে দশোদর,
শ্মশান ঘাটে শষ্পানি খায় শশব্যস্ত শশধর।'
এই কথাটার অর্থ যে কি, ভাবছে না কেউ মোটেও—
বুঝছে না কেউ লাভ হবে কি, অর্থ যদি জোটেও। ('অবুঝ')

৩ হ্যাঁ, মনে করুন গোরু। গো, রু। 'গো' মানে কি? 'গোস্বর্গপশুবাক্ বজ্রদিঙ্‌নেত্রঘৃণিভূজলে', গো মানে গোরু, গো মানে দিক, গো মানে ভু—পৃথিবী, গো মানে স্বর্গ, গো মানে কত কি। সুতরাং এটা সাধন করলে গো বললেই মনে হবে পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, ব্রহ্মাণ্ড। 'রু' মানে কি? 'রব রাব রুত রোদন' 'কর্ণেরৌতি কিমপিশনৈর্বিচিত্রং; 'রু' মানে শব্দ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অব্যক্ত মর্মর শব্দ বিশ্বের সমস্ত সুখ দুঃখ ক্রন্দন—সব ঘুরতে ঘুরতে ছন্দে ছন্দে বেজে উঠছে—মিউজিক অভ দি স্ফীয়ার্স—দেখুন একটা সামান্য শব্দ দোহন করে কি অপূর্ব রস পাওয়া যাচ্ছে। আমার শব্দার্থ খণ্ডিকায় এই রকম দেড় হাজার শব্দ আমি খণ্ডন করে দেখিয়েছি। ('চলচিত্তচঞ্চরি')

৪. অর্থ! অর্থ তো অনর্থের গোড়া!
ভাবুকের ভাত-মারা সুখ-মোক্ষ চোরা, ('ভাবুকসভা')

৫. ওরে হতভাগা, শব্দ নিয়ে তোরা ছেলেখেলা করিস—শব্দ যে কি জিনিস আজও তোরা বুঝলিনে। কিন্তু এখন বুঝবার সময় হয়েছে। এই নাও আমার 'শব্দসংহিতা'—এইটে এখন পড়ে নাও। ওর মধ্যে আমি দেখিয়েছি এই যে—এক-একটি শব্দ এক-একটি চক্র, কেননা শব্দ তার নিজের অর্থের মধ্যে আবদ্ধ থেকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। তাই বলা হয়েছে অর্থই শব্দের বন্ধন। এই অর্থের বন্ধনটিকে ভেঙে চক্রের মুখ যদি খুলে দাও, তবেই সে মুক্তগতি স্পাইরাল মোশান হয়ে কুণ্ডলীক্রমে ঊর্ধ্বমুখে উঠতে থাকে। অর্থের চাপ তখন থাকে না কিনা!
('শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম')

৬. পূর্বে-পূর্ব ঋষিরা এই শব্দমার্গকে ধরে-ধরেও ধরতে পারেনি। কেন? ঐ যে সন্নেসি অমাবস্যার অন্ধকার রাত্তিরে ঘড়ঘড় করে নাক ডাকছিল, কেন ডাকছিল? শব্দমার্গের সন্ধান পেয়েছে কিন্তু তার সঙ্কেতটুকু ধরতে পারেনি। ওরা যে ধরেছে সে-সব শব্দের অর্থ নেই এবং ছিল না—ঢোঁড়া শব্দ। তা করলে তো চলবে না। জ্যান্ত-জ্যান্ত শব্দ, যাদের চলৎশক্তি চাপা রয়েছে, ধরে-ধরে মট্ মট্ করে তাদের বিষদাঁত ভাঙতে হবে। অর্থের বিষ জমে-জমে উঠতে থাকবে—আর ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ করে তাকে কেটে ফেলব। ('শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম')

৭. শব্দের বিষদাঁত যে অর্থ, আগে তাকে ভাঙ। ('শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম')

সুকুমার রায়ের হাস্যবাণ প্রবল এবং বিশেষ-ভাবে বর্ষিত হতে থাকে ক্লিশে-র ওপর, যাকে উনি বলেন 'শব্দঘটা'। ক্লিশে হচ্ছে আমাদের ভাষার ঝালে-ঝোলে অম্বলে মস্তিষ্কহীন অভ্যাসে অতি-ব্যবহৃত, অর্থের অন্তঃসার-শুষে-নেওয়া এঁটো তেজপাতা, যা

এঁটো বলেই অব্যবহার্য। জ্ঞান মনন প্রত্যক্ষণের জড়ত্ব থেকে এদের উৎপত্তি; আবার, এই সব শব্দ, বোধ-চিন্তার পুরো প্রক্রিয়াকেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেয়। দশকে-দশকে এক-এক ঝাঁক শব্দ এইরকম এঁটো তেজপাতা হয়ে যায়। কোন্-কোন্ শব্দ সুকুমার রায়ের আমলে ক্লিশে ছিল, আর কোন্‌গুলো এখন ক্লিশে হয়ে যাচ্ছে, আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষার হালচাল বোঝার জন্যে তা দরকার। যে-সব শব্দকে তিনি ক্লিশে গণ্য করেছিলেন, তার কিছু দৃষ্টান্ত ওপরের উদ্ধৃতিগুচ্ছে পাওয়া যাবে; এখানে আরোও কয়েকটা নমুনা দিই: ত্যাগ, সগুণনির্গুণ, পুরুষপ্রকৃতি, প্রাণ, কারণ, শব্দব্রহ্ম, সনাতন, মায়া, আত্মা, ধর্মলীলা, ইভোলিউশন। 'জাতীয় ভাব', 'ভারতীয় বিশেষত্ব' আর 'হিন্দুত্বের ছাঁচ'—এদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, এই সব নাম দিয়ে যে-জিনিশটাকে আমরা শিল্পে-সাহিত্যে অশনে-বসনে প্রয়োগ করতে ব্যস্ত হয়েছি, তার স্বরূপলক্ষণ বিষয়ে আমাদের ধারণা যত অস্পষ্ট, তার প্রতি আমাদের সম্ভ্রম ততই প্রগাঢ়। 'সেটা হয়তো ভালোই, কিন্তু দশদিক হইতে যথেষ্ট মাত্রায়, অথবা যথার্থভাবে আঘাত না খাওয়ায় জিনিসটা যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে বোধহয় যে ঐ শব্দগুলিকে একবার বিশেষ রকমে ঘাঁটাইয়া দেখা আবশ্যক।'

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক: এত যে অলীক শব্দ, এ-সব নিত্য গজাচ্ছে কোথা থেকে? আর ঠিক কিসের বিরুদ্ধেই বা তাঁর এই প্রতিক্রিয়া? ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যদের আগড়ুম বাগড়ুম? ওরিয়েন্টাল আর্টের বাচাল প্রচারওয়ালাদের ক্লিশে? হয়তো এই সমস্তই, বা, এই ধরণের আরও কিছু অভিজ্ঞতা, তাঁর প্রতিক্রিয়ার সাক্ষাৎ কারণ। কিন্তু শব্দ-অর্থের সংযোগ ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাওয়া; বা, শব্দ ক্রমাগত মিথ্যে এঁটো, হয়ে যাওয়া—এ হলো একটা পুরো প্রক্রিয়া, বা দুষ্ক্রিয়া। সংস্কৃতির শিকড়ের তলায় যে-মাটি, সেখানেই ছড়ানো রয়েছে এর বীজ, এর বিষ।

এটা তো আমাদের প্রত্যেক দিনের অভিজ্ঞতা যে কথা মিথ্যে হয়ে যায়, কাজের সঙ্গে তার যোগ ছিন্ন হয়ে গেলে। সমস্ত কাজের একটা মূল উৎস আছে: সামাজিক উৎপাদন। এই উৎপাদন আর শ্রমের উৎস থেকে ভদ্রলোক-জীবনযাত্রার সর্বাত্মক বিচ্ছেদ, প্রত্যেক মুহূর্তে মিথ্যা করে দিচ্ছে আমাদের বাগ্‌যন্ত্র আর কলমের ডগা থেকে উদ্‌গীর্ণ এই ফেনিল, অনর্গল শব্দস্রোতকে। এই বিচ্ছেদ, মুহূর্তে-মুহূর্তে মিথ্যের ঘুণ ধরিয়ে দিচ্ছে আমাদের অস্তিত্বে; আমাদের, ধর্মীয় রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বা সামাজিক, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে। এই পুরো ব্যাপারটা সুকুমার রায় টের পেয়েছিলেন হাড়ে-হাড়ে। তিনি লিখেছেন: 'পুরাণে লেখে গন্ধর্বেরা বাক্যভোজী, তাহারা নাকি শব্দ আহার করিয়া থাকে। এক হিসাবে, গন্ধর্বশ্রেণীর জীব আমাদের মধ্যে বড় কম নয়।'

মিথ্যে, মৃত শব্দের অবিরাম প্রজনন ভোজন আর প্রচার, এই ভুঁইফোড় গন্ধর্বদের একমাত্র পেশা। অলীক শব্দের বিরুদ্ধে সুকুমার রায়ের আক্রমণ, অনিবার্যত হয়ে ওঠে, অলীক শব্দজীবীর বিরুদ্ধে আক্রমণ। তাঁর জগতে তাই গিজগিজ করে অকর্মা বাবুগোষ্ঠীর নানান টাইপ, যাদের জীবন 'ষোল আনাই মিছে।' তাদের কেউ হয়তো

চেয়ার আলো ক'রে খোশমেজাজে প্রায়-সর্বক্ষণ ঝিমোয় আর হঠাৎ-হঠাৎ জেগে উঠে স্বপ্নে-বেহাত-হওয়া নিজস্ব গোঁফের পশ্চাদ্ধাবন করে, নিজের চতুর্দিকে বিস্তর শব্দের ফাঁকা আওয়াজ তুলে। কেউ-কেউ হয়তো ফুর্তির প্রাণে দিনরাত ঝেড়ে গিটকিরি দেয়ঃ 'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্'। আর এই গন্ধর্বশ্রেণীর একটা বিশেষ টাইপ আছে, যাদের সঙ্গে আমাদের মুলাকাত হয় ঘুরে-ঘুরে। এদেরও পেটের কোনও ধান্ধা নেই, গতরও এদের খাটাতে হয় না। এদের একমাত্র 'কাজ' হচ্ছেঃ মাঝ রাস্তায় এক-একজন শ্যামাদাস বা জগমোহনকে বেমক্কা পাকড়াও ক'রে স্রেফ বাজে বকে যাওয়া, অন্তহীন বেবাক বাজে বকে যাওয়া। সুকুমার রায়ের এই অকর্মক গন্ধর্ব জগতের নির্ভুল বয়ান পাই বাউলের গানেঃ 'কথার চিঁড়ে হাওয়ার দধি/চলছে ফলার নিরবধি'।

সুকুমার রায়ের আমলে তাঁর চার পাশে এত যে অলীক শব্দের আকছার বেসাতি, তার একটি বিশেষ এবং অব্যবহিত কারণের উল্লেখ করা দরকার। কথাপ্রসঙ্গে আগে একবার বলেছি, পরাধীন দেশে স্বাধীনতার সংবিৎ সত্যি হয়ে-ওঠার, সত্যি-বলার, প্রেরণা দেয়। এখানে, এই মুহূর্তে যোগ করতে চাই, এর বিপরীতটাও সত্যিঃ পরাধীনতা আবার মিথ্যাচারী, মিথ্যাবাদী হবারও বিভ্রম, প্রলোভন, জোগায়। সাম্রাজ্যের যুগে বাংলা ভাষায় ইংরেজ শাসনের অশেষ সুফলের কী প্রগল্ভ প্রশংসা! মহারানির রামরাজত্বের কী মুক্তকচ্ছ গুণকীর্তন! পরাধীন আমলে বাংলা ভাষার রক্তস্রোতে কীভাবে মিথ্যের বিষ ছড়িয়েছে, সেদিকে আমাদের ভাষাতাত্ত্বিকদের নজর পড়ে নি আজও। নিরর্থক শব্দের বিরুদ্ধে সুকুমার রায়ের এই যে যুদ্ধ, এ যুদ্ধ ঠিক ভাষাতাত্ত্বিকের নয়, সাহিত্যিকের। সাহিত্যিক বা কবিই পারেন ভাষাকে শুচি আর সত্য করে তোলার জন্যে এইভাবে যুঝতে। এই সূত্রে বিশেষভাবে মনে পড়ে, ইংরেজি সাহিত্যে জয়েস বা অরওয়েল-এর, আর ফরাসি সাহিত্যে ফ্লবেয়র-এর জঙ্গী কাজ। ৯৬১ প্রসঙ্গ সংবলিত একটি ক্লিশে-কোষ সংকলন করেছিলেন ফ্লবেয়র। একটি ব্যাপার লক্ষ করলে অনেকে হয়তো কিঞ্চিৎ মজা পাবেন। ফ্লবেয়র-এর এই তালিকায় এমন একটি ক্লিশে আছে, যেটা নিয়ে সুকুমার রায়ও বিস্তর রঙ্গ করেছেন। সেটা হলোঃ 'অর্থই অনর্থের মূল।'

দুই

ওপরে দেখিয়েছি, শব্দের সঙ্গে শব্দের সংঘর্ষ ঘটিয়ে সুকুমার রায় কীভাবে মুহূর্তে মুহূর্তে রসিকতাকে নিরর্থ থেকে অর্থের দিকে ঘুরিয়ে দেন। এখন দেখবো, তিনি নিরর্থ আর অর্থের বিনুনি তৈরী করেন আরেক ধরণের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে; যাকে বলতে পারিঃ নিয়ম আর বেনিয়মের দ্বন্দ্ব। যখন নিয়ম-মানার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, তখন তাঁর রসিকতায় লক্ষ্য করি ননসেন্সের প্রাধান্য। আবার নিয়মভাঙার উল্টো বিন্দু থেকে দেখলে এই হাসি রূপ নেয় শ্লেষের। এইভাবে তাঁর সাহিত্যে একই সঙ্গে খেলা হয়ে ওঠে মার; আবার মার হয়ে ওঠে খেলা। কথাটা একটু খুলে বলি।

শব্দের যেখানে সীমান্ত, তার ওপারে নিঃশব্দ। এই সীমান্তরেখার গায়ে-গায়ে যে-প্রলম্বিত মধ্যভূমি, সেখানেই নিরর্থের এক্তিয়ার। অর্থাৎ, নিরর্থের এপারে শব্দের,

ওপারে নিঃশব্দের এলাকা। মনে-মনে এই মানচিত্র ছু'কে নিলে বুঝতে পারি: নিরর্থ এক হাতে ছুঁয়ে আছে শব্দকে, অন্য হাতে নিঃশব্দকে। তবে, ননসেন্স সাহিত্যের অধিকাংশই গড়ে উঠেছে নিরর্থের সঙ্গে শব্দের টানাপোড়েনে; নিরর্থের সঙ্গে নিঃশব্দের টেনশন দেখি বিরল কয়েকটি ক্ষেত্রে।

ভাষা-খেলার কথা বলেছিলেন ভিটগেনস্টাইন। ভাষা ঠিক খেলা নয়; কিন্তু এই নিরর্থের সাহিত্য সত্যি-সত্যি খেলার মতন; সাহিত্যের আর কোনও বিভাগ ঠিক এতটাই খেলার মডেল মেনে চলে কি-না সন্দেহ। দাবার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আন্তর্জাতিক চেস কোড বলছে: এই খেলায় 'আকস্মিকের কোনও স্থান নেই'। নিরর্থের জগৎ ঐ দাবার মতোই পূর্ণত নিয়মতান্ত্রিক। ঠিকই, নিয়মগুলো খামখেয়ালি, উদ্ভট, উল্টো-পাল্টা; কিন্তু নিয়ম। ফাঁকা নেই, ব্যতিক্রম নেই, আকস্মিক নেই নিয়মের নীরন্ধ্র আবশ্যিকতায়। সুকুমার রায়ের ননসেন্সে এই নিয়মতন্ত্রের মোক্ষম দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই 'একুশে আইন'; কিন্তু তাঁর জগতের সর্বত্রই দেখা যাবে, এই ঈষৎ উদ্ভট আইনমানা চাল-চলন। এই আবশ্যিকতার সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে চলে তাঁর পদ্যের সুশৃংখল ছন্দ, অমোঘ মিল, নিপাট স্তবক (যেমন: 'ভাল রে ভাল')। লিয়ার, ক্যারল-টেনিএল, ভিল্‌হেল্‌ম বুশ-এর মতন সুকুমার রায়ও সূচীমুখ তীক্ষ্ণ লাইনের ড্রয়িং দিয়ে তাঁর এই আবশ্যিকতার বিশ্বকে স্থির নিরূপিত নির্দিষ্ট চেহারা দেন। এই দিক দিয়ে তাঁর ছবি, তাঁর কথার সম্পূরক।

এই নিয়ম-মানার পাশপাশি ওতপ্রোতভাবে রয়েছে নিয়মভাঙা। অর্থাৎ, সময়ের একই বিন্দুতে, আরেক দিক দিয়ে দেখলে, এই নিয়মশাসিত নিরর্থ-বিশ্বই হয়ে ওঠে আমাদের এই আবোলতাবোল রিয়ালিটির—এবং তার বেহেড আইন-কানুনের—প্রতিকল্প, ক্যারিকেচার ও রূপান্তর। তখন টের পাই, তাঁর রসিকতা বানচাল করতে চায় অমানুষিক নিয়মতন্ত্রকে। যারা কায়েমি আইডিয়লজির জিম্মাদার—ফ্রয়েডের ভাষায়, 'কালচারাল সুপার-ইগো'—তাদের বিঁধতে থাকে তাঁর তির্যক, শাণিত হাসি।

একটা মজার ব্যাপার এই সূত্রে লক্ষণীয়। নিয়মতন্ত্রের মুরুব্বিদের লিয়ার তাঁর লিমেরিকে সর্বদা 'ওরা' ('দে') ব'লে চিনিয়ে দেন। লিয়ার-এর 'ওরা' সুকুমার রায়ের সংসারে বারংবার মামা-রূপে অবতীর্ণ—মামার জোরই তো খুঁটির জোর। সত্যবাহনের মতন দলবাজ ধর্মধ্বজীর সেজোমামা নামক খুঁটি থাকাই তো স্বাভাবিক। একটু অবাক হই, যখন খবর পাই, এমন কি, দুইলেজবিশিষ্ট বিমূঢ় বঙ্গবাসী হুঁকো-মুখো হ্যাংলারও মামার জোর আছে: 'শ্যামদাস মামা তার আফিঙের থানাদার।' সাধে কি, এত জুৎসই লাগে বিশ্বকর্মার অনর্থমারণ মন্ত্র থেকে লাফিয়ে-ওঠা এই স্লোগান: 'নেইমামা তাই কানামামা!'

'গল্প বলা' কবিতায় দেখি: এক অলৌকিক মালী রাজবাড়ির ছাতের ওপর মনের সাধে হঠাৎ বেহাগ গেয়ে উঠতেই রীতি-নীতি-সহবতের যে-একচ্ছত্র মুরুব্বি তেড়ে আসেন, তিনি স্বয়ং রাজমাতুল! বিদ্যাভ্যাসের পাহারাদারিও মামাদের একচেটে। বোধ করি, এর সবচেয়ে স্মরণীয় উদাহরণ পাচ্ছি 'হ য ব র ল'-এর শেষাংশে:

'হুকুম হল—ন্যাড়ার তিনমাস জেল আর সাতদিনের ফাঁসি। আমি সবে ভাবছি এরকম অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি করা উচিত, এমন সময় ছাগলটা হঠাৎ "ব্যা-করণ শিং" বলে পিছন থেকে তেড়ে এসে আমায় এক ঢুঁ মারল, তারপরেই আমার কান কামড়ে দিল। অমনি চারদিকে কি রকম সব ঘুলিয়ে যেতে লাগল, ছাগলটার মুখটা ক্রমে বদলিয়ে শেষটায় ঠিক মেজোমামায় মতো হয়ে গেল। তখন ঠাওর করে দেখলাম, মেজমামা আমার কান ধরে বলছেন, "ব্যাকরণ শিখবার নাম করে বুঝি পড়ে পড়ে ঘুমানো হচ্ছে ?"

ছিলো ছাগল, হয়ে গেল মেজোমামা! স্বপ্নাদ্য এই রূপান্তর-পুরাণের নিহিতার্থ ব্যর্থ হবার নয়! এইভাবে মামাতন্ত্রকে নির্ঘাত ব্যঙ্গে নাজেহাল করতে থাকেন সুকুমার রায়। ফিরিস্তি বাড়িয়ে লাভ নেই। এই সূত্রে ধামাধরা গোষ্ঠমামার বাণবিদ্ধ হাল স্মরণ করাই আপাতত যথেষ্ট।

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড বিদ্রোহে বা বিপ্লবে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না; কিন্তু এর অন্তত একটি ব্যতিক্রম আছে তাঁর রচনাবলিতে। শ্বাসরোধক বিধিব্যবস্থা আর নৈতিক দণ্ডমুণ্ডের দাঁত নখ-ইস্পাত-বর্ম দিয়ে সাজানো প্রহরীবৃন্দকে হাস্যরসিক যখন অকাট্যে বেসামাল ক'রে দেন, তখন এতে ফ্রয়েড লক্ষ করেন, বিদ্রোহের সামর্থ্য, যা ইগো বা চৈতন্যের অপরাজেয়তার সূচক।

তিন

বাস্তবিক, এই প্রখর চেতনাই নিরর্থ-কবিতার সারাৎসার। কিন্তু সুকুমার রায়কে যা বিশেষত্ব দিয়েছে, তা শুধু তাঁর সচেতনতা নয়, আত্মসচেতনতা। এ হলো মনের সেই গুণ, সেই পরিপক্কতা, যার দ্বারা তিনি নিজের আমিকে সরিয়ে নিতেও পারেন, আবার আনতেও পারেন সামনে। তাঁর কবিতায় নিরন্তর চলতে থাকে নিজেকে গোটানো, নিজেকে ছড়ানোর এই দ্বৈত প্রক্রিয়া। যার জন্যে কবিতার নানান খাঁজ, নানান কোণ থেকে বিকীর্ণ হতে থাকে বোধ আর অর্থের অনেক মাত্রা। এই কবির হয়ে-ওঠার ইতিহাস তাঁর আত্মসচেতনতা বাড়িয়ে-তোলার ইতিহাস। এ ইতিহাসে একটি জ্বলজ্বলে মুহূর্ত নিশ্চয়ই তাঁর সেই আশ্চর্য কবিতা: 'বাবুরাম সাপুড়ে'। যার স্বরভঙ্গিতে এমন কিছু আছে, যাতে আমরা টের পাই, কবি নিজেও তাঁর শ্লেষের লক্ষ্য। এ যেন একাধারে মাছের বঁটি আর মাছ হয়ে- ওঠা। কবির আত্মসচেতনতা জিনিশটাই সংক্রামক; পাঠকের মনকেও তা উশকে দেয়। এক-একটা স্বচ্ছ মুহূর্ত আসে যখন আমরা আরশির সামনে খুব তন্ময়, একাগ্র চোখে তাকালে দেখতে পাই: ঘাড়ের ওপরে আমাদেরই মুখ যেন ক্রমে-ক্রমে পাল্টে আদল নেয় রামগরুড় কি হুঁকোমুখো কি কুমড়োপটাশের মুখের।

সমসময়ের সংকটকে স্পর্শ করার সামর্থ্য তাঁর আত্মসচেতনতার আরেক লক্ষণ। এইখানে তফাৎ হয়ে যায় তাঁর সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের। 'খাতাঞ্চির খাতা' বেরিয়েছিলো সুকুমার রায়-সম্পাদিত 'সন্দেশ'-এর পাতায়। এই বইয়েরই অন্তর্গত একটি নিরর্থ-কবিতাকে যদি সুকুমার রায়ের একটি রচনার পাশাপাশি রাখি, তাহলে দুজনের বিশেষত্ব

বুঝে নিতে পারবো আমরা ঃ

পালকের বগ দেখানো বালকের মাথায় টুপি,মোগলের কেষ্ট চুড়ো দুগালে রোঁয়ার থুপি। রাধিকের অধিক শোভা গোঁফের আড়ে ঝুট মীত, সখিদের মনোলোভা মোজার' উপর পীতোধোটি।

[এই কথাগুলোকে সহজেই পদ্যের পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসে ঢেলে সাজানো যায়]

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁটপাটকেল চিৎ পটাং
গন্ধ গোকুল হিজিবিজি
নো অ্যাড্‌মিশন, ভেরি বিজি
নন্দী ভৃঙ্গী সারেগামা
নেইমামা তাই কানামামা
মুশকিল আশান উড়ে মালি
ধর্মতলা কর্মখালি
চীনে বাদাম সর্দি কাশি
ব্লটিংপেপার বাঘের মাসি।

অবনীন্দ্রনাথের লেখায়, আভাসে, ছন্দের নাচে-নাচে দুলে উঠছে লোকায়ত যাত্রার চালচিত্র, সমকালের সংঘর্ষের সঙ্গে যার যোগ খানিকটা আলগা। প্রতিতুলনায়, সুকুমার রায়ের ননসেন্স নাগরিক এবং বিদগ্ধ। শহুরে সমকাল চকিতে ঢুকে পড়ে 'ধর্মতলা কর্মখালি'র উল্লেখে। আর, 'নো অ্যাড্‌মিশন ভেরি বিজি'—এই ইংরেজি বুকনি যেন মুখের ওপর স্প্রিঙ-দরজা মসৃণ বন্ধ-ক'রে দেওয়ার প্রতিধ্বনি। ব্রিটিশ আমলাশাহির বড়ো-মেজো ছোটো সাহেবদের এই নিষেধাজ্ঞা স্মৃতিবিদ্ধ ক'রে রাখে সমস্ত জাতির অপমান আর যন্ত্রণাকে, যা সেদিনের ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন অপঘাত।

রোগশয্যায় যে-ভাবে তিনি 'আবোলতাবোল'-এর কবিতাগুলিকে শুধরেছেন, তাতেও তাঁর আত্মসচেতন মনের ছাপ পড়েছে। 'গোঁফ চুরি'-র প্রথম পাঠ 'সন্দেশ'-এ বেরোয় ১৩২১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে। তখন কবিতাটির শেষ দুই লাইন ছিলো এইরকম ঃ

'গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি কারো বোঝা ?'
"গোঁফের আমি গোঁফের তুমি এই তো বুঝি সোজা।'"

পরে এই পাঠ বদলে গিয়ে দাঁড়ালো ঃ

'গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি কারো কেনা ?
গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা'

মানের দিক দিয়ে নতুন কী ঘটছে শোধরানো পাঠে ? কে মালিক, আর কেই বা মাল—এই সম্পর্কটা ওলট-পালট হয়ে যাওয়ায় গোঁফই হয়ে ওঠে শনাক্তদার। কবিতাটি বহুমাত্রিক তাৎপর্য পেয়ে যায় এর ফলে। মূলত এই একই পরিস্থিতি ট্রাজেডির মাত্রা ছুঁয়েছে দেবেশ রায়ের 'মফস্বলি বৃত্তান্ত'-এ। যেখানে জমির মালিক বারবার পালটে যাওয়ায় জলপাইগুড়ির এক হাভাতে ভাগচাষী কিছুতেই নিজেকে আর শনাক্ত করতে পারে না। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, মরগেনস্টার্ন-এর সেই বীভৎস হাসির কবিতা, যেখানে মৃত-সৈনিকের বেওয়ারিশ হাঁটু পৃথিবীময় ঘুরপাক খেতে থাকে তার মালিকের সন্ধানে।

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে 'প্রবাসী'-তে তাঁর খানকয়েক প্রবন্ধ বেরোয়, যার

কোথাও-কোথাও প্রতিফলন পড়েছে তাঁর আত্মসচেতন মননের। মানুষের মনে-আচরণে, সমাজে, বস্তুবিশ্বে বিপরীতের দ্বন্দ্ব দেখা তো বরাবরই তাঁর রসিকতার উৎস। এ প্রবন্ধগুলির জায়গায়-জায়গায়, বিশ্লেষে আর চিন্তায়, স্পর্শ আছে এই দ্বান্দ্বিক দৃষ্টির। বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই এখানে। যা বলতে চাইছি, তা বুদ্ধিগ্রাহ্য করার জন্যে আমি শুধু এখানে দুটো উদ্ধৃতি দেবো :

১। [বীজ আগে না গাছ আগে এই কূট প্রশ্নের জবাবে লিখছেন] জড় ও চেতনের সন্ধিমুখে জীবনের আদি উন্মেষ যেখানে, সেখানে বীজও নাই বৃক্ষও নাই, কেবল আকার বৈচিত্র্যহীন জীবকোষ পরিপুষ্টির আতিশয্যে ফাটিয়া দুখান হয়, 'এক' সেখানে সাক্ষাৎভাবে 'দুই' হইয়া বংশ বিস্তার করিতে থাকে। ক্রমে জীবন-রহস্যের জটিলতা যখন বাড়িয়া পরিণত ও অপরিণত জীবের প্রভেদ স্পষ্ট হইয়া ওঠে, জীবাবস্থা ও রক্ষাবস্থার স্বাতন্ত্র্যকল্পনা যখন সম্ভব হয়, তখন সেই একই সম্ভাবনার যুগলচিত্র বৃক্ষ ও বীজের অবিচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বের মধ্যে যুগপৎ প্রকাশিত হয়। [নিম্নরেখ আমার দেওয়া]

'দেবেন দেয়ম্'

২· এই একটা হস্তপদবিশিষ্ট জড়পিণ্ডই আমার শরীর নহে—ইহা আমার দেহের কেন্দ্রমাত্র, আসলে সমস্ত জগৎ নিখিলবিশ্ব আমারই বিরাট শরীর। 'চিরন্তন প্রশ্ন'

দ্বিতীয় উদ্ধৃতির সঙ্গে সামীপ্য আছে মার্ক্স-এর এই উক্তির :

'মানুষের বিশ্বজনীনতা বাস্তবে-ব্যবহারে অভিব্যক্ত হচ্ছে সেই বিশ্বজনীনতার মধ্যে, যা নিখিল প্রকৃতিকেই তার অজৈব শরীর ক'রে তোলে।' সুকুমার রায় ১৯১৪ সালে পাকাপাকি মার্ক্সবাদী হয়ে উঠেছিলেন, এরকম হাস্যকর প্রলাপ-বকা আমার সাজে না। আত্মসচেতনতা তাঁর মননেও কতখানি দ্বান্দ্বিক দৃষ্টি চারিয়ে দেয়, আমি আপাতত শুধু এইটুকুই দেখাতে চাইছি।

সুকুমার রায়ের আত্মসচেতনতার সমস্ত ঐশ্বর্য ধরা রয়েছে তাঁর শেষ কবিতায়। মৃত্যুর দিক দিয়ে ভালোবাসাকে দেখতে চেয়েছিলেন রিলকে—তাঁর কাছে মৃত্যু মানে সমাপ্তি নয়, সীমাছেড়া নিবিড়তা। সুকুমার রায় এই কবিতায় নিজের নিরর্থ ভুবনকে এবং নিজেকে—আর কোনও কবিতায় তাঁর আমি এমনভাবে অনুবিদ্ধ নয়—শেষবার দেখছেন মৃত্যুর ছায়ায়। ফলে এই লেখাটি হয়ে উঠলো সেই বিরল কাব্য যার সমস্ত অবয়বে নিরর্থ আর নিঃশব্দের নিবিড় বুনোনি। আসন্ন মৃত্যুর অভিজ্ঞতাজনিত সেই সীমাছেঁড়া নিবিড়তার চাপে, এখানে, এই শেষ কবিতায়, হাস্যরসিক রূপে, তাঁর চরম উত্তরণ ঘটে যায়। পিরান্দেল্লোর ভাষায় একে বলতে পারি : বিপরীতের অনুভবে উত্তরণ। কবিতাটির সমস্ত শরীর জড়িয়ে আছে জীবনের আলোতাপ গুটিয়ে আসা এবং মৃত্যুর হিমহাত ছড়িয়ে পড়ার বিমিশ্র ধূসর বাতাবরণ। এই আবহাওয়ায় : এক দিকে ঘনিয়ে আসে মেঘ-মুলুকের ঝাপসা রাত্রি ; অন্যদিকে, বিচ্ছুরিত হতে থাকে রাম-ধনুকের আবছায়া। যখন অন্ধকার ঢেকে যায় আলোয়, তখনই সুরভিত অন্ধকার থেকে বেজে ওঠে ঘণ্টা। অবশেষে, গান এসে থামে ঘুমের নিঃশব্দ সীমান্তে ; আর, হাসির গঙ্গা এসে মিশে যায় বিষাদের যমুনায়।



সুকুমার রায় : ছন্দ, পদ্যবন্ধ, মিল

পবিত্র সরকার

তিনটে তো মাত্র ছন্দ বাংলা ভাষার—দলবৃত্ত সরল কলাবৃত্ত ও মিশ্র কলাবৃত্ত। তাও সুকুমার রায় তাঁর মোট কবিতার প্রায় শতকরা আটানব্বইটি লিখেছেন দলবৃত্ত আর সরল কলাবৃত্তে। তাঁর 'ছড়া ও কবিতা,' অর্থাৎ নামওয়ালা ও নামহীন সমস্ত পদ্য-জাতীয় রচনায় ছন্দ ব্যবহারের এই রকম একটি হিসাব পেয়েছি—

দলবৃত্ত ছন্দ—৮৭

সরল কলাবৃত্ত ছন্দ—৪৯

মিশ্র কলাবৃত্ত ছন্দ—৫

তোটক—১

প্রাচীন সরল কলাবৃত্ত—১

এই হিসাব একটু এদিক-ওদিক যদিও বা হয় তবু সুকুমার রায়ের কবিতায় দলবৃত্ত আর সরল কলাবৃত্তের বিপুল প্রাধান্য দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। তারও মধ্যে আবার দলবৃত্তের ব্যবহার সরল কলাবৃত্তের প্রায় দ্বিগুণ। অর্থাৎ দলবৃত্তই সুকুমারের সবচেয়ে প্রিয় ছন্দ। 'আবোল তাবোল'-এ দলবৃত্ত ও সরল কলাবৃত্তের অনুপাত ৩১ : ১৮ ; ১৭ : ২১ ; খাই খাই-এর একটি মিশ্রবৃত্ত ছন্দের কবিতা আছে—"পরিবেষণ"।

'খাই খাই'-এর রচনাগুলির সঙ্গে 'আবোল তাবোল'-এর কবিতার বিশেষ কালগত তফাত নেই—দু' বই-এর কবিতাই সমান্তরালভাবে রচিত হয়েছে। 'আবোল তাবোল' এর "খিচুড়ি" ১৩২২-এর মাঘের সন্দেশে বেরিয়েছিল। "পালোয়ান" বেরিয়েছিল

১৩৩০-এর ভাদ্র সংখ্যায়। অন্যদিকে 'খাই খাই'-এর "বর্ষা গেল বর্ষা এল" ১৩২২-এর বৈশাখে প্রকাশিত হয়; "বিষম চিন্তা" প্রকাশিত হয় ১৩২৯-এর আশ্বিনে। অর্থাৎ, দু বইয়েরই কবিতাগুলি প্রায় একই সময়ে পাশাপাশি লেখা। কিন্তু দু'বই-এর মধ্যে যা তফাত, তা এই যে 'আবোল তাবোল' -এর সংকলন সুকুমারের নিজের করা—"রোগ শয্যায় শায়িত কবি এ গ্রন্থটির পরিকল্পনা, কবিতা নির্বাচন, প্রচ্ছদ অঙ্কন এমনকি প্রুফ "সংশোধিত করেছিলেন।" এবং গ্রন্থের মুদ্রণকালে কবি পত্রিকায় প্রকাশিত অনেক কবিতারই পরিবর্ত ও পরিমার্জন করেন।" কিন্তু 'খাই খাই' সুকুমার রায়ের নিজের করা সংকলন নয়, তাঁর মৃত্যুর সাতাশ বছর পরে ১৯৫০-এ 'খাই খাই' প্রকাশিত হয় সিগনেট প্রেস থেকে।

কিন্তু একটি মাত্র ছন্দকে গ্রহণ করে যখন এত বেশি সংখ্যক কবিতা লেখেন সুকুমার—তাঁর সমস্ত কবিতার প্রায় তিনভাগের দু'ভাগ ওই একটি মাত্র ছন্দে—তখন প্রশ্ন ওঠে কী করে তিনি একঘেঁয়েমি এড়ালেন তাঁর কবিতায়? কিংবা প্রায় এক তৃতীয়াংশ কবিতা যখন লিখেছেন সরল কলাবৃত্তে, তখনও কি তাঁর বৈচিত্র্যহীনতার বিপদ ছিল না? এ প্রশ্নটা বৃথা, কারণ আমরা জানি ছন্দ ব্যবহারে বৈচিত্র্যহীনতা সুকুমারের কবিতাকে কখনও তেমন করে আক্রমণ করেনি, ছন্দের 'প্রকার' অবলম্বনে তাঁর সীমাবদ্ধ পক্ষপাত সত্ত্বেও। আসল প্রশ্ন হল, কীভাবে তিনি প্রথাগত বিন্যাসের মধ্যেও সৃষ্টি করেছেন বৈচিত্র? এই আলোচনা আরম্ভ করব সুকুমারের দ্বিতীয় পক্ষপাত সরল কলাবৃত্ত ছন্দে লেখা তাঁর কবিতা-সমবায় দিয়ে এখানেই তাঁর ছন্দ-প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি বাঁধন মেনেছে, অথচ সেই বাঁধনের মধ্যেই কতটা স্বাধীন সঞ্চার চলেছে তাঁর, সেটা লক্ষ করার মত।

দুই

ধরে নিচ্ছি, নানা কবিতায় একই ছন্দ পুনঃপুনরাবৃত্ত হলেও যে বৈচিত্র্যহীনতার ভয় থাকে, অন্তত ভালো কবির ক্ষেত্রে তার পরিমাণ খুব বেশি হওয়ার কথা নয়। ছন্দের ঐক্য ও বিষয়ের বিচিত্রতার টানা-পোড়েনে বিষয় প্রতি ক্ষেত্রেই জিতে যায়, ফলে "বাবুরাম সাপুড়ে, কোথা যাস বাপুরে," এবং "প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি খাসা তোর চ্যাঁচানি" —দুটি কবিতা পরপর একই ছন্দে গ্রন্থিত হওয়া সত্ত্বেও দুটিই আমাদের চমৎকার লাগে, তাদের চার মাত্রার সরল কলামাত্রিক ছন্দের একই ৪-৩, ৪-৩ ছক আমাদের উপভোগকে বিন্দুমাত্র ব্যাহত করে না। আমরা চূড়ান্ত উদাহরণ হিসাবেও লক্ষ করি, এমন অনেক বই আছে যার সমস্ত কবিতাই একই ছন্দে এবং এক পদ্যবন্ধে রচিত—মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী,' দেবেন্দ্রনাথ সেনের সনেটের বই, রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' বা 'কণিকা', জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' যেমন—কিন্তু তাহলেও এ সব গ্রন্থে রূপগত অভিন্নতার সঙ্গে বিষয়গত ভিন্নতার টেনশন খুব বেশি তৈরি হয় না। প্রতিটি কবিতাতেই ভাববস্তু ও তার ভাবিক পরিবেষণ নতুন নতুন চেহারা নেয়, ফলে পাঠক

একঘেঁয়ে বোধ করার অবকাশ পান না। বস্তুতপক্ষে অনুরূপ ছন্দ ও পদ্যবন্ধে কবিরা যখন একটি পুরো বইয়ের সমস্ত কবিতা সাজিয়ে দেন তখন তাঁরা একটা বাড়তি চ্যালেঞ্জ হিসাবেই সেটা করে থাকেন। সুকুমারের মতো ক্ষমতাবান কবির কাছে ছন্দ এইরকমভাবেই একটা খেলা করবার বস্তু হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ 'পাগলা দাশু' গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণের ভূমিকায়[৬] যে কথা বলেছিলেন—সুকুমারের "সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও সচ্ছল গতি, তাঁর ভাব সমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা পদে পদে চমৎকৃতি আনে"—তার মধ্যে বিশেষত ভাব সমাবেশের মধ্যে সুকুমারের বিচিত্র উদ্ভাবন ও অভাবিত উৎকল্পনার ঐশ্বর্য তাঁর ছন্দের নিপুণতা ও সচ্ছলতার প্রতি আমাদের উদাসীন করে রাখে।

সুকুমারের সরল কলাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার বিষয়ের আলোচনা শুরু করতেই দেখি যে, এ ছন্দে তাঁর অতিরিক্ত প্রিয় একটি ছক সেটি ৪-৪-৪-২/৩/৪ এর পঙ্‌ক্তিসজ্জার। যেমন নানা কবিতার এই পঙ্‌ক্তিগুলি—

হাঁস ছিল সজারু, ব্যাকরণ মানি না
হাঁড়ি দাড়িমুখো কে যেন কে বৃদ্ধ
ঠাস ঠাস দ্রুম দ্রাম শুনে লাগে খটকা
গাল ভরা হাসিমুখে চালভাজা মুড়ি
একবার দেখে যাও ডাক্তারি কেরামত
আরে আরে ও কি কর প্যালারাম বিশ্বাস
ঢপ ঢপ ঢাক ঢোল ভপ ভপ বাঁশি
বিদ্‌ঘুটে জানোয়ার কিমাকার কিম্ভুত
আরে ছি ছি! রাম রাম! বলো না হে বলো না
শুনেছ কি বলে গেল সীতানাথ বন্দ্যো
ট্যাঁশ গরু গরু নয়, আসলেতে পাখি সে
খাই খাই কর কেন এস বস আহারে

এই একধরনের ছন্দ-প্রয়োগের মধ্যেও যে নানা ধরনের ধ্বনিগত উপায় অবলম্বন করে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন সুকুমার, সেগুলি হল:

১. পঙ্‌ক্তি ও পর্বের ভিন্ন বিন্যাস

২. মিলের সিলেব্‌ল সংগঠনের বৈচিত্র্য, বিশেষত অনুকার শব্দের ব্যবহার, বিচিত্র সিলেব্‌ল বিন্যাস।

৩. অন্তমির্ল ও অনুপ্রাস ব্যবহার। মনে রাখতে হবে, কবিতায় প্রত্যেকটি আলাদা-আলাদা করে যোগ করেননি সুকুমার, একটি কবিতার মধ্যেই এক বা এক প্রকরণকে আশ্রয় দিয়েছেন।

আগেই বলেছি সুকুমার ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন ৪-৪-৪-২/৩/৪ পর্ব বিন্যাসের পঙ্‌ক্তিকে এবং সরল কলাবৃত্তছন্দে তাঁর বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস অন্তত দলবৃত্তের তুলনায় কম। এই ছকের ব্যাপক প্রাধান্যের মধ্যে কোনো কোনো কবিতা প্রথম আলাদা হয়ে

আসে পঙ্‌ক্তি ও পর্বের, এবং সেই সঙ্গে মিলের ভিন্ন বিন্যাসে। যেমন উপরের পঙ্‌ক্তিগুলির সবই ৪-৪-৪-২/৩/৩ পর্ববিন্যাসকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু দুটি দৃষ্টান্তে পঙ্‌ক্তি মাঝখানে ভেঙে দুটি লাইনে সাজানো হয়েছে, মূলত মিলের মাধ্যমে। "বাবুরাম সাপুড়ে" আর "প্যাঁচা আর প্যাঁচানি" দুটিতেই ৪-৩/৪x এবং ৪-৩/৪x[৫] ছক। এখানেই একই ছন্দের বাঁধুনির মধ্যেও কবিতা দুটির বিন্যাস "গালভরা হাসিমুখে চালভাজা মুড়ি" থেকে আলাদা হয়ে গেল। আবার "হুঁকো মুখো হ্যাংলা"তে প্যাটার্নটি নিলেন তিনি ৪-৩/৪x ৪-৩/৪x ৪-৪/৩y সাজিয়ে ত্রিপদীর পুনরাবৃত্তি নির্ভর:

হুঁকো মুখো	হ্যাংলা	বাড়ী তার	বাংলা
৪	৩	২+২	৩
মুখে তার	হাসি নেই	দেখেছ	
২+২	২+২	৩	
শ্যামাদাস	মামা তার	আফিঙের	থানাদার
৪	২+২	৪	৪
আর তার	কেউ নেই	এছাড়া	
২+২	২+২	৩	

এখানে আবার তাঁর সরল মাত্রাবৃত্তের বহুল গৃহীত রাজপথটি ছেড়ে নতুন একটি সরণি নির্মাণ করলেন তিনি। এইরকম সম্পূর্ণ একটি আলাদা সরণির নিদর্শন 'খাই খাই'-এর শেষ কবিতাটি—

চলে হন্ হন্ ছোটে পন পন
ঘোরে বন বন বাজে ঠনঠন্…ইত্যাদি—

এখানে ২-৪, ২-৪ করে অতি সুন্দর মাত্রা বিন্যাস করেছেন সুকুমার। দু মাত্রার প্রথম অংশটি অতিপর্ব, ৪ মাত্রার দ্বিতীয় অংশটি মূল পর্ব, এই পর্বে দুটি ধ্বন্যাত্মক ও দ্বৈত রুদ্ধদল (closed syllable) রাখা হয়েছে মাত্র, সর্বত্রই তার মিলভিত্তি হল 'অন্ অন্।'

'খাই খাই'-এর 'ডাক্তার ফক্টার/ইস্কুল মাস্টার' বাবুরাম সাপুড়ের ৪-৪/৩x ৪-৪/৩x ছকটিকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু মাত্র দুটি পঙক্তিতে এতে মুক্তদল সাজিয়ে মিল দিয়েছে—'শ হুরে' আর 'লা হো রে'। অন্যত্র মিল দুটি করে রুদ্ধদল সাজিয়ে —CVCCVC[১] চেহারার—ছটফট/চটপট, পাস্তায়/রাস্তায়, সন্ধ্যায়/মন দ্যায়। শুধু যে-মিলের সিলেবুল সংগঠনে এই কবিতার ছন্দ সজ্জা "বাবুরাম সাপুড়ে" বা "প্যাঁচা আর প্যাঁচানি' থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে তাই নয়, এর শুরুতে পর্বগুলিও দুটি করে রুদ্ধদলের—ডাক্-তার, ইস্-কুল। তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতেও রুদ্ধ দলই শুধু আছে। অর্থাৎ "বাবুরাম সাপুড়ে"তে দল বিন্যাস শুরুতে যেখানে এই রকম—

মু-মু-রু[৮]
মু-মু-মু
মু-মু-রু
মু-মু-মু

রু-মু-মু

মু-মু-মু

মু-মু-রু

মু-মু-ম

সেখানে 'ডাক্তার ফাণ্টার'এর প্রথম চারটি পঙ্‌ক্তিতে দল বিন্যাস দাঁড়াচ্ছে—

রু-রু	রু-রু
রু-রু	রু-রু
রু-রু	রু-রু
রু-মু-মু	রু-রু

পদ্যবন্ধ একই ধরনের, কিন্তু দল বা সিলেবলের বিন্যাসে ছন্দের ও ধ্বনির অনুভব কীরকম আলাদা হয়ে যায় তা একদিকে "বাবুরাম সাপুড়ে" আর "প্যাঁচা আর প্যাঁচানি" এবং অন্যদিকে "ডাক্তার ফাণ্টার"এর তুলনা করলেই বোঝা যাবে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও শুধু রুদ্ধদলের সাহায্যে একাধিক সরল কলাবৃত্তের কবিতায় স্পন্দন-সংঘাত তৈরি করেছেন, যেমন—"দূরের পাল্লা" (ছিপখান তিন দাঁড় / তিনজন মাল্লা) কিংবা 'পিয়ানোর গান' (টুক্‌টুক্‌-তুলতুল) এ। শুধু পঙ্‌ক্তি দৈর্ঘ্যের রকমফের নয়, মিল ও পর্বের দল-শরীরের ভিন্নতা।

'অন্যান্য কবিতা'র "বাবু"-তে আবার দল বিন্যাসের চেয়ে পঙ্‌ক্তিবিন্যাসকেই বৈচিত্র্যের মূল নির্ভর করে তোলা হয়েছে। তাতে পঙ্‌ক্তিবিন্যাস মাত্রা ও দলের হিসাব এইরকম—

মু-মু	মু-মু	মু-মু	মু-মু	৪-৪
রু-মু-মু		মু-মু	মু-মু	৪-৪
মু-মু	মু-মু-মু	মু-মু-মু	মু-রু	৪-৪-৪

সরল কলাবৃত্তের মধ্যে চতুর্মাত্রিক পর্ববিন্যাসেই সুকুমারের আগ্রহ ছিল বেশি। ছয় মাত্রার পর্ববিন্যাস লক্ষ করি গুটিকয়েক কবিতায়; 'অন্যান্য কবিতা'-র "আদুরে গোপাল"-এ, যেখানে বিন্যাস ৬-৬-৬-৫। 'খাই খাই'-এর "তৌজিয়ান" "আশ্চর্য" এবং "নিরুপায়"-এ। এগুলির মধ্যে পরের দুটি রচনা একটু প্রাচীন ধরনের, সুকুমার ক্রিয়াপদের সাধুরূপও ব্যবহার করেছেন এ দুটি কবিতায়—"লিখিল," "রাখিলাম" ইত্যাদি। কিন্তু "তৌজিয়ান"-এ পঙ্‌ক্তিতে পর্ববিন্যাস শুধু যে ৬-৬-৬-২ তাই নয়, এতে ওই ছ'মাত্রার পর্বে সেই 'খাই খাই'-এর শেষ কবিতার ধরনে আবার উপ-বিভাগ আছে ২+৪ মাত্রার, প্রথম দু'মাত্রা দু'টি মুক্ত-দল নির্ভর, পরবর্তী ৪ মাত্রা দুটি রুদ্ধ-দল নির্ভর, অধিকাংশ স্থলে। দ্বিতীয় অন্তর্মিলেরও নতুন ধরনের বিন্যাস করা হয়েছে, ৬ মাত্রার প্রতিপর্বের শেষেই মিল রয়েছে, যেমন—

'লাথি চারবার খেয়ে মার্জার ছোটে যার যার ঘরে।'

'অন্যান্য কবিতা'-র "আদুরে গোপাল"-এর বিন্যাস ৬-৬-৬-৫, এতেও অন্তত প্রথম দু'টি পর্বে অন্তর্মিল রয়েছে কোথাও কোথাও। 'অন্যান্য কবিতা'রই "বেজায়

খুশি-"তে পাই একটি বিরল ছক— ৭-৫x/৭-৫x।

অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি, অধিকাংশ সরল কলাবৃত্ত-নির্ভর কবিতায় ৪-৪-৪-২ ৩/৪ পর্ববিন্যাস গ্রহণ করলেও সুকুমার তা থেকে বেশ কিছু জায়গায় সরেও এসেছেন। সরে এসেছেন পঙ্‌ক্তির দৈর্ঘ্যে ও সজ্জায়, মিলের ও পর্বের দলগত সংগঠনে, অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারে এবং অন্তর্মিল ও অনুপ্রাসের সংযোজনে। ধ্বন্যাত্মক শব্দ অবশ্য সুকুমারের হাতে রুদ্ধদলের অস্ত্রটিকেই শাণিত করেছে।

তিন

আরো বহুলভাবে গৃহীত দলবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারে এই সরে যাওয়ার চেহারাটি আরো বিচিত্র। ছেলেভোলানো ছড়ায় দলবৃত্তের যে প্রথাগত ছক তৈরি হয়েছে তা এই—

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে কদমতলায় কে
হাতি নাচছে ঘোড়া নাচছে সোনামণির বে।

ধরনের অর্থাৎ মূলত ৪-৪-৪-১/২ ধরনের পর্ববিন্যাস—পঙ্‌ক্তি দৈর্ঘ ১৩ বা ১৪ মাত্রার। কিছু ব্যাতিক্রমও আছে—'আয়রে আয় টিয়ে, নায়ে ভরা দিয়ে' ইত্যাদির ৪-২/৪-২ সংগঠন যেমন, কিন্তু ৪-৪-৪-১/২ এর কাঠামোই ছড়ার প্রধান বন্ধ, প্রবোধচন্দ্র সেন যাকে বলেন পয়ারবন্ধ। এই পদ্যবন্ধের দলবৃত্তের কবিতা সুকুমার রায়ের অনেক আছে, পরপর কিছু প্রথম পঙ্‌ক্তি সাজিয়ে দিচ্ছি—

আর যেখানে যাও নারে ভাই সপ্তসাগর পার
গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্ম-লোচন শর্মা
কল করেছেন আজবরকম চণ্ডীদাসের খুড়ো
ওই আমাদের পাগলা জগাই, নিত্যি যেথায় আসে
আজগুবি নয় আজগুবি নয় সত্যিকারের কথা
কেউ কি জানো সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা
ও শ্যামাদাস, আয় তো দেখি, বসতো দেখি এখেনে

এই চেনা প্যাটার্নের মধ্যে নতুনত্ব যা দেখি তা প্রধানত মিলের সিলেব্‌ল সংগঠনে। কোথাও মিল একটিমাত্র রুদ্ধদলের বা CVC—পার/ (খবর) দার,—কোথাও তা একটি রুদ্ধদল ও মুক্তদলের শর্মা/বর্মা বা দুটি রুদ্ধদলের—'প্রাণপণ/ভনভন'; কোথাও তা তিনটি মুক্তদলের CV CV CV ধরনের; যেমন এখেনে/দেখে নে! কোথাও অন্তর্মিল এনেছেন 'চার পা তুলি-জন্তুগুলি।' 'জলের প্রাণী অবাক মানি'। কোথাও অনুপ্রাসের ছোঁওয়া দিয়েছেন 'গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন'।

'আবোল তাবোল' এ একেবারে প্রথম "অনামী" কবিতাটিতেই সর্বপ্রথম এই নিয়ত ৪-৪-৪-২ পঙ্‌ক্তি সজ্জার ছক থেকে সরে এলেন সুকুমার, তাকে বিস্তারিত করলেন ১৬ মাত্রার পংক্তিতে ৪-৪-৪-৪/৩ এর কাঠামোয়—"আয়রে ভোলা খেয়াল খোলা স্বপন

দোলা নাচিয়ে আয়।" এই যে মাঝখানে ভেঙে সিঁড়িভাঙার মতো করে সাজিয়েছেন, সেটাও ছড়ার ছন্দে একধরনের নূতনত্ব এবং প্রথম তিনটি পর্বে অন্তমিল দিয়েছেন, যার ফলে পঙ্‌ক্তির মিলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে, ৪x-৪x-৪x-৪y। এই বিস্তারিত ষোলো মাত্রার পঙ্‌ক্তিবন্ধনে, কিন্তু অন্তমিল না তৈরি করে করে লেখা হয়েছে "কি মুস্কিল" কবিতা, যার অবিস্মরণীয় শেষ লাইন,—"পাগলা ষাঁড়ে করলে তাড়া কেমন করে ঠেকাব তায়।" কিন্তু "কি মুস্কিল"-এ শেষে সমস্ত পর্বই ৪ মাত্রার, সেখানে প্রথম কবিতার অধিকাংশ অন্তিম পর্ব তিন মাত্রার। "আহ্লাদী" কবিতাটিতে যেমন। কিন্তু তাতে মিলের ছক একটি রুদ্ধদল ও দুটি মুক্তদল নিয়ে তৈরি হয়েছে—CVC CVCV ধরনে—"আল্-হা-দি/পাল্-লা-দি," "চোখ বুঁজে নোখ গুঁজে" ইত্যাদি। এই রকমই বন্ধের কবিতা "কাঁদুনে" "ভয় পেয়ো না," খাই খাই-এর "হরিষে বিষাদ" পালোয়ান আবার ৪-৪-৪-৪ এর ছকে আর একটি অতিরিক্ত মাত্রাকে ধরেছে। যেমন ধরেছে 'অন্যান্য কবিতা'র "নূতন বৎসর," "বুঝবার ভুল।" কিন্তু ৪-৪-৪-৩ ছকে আছে 'খাই খাই'-এর "বিষম চিন্তা" "অবুঝ," "নাচের বাতিক।" 'অন্যান্য কবিতা'র "গ্রীষ্ম"তে ৪-৪-৪-৪ ছক, কিন্তু এর পঙ্‌ক্তি সংগঠনে প্রতি পর্বেই মিল—

সর্বনেশে গ্রীষ্ম এসে বর্ষ শেষে রুদ্রবেশে
আপন ঝোঁকে বিষম রোখে আগুন ফোঁকে ধরার চোখে

পঙ্‌ক্তি দৈর্ঘ্যের দিক থেকে ভিন্নতম যে ছক সুকুমার খুব বেশি ব্যবহার করেছেন সেটি হল ৪-৪-৪-৪। নিচের প্রতিনিধিত্বসূচক পঙ্‌ক্তিগুলি দেখলেই তা বোঝা যাবে—

শুনতে পেলাম পোস্তা গিয়ে
এই দুনিয়ার সকল ভাল
শিব ঠাকুরের আপন দেশে
"এক যে রাজা"—"থাম না দাদা"
এক যে ছিল সাহেব তাহার
ওরে ছাগল বলত আগে
সান বাঁধা মোর আঙিনাতে
ঠাকুরদাদার চশমা কোথা?
এক যে ছিল রাজা (থুড়ি)
পুব গগনে রাত পোহাল
কারো কিছু চাই গো চাই
বুড়ো তুমি লোকটা ভালো

এই পঙ্‌ক্তির কাঠামোতে কতরকম বৈচিত্র্য এনেছেন তা অনুসন্ধান করা যাক। "সৎপাত্র"-তে তাঁর মিল জোড় পঙ্‌ক্তিতে, কিন্তু ঠিক পরের কবিতা "ভালরে ভাল"-তে একেবারে প্রথম পঙ্‌ক্তির "দেখছি ভেবে অনেক দূর"-এর সঙ্গে মিল পাচ্ছি বাইশটি

পঙ্‌ক্তিরওপারে অবস্থিত সর্বশেষ লাইন "পাউরুটি আর ঝোলাগুড়" এর মিল—এরকম দুরাশ্বয়ী মিলের নিদর্শন আর কোথাও নেই বললেই চলে, গানের ধুয়ার দুরত্বের সঙ্গে এর তুলনাই চলে না।

কিন্তু মাঝখানের ঐ বাইশটি পঙ্‌ক্তির মিলের চরিত্রটি কীরকম? এখানে দেখছি প্রত্যেকটি পঙ্‌ক্তির শেষে আছে ভাল কথাটি। কিন্তু যেহেতু একই কথার হুবহু পুনরাবৃত্তি আক্ষরিক অর্থে মিল নয়, 'ভাল'কে আমরা 'অতি মিল'[৯] বলতে পারি। আসল মিলের বাহন 'ভাল'-র আগে যে কথাটি আছে সেইটি—

এই দুনিয়ার সকল ভাল
আসল ভাল নকল ভাল
সস্তা ভাল দামীও ভাল
তুমিও ভাল আমিও ভাল

দলবৃত্ত ছন্দে সুকুমার রায়ের মত কারিগরি আর বৈচিত্র্য সৃষ্টি আর কোনো বাঙালি কবি করেন নি, এমন-কী সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও নয়। রবীন্দ্রনাথ বেশ খানিকটা করেছেন, কিন্তু এই লেখকের ধারণা বাংলা কবিতায় দলবৃত্তের অধিরাজ সুকুমার-ই।

চার

কোথাও কোথাও সুকুমারের ছন্দ ব্যবহারে দু একটি স্খলন (!) লক্ষ করা যায়। যেমন অন্যান্য কবিতার ছড়া: 'ছিটে ফোঁটা'র শেষ চার লাইনের ছড়াটি—

রং হল চিড়েতন সব গেল ঘুলিয়ে,
গাধা যায় মামাবাড়ি টাকে হাত বুলিয়ে,
বেড়াল মরে বিষম খেয়ে/চাঁদের ধরল মাথা,
হঠাৎ দেখি ঘরবাড়ি সব/ময়দা দিয়ে গাঁথা।

এর প্রথম দু'লাইন সরল কলাবৃত্তে, শেষ দুলাইন দলবৃত্তে। হয়তো এ দুটি আলাদা ছড়াই অনবধানে একটি ছড়া হিসাবে ছাপা হয়েছে। 'খাই খাই'-এর "পরিবেষণ" কবিতায় আবার প্রথম দু'লাইন দলবৃত্তের, বাকি সব লাইন মিশ্র কলাবৃত্তের চেনা ৮-৬ ছকে রচিত। এগুলি সম্ভবত সচেতন ভাবেই করেছেন সুকুমার, কারণ যে-সময়ে এসব কবিতা লিখছেন তখন তাঁর ছন্দের হাত সম্পূর্ণ তৈরি।

কাজেই শেষ পর্যন্ত যেটা ছন্দ রসিকের কাছে উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসে, সে হল তাঁর ছন্দের প্রচলিত ছককে নানাভাবে ভাঙবার চেষ্টা। যে ছন্দকে তিনি খুব কম ব্যবহার করেছেন, তাতে ইচ্ছে করেই তিনি বিশেষ মনোযোগ দেননি, কিন্তু দলবৃত্তে ও সরল কলাবৃত্তে তাঁর উদ্ভাবন অল্প নয়। কবিতা থেকে কবিতা তার বস্তুবিন্যাসেই যথেষ্ট আলাদা হয়ে যায়, তা সত্ত্বেও বস্তুর মেজাজ ও বলবার বিভঙ্গ অনুযায়ী সুকুমার প্রথাগত ছন্দপঙ্‌ক্তিসজ্জা ও স্তবকের বন্ধকে ওলটপালট করেছেন, বিশেষত দলবৃত্তের তিনি বহু নতুন ছক তৈরি করেছেন। ফলে বাংলা ছন্দের রূপকার হিসাবেও তাঁর মর্যাদা কম নয়, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গেই তাঁকে জায়গা দিতে হবে।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. আমরা প্রবোধচন্দ্র সেনের 'নূতন ছন্দ পরিক্রমা'-র (আনন্দ পাবলিশার্স ১৯৮৫) পরিভাষা গ্রহণ করেছি। দলবৃত্ত হল আমরা যাকে ছড়ার ছন্দ হিসাবে জানি; সরল কলাবৃত্ত হল পুরানো পরিভাষায় মাত্রাবৃত্ত, আর মিশ্র কলাবৃত্ত হল তথাকথিত পাঁচালির ছন্দ বা পয়ার ত্রিপদীর ছন্দ।

২. আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু সম্পাদিত 'সমগ্র শিশু সাহিত্য' (১৩৮৩)

৩. দ্রঃ 'সমগ্র শিশু সাহিত্য' (১৩৮৩) ১৬৬ পৃঃ

৪. তদেব

৫. অর্থাৎ প্রথমে চারমাত্রা তারপর তিনমাত্রা এবং তিনমাত্রার শেষ সিলেবলে মিল। মিলের চিহ্ন x বা y। x একরকমের মিল y আরেকরকমের মিল।

৬. 'সমগ্র শিশুসাহিত্য' ১৬২ পৃঃ

৭. C হল ব্যঞ্জন V হল স্বরধ্বনির প্রতীক। CV হল মুক্তদলের চিহ্ন CVC রুদ্ধদলের। [মুক্তদল স্বরে শেষ হয়, যেমন-যা, খা, নে; রুদ্ধদল শেষ হয় ব্যঞ্জনে বা অর্ধস্বরে, যেমন আন্, দ্যাখ, বই, খায়, ইত্যাদি।]

৮. মু = মুক্তদল, রু = রুদ্ধদল

৯. 'অতি-মিল' বিষয়টির জন্য দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের 'গদ্যরীতি পদ্যরীতি' ১৯৮৫ (সাহিত্যলোক) ৫৩ পৃঃ



'অ্যাবসার্ড' সাহিত্য দর্শন ও সুকুমার রায়

বিমল মুখোপাধ্যায়

আলবেয়ার ক্যামু তাঁর Le Mythe de Sisyphe (The Myth of Sisyphus) গ্রন্থে অবিশ্বাস ও সহায়-সম্বলহীনতায় গড়া একালের এই জীবনের মূল্যসম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন—যুক্তি দিয়ে যে জগতের কার্য-কারণের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা যায় তা যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক তা আমাদেরই পরিচিত জগৎ। কিন্তু যে-জগতে মানুষ অকস্মাৎ তার সমস্ত মোহ ও আনন্দ হারিয়ে ফেলেছে, সেখানে সে নিজেকে মনে করে একজন বহিরাগত। এই নির্বাসন বাস্তব না হলেও জীবন প্রত্যয়ের মূলে তা বাসা বাঁধে বলে তার যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি নেই, কারণ সে যেমন হারিয়ে বসে তার পুরাতন মাতৃ-ভূমির স্মৃতি, তেমনি সে আশাহত তার ভবিষ্যৎ-জীবন সম্পর্কেও। মানুষের সঙ্গে তার জীবনের এই বিচ্ছিন্নতার বেদনা থেকে জন্ম নেয় অ্যাবসার্ডিটি-র বোধ।···সাহিত্যের জগতে 'অ্যাবসার্ড' শব্দের প্রবর্তক ক্যামু 'হাস্যকর' অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেন নি।

প্রথার কারাগারে বন্দী মুক্তিকামী ও সত্যসন্ধানী মানুষ জীবনের সার্থকতা সন্ধান করতে গিয়ে মাঝে মাঝে প্রত্যাশিতকে প্রাপ্তির আনন্দে উল্লসিত হয়ে পড়ে। তাই মোহাবচ্ছেদের পর পুনর্বার চলে সত্যসন্ধানের শুরু এবং পুনর্বার নতুন ভ্রমকে আলিঙ্গন। এই চক্রকের হাত থেকে দার্শনিক পন্থায় নয়, বাস্তবিক পন্থায় মুক্তি কোথায়? জ্ঞানাঞ্জনশলাকা যদি ধর্মগুরু ব্যবহার না ক'রে করেন কোন বাণীসাধক তাহ'লে তাঁকে তির্যকপন্থী হতে হয়। সরলভাবে যা উপদেশাত্মক এবং সেই কারণে বিষতিক্ত, তির্যকপথে তার মর্মকে স্পর্শ করে, বোধকে সজাগ করে এবং হয়ত বা

সত্যপথের ইঙ্গিত দেয়। একদা গালিভারের লেখক সুইফট সেই পন্থা নিয়েছিলেন, লুইস ক্যারল নিয়েছিলেন 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড'-এ. এবং সদৃশ না হলেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ ও 'লোকরহস্য'-এ। লুইস ক্যারল পেয়েছিলেন টেনিয়েল-এর মত অসাধারণ ব্যঙ্গচিত্রীকে। বিচিত্রের জগতে ভ্রাম্যমাণ শিশুচিত্তকে অ্যালিসের লেখক ক্যারল এবং টেনিয়েল যথাক্রমে রসে ও রূপে মাতিয়েছিলেন। কিন্তু সুইফট অথবা বঙ্কিম বুদ্ধিমান বয়স্ককে পৃথিবীটাকে নির্বোধের সাদাচোখে নয়, বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে বলেছিলেন। সুতরাং নিরুদ্দেশের পথে কাগজের ভেলা ভাসিয়ে তার গতিপথের দিকে ভাবালুদৃষ্টি ব্যবহার করেন নি তাঁরা। কঠোর বাস্তবই তাঁদের রচনায় এসেছিল অসম্ভব বা উদ্ভটের ছদ্মবেশে। রবীন্দ্রানুজাত সুকুমার রায়-এর রচনাগুলিও তাই। একই দেহে ক্যারল এবং টেনিয়েল হলেও সুকুমার রায় শিশুপাঠ্য সাহিত্য রচনা করেন নি। তাঁর রচনার মর্মস্পর্শে সক্ষম তিনিই, যিনি সজাগ, বুদ্ধিমান ও পরিণত। সুকুমার যদি একান্তই শিশুপ্রিয় হওয়ার সাধনা করতেন, তাহ'লে তাঁকে 'নন-সেন্স' ক্লাব গঠন অথবা 'রাগ বানানো'র চেষ্টা করতে হত না। শিশুদের জগতে 'সেন্স' ই বা কী এবং 'রাগ' ই বা কী? অন্ততঃ এই দুটি ব্যাপার প্রমাণ করে যে, সুকুমার রায়ের রচনাগুলি মোহাচ্ছন্নদের পক্ষে সর্বনাশা এবং সত্যান্বেষীদের পক্ষে জ্ঞানাঞ্জনশলাকা সদৃশ।

ইংরেজিতে যে সব রচনাকে 'অ্যাবসার্ড' অভিধা দেওয়া হয়, আলব্যের ক্যামু যার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, সেই 'অ্যাবসার্ড'কে সুকুমার রায় সাহিত্যিক রূপ দিলেন য়ুরোপের শিল্প-সাহিত্যের জগতে অ্যাবসার্ডিস্ট-আন্দোলন গড়ে ওঠার আগে। 'অ্যাবসার্ডিস্ট'দের প্রাচ্যদেশীয় নেতা তিনি ন'ন, অথবা ন'ন এই আন্দোলনের পথিকৃৎ। কিন্তু মোহমুক্ত সত্যসন্ধানী শিল্পী হিসেবে 'অ্যাবসার্ডিস্ট'দের বক্রপন্থাই হল তাঁর অবলম্বন। বিজ্ঞানের বুদ্ধিমান ছাত্র সুকুমার বিলেত গিয়েছিলেন পিতার ইচ্ছায় ফটোগ্রাফির কলাকৌশলে সুপণ্ডিত হতে। পিতা উপেন্দ্রকিশোর তাঁর নিজের কাজের সূত্রে পেনরোজের পত্রিকার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ঐ পত্রিকার সম্পাদক মি. গ্যাম্বলের চিঠি নিয়ে সুকুমার লণ্ডনের 'L. C. C. School of Photo-Engraving and Lithography'তে বিশেষ ছাত্র হিসেবে কাজ আরম্ভ করলেন। তাঁর দেশে ফেরার আগেই 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। দু'বছর পর ১৯১৫ তে উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হলে ভাই সুবিনয়ের সঙ্গে সুকুমার পৈতৃক কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, কাজের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ মিশিয়ে নিলেন, জাগিয়ে তুললেন ব্রাহ্ম যুবসমিতিকে। বিশ্বের দরবারে রবীন্দ্রনাথ তখন উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। আর আটবছর বয়সে যিনি প্রথম কবিতা রচনায় হাতেখড়ি দিয়েছিলেন সেই সুকুমার 'সন্দেশ'-এর পৃষ্ঠায় 'রাগ বানানো'র ইচ্ছে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। ফ্যানটাসি-র যাদুতে আবালবৃদ্ধকে মজালেন, কিন্তু দুটি উজ্জ্বল চোখের তিরস্কার মিশিয়ে দিলেন ব্যাধিহর Sugar coated ওষুধের মত।

দুই

সুকুমার রায়ের শিল্পের জগৎ প্রচলিত পদ্ধতির নিরিখে 'অচেনা', 'অজানা', উদ্ভটের জগৎ। কিন্তু শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে সুকুমার রায় তাঁর 'বর্ণমালাতত্ত্ব' গ্রন্থে যে-বোধ ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা পাঠককে মুহূর্তে বিচলিত করে দেয়, কারণ স্রষ্টা ও তাত্ত্বিকের মধ্যে বৈপরীত্য অতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'আবোল তাবোল' এবং 'হ্যবরল'-এর সুকুমার যে শব্দ ও অর্থের অদ্বৈত সিদ্ধি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট তত্ত্বভিত্তিতে আশ্রিত ছিলেন তা ভাবতে বিস্ময় জাগে। 'শব্দকল্পদ্রুম" এ যে সুকুমার রাত কেটে যাওয়ার মত সাধারণ ব্যাপারকে 'খ্যাঁশ্ খ্যাঁশ্ ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্' বলে বিশেষিত করেন, মনের নৃত্যকে বোঝান 'ধেই ধেই ধিণ্‌তা' প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক শব্দ দিয়ে এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য বালকের বাড়ির মানুষ ও প্রতিবেশীদের প্রতিক্রিয়াকে বক্তব্যানুযায়ী ছবিতে ধরেন, সেই সুকুমার রায়কে বিচিত্রের পরীক্ষক খেয়ালরসের লেখক মনে হয়। কিন্তু 'ভাষার অত্যাচার'-এ তিনিই যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্য করেন তার সঙ্গে ফ্যানট্যাসির জগতের মানুষটির মিল কোথায়!

> ভাষা যে নিজের অর্থগৌরবেই সত্য, একথা ভুলিয়া সে যখন কেবলমাত্র শব্দগৌরবে বড় হইতে চায়, তাহার অত্যাচার অনিবার্য। চিন্তা কোনোদিনই শব্দের দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে ও সম্যকরূপে ব্যক্ত হইতে পারে না।

শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক কি নিত্য? শব্দের বাচ্যার্থ এবং লক্ষণাগত অর্থকে অতিক্রম করে ব্যাঙ্গার্থই কি প্রাধান্য পায় না? এসব নিয়ে পণ্ডিতসমাজে বিতর্ক দীর্ঘকালের। নবম-দশম শতকেই ভারতীয় ধ্বনিবাদী আলংকারিকেরা কাব্যের ব্যঙ্গার্থের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁরাও কি 'হাঁসজারু', 'বকচ্ছপ', 'গরুগা' শব্দের গভীরে তলিয়ে যেতে সম্মত হতেন? কোন শব্দ ব্রহ্মবিদ্ কবিই 'জল্লাদের' সঙ্গে 'আহ্লাদে'র মিলটা মানতেন না। 'ফুটোস্কোপ' এবং 'আকাশের গায়ে নাকি টক্‌টক্ গন্ধ' কোন প্রকৃতিস্থ কবির মাথাতেই আসত না। সুকুমার যে শব্দের সামর্থ্য ও বক্তব্য প্রকাশের ক্ষমতাকে যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাতে সংশয় নেই। ভাষা যে বক্তব্যকে প্রকাশ করে পাঠককে বোধ ও বোধির জগতে উত্তীর্ণ করে দেয় এবং পাঠক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে তাঁর মনে ভিন্ন জগৎ রচনা করতে পারে তা সুকুমার রায় নির্ভুল দেখিয়েছেন। তাঁর পদ্যের ভাষার বিরাট এক অংশই তো Absurd; অন্তত: দৈনন্দিনতার মধ্যে বা অভিধানের মধ্যে লভ্য নয়। এই ভাষা বোধের চারদিকে দেওয়াল দিয়ে একটি জগৎ গড়তে চেষ্টা করে না, বরং চতুর্দিক উন্মুক্ত করে দেয় পাঠকের চৈতন্যের স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য। এভাষা অভিধানের ভাষা তো নয়ই, অনেকক্ষেত্রে সাহিত্যের ভাষাও নয়। অথচ কবি-সাহিত্যিক তাঁর স্বরাজ্যে সম্রাট হলেও একটা 'ফর্ম' বা 'রূপ' তাকে মানতেই হয়। কিন্তু সুকুমার এ ব্যাপারে অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাবিহারের পক্ষপাতী। এ ভাষাকে কেন বলা হবে না Absurd language? মানুষের জীবনের ভাবনাগুলো সরলরেখায় সুসজ্জিত হয়ে আসে না, জীবনের ভাষাও

স্থানভেদে কালভেদে ভিন্ন, পরিচিত ভাষাতে আসে নিত্যনতুন dimension। অথচ নিত্য বিবর্তনশীল হয়েও ভাব ও ভাষা দাবি করে চিরন্তনতার উচ্চমূল্য। তাই সুকুমার রায় দুটোকেই আঘাত করলেন। 'হযবরল'-এর ব্যাকরণ শিং-কে আমরা ভুলতে পারি না। সে বলে, 'আমি খুব চমৎকার ব্যা করতে পারি, তাই আমার নাম ব্যাকরণ, আর শিং তো দেখতে পাচ্ছ।' ছাগ-নন্দনের এই দাবি বৈয়াকরণদের কিঞ্চিৎ ক্লিষ্ট করবেই। অথচ 'ক্যারলের পত্র'-এ ধীর প্রশান্ত লেখক উত্তম পুরুষে লেখেন :

> আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে বাঙলাদেশে কেউ ব্যাকরণ পড়ে না এবং পড়তে জানে না। অর্থাৎ আমাদের দেশে রসবোধ ছাড়াও আর একটি বোধের বিশেষ অভাব আছে, সেটা ঐতিহাসিক বোধ নয়, সেটা হচ্ছে মুগ্ধবোধ। ব্যাকরণের মধ্যে তাঁরা মাল এবং মশলার পার্থক্য বোঝেন না। ব্যাকরণের মধ্যে তাঁরা ভাষাতত্ত্বের মশলা দেখেন, কিন্তু ইতিহাসের মাল দেখতে পান না।

ব্যাকরণ সম্পর্কে আমাদের একটা প্রচলিত সংস্কার আছে। সেখানে 'মশলা'টাই প্রধান স্মৃতির ধারণ-শক্তির উপরেই তার বলপ্রয়োগ। সুতরাং ব্যাকরণ শিং-এর বিদ্রূপ করার উপযুক্ত কারণ নিশ্চয়ই আছে। ব্যাকরণের সনাতন পণ্ডিতি রীতিতে সুকুমার রায়ের আস্থা ছিল না। ভাষা কাব্য-সাহিত্যের সারাংশ, কিন্তু বিদ্বানেরা তাকে কতকগুলি নিয়মের বশীভূত করে স্বতন্ত্র বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে পরিণত করে উপেক্ষা করেছেন ভাষার ঐতিহাসিক ও সামাজিক তাৎপর্য। সুকুমার একেই বলেছেন 'ইতিহাসের মাল'। Socio-Linguistic বলতে যে বিদ্যাচর্চাকে বোঝায়, সুকুমার রায় অবশ্যই তার কথা বলেন নি। অথচ এই প্রবন্ধ রচনার প্রায় সমকালে ফার্দিনান্দ দ্য স্যস্যুর ভাষাতত্ত্ব আলোচনার জগতে একটি নতুন দিক নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর নিজের ভাষাপ্রসঙ্গে সুকুমার রায় বললেন :

> আমার কোনো কোনো সমালোচক বলেন যে, আমার ভাষাটা খুব প্রাঞ্জল নয়। তার অর্থবোধ হয় এই যে, আমার লেখা পড়লে তাঁদের প্রাণটা জ্বলে কিন্তু জল হয় না।

'প্রাঞ্জল' শব্দটি নিয়ে Pun করলেন সচেতন Satirist সুকুমার। মানুষের প্রতি প্রীতিবশত অপরকে Satire করার বাসনা Satirist-এর থাকে, কিন্তু সুকুমারের সবকিছুর মূলে ছিল নানাবিধ অসংগতিবোধের যন্ত্রণা ও রাগ বানানোর ইচ্ছা।

তিন

জীবনে—ভাবনায় ও কর্মে—বিচিত্র যে অসংগতি তাকে সুকুমার রায় তাঁর নাটকে, গদ্যে ও পদ্যে রূপ দিয়েছেন নতুন পদ্ধতিতে। রবীন্দ্র ভাবিত রোমান্টিক যুগের নাগরিক সুকুমার তাঁর পরিপার্শ্বের মধ্যেই ব্যতিক্রম হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। বিশ শতকের নতুন বিজ্ঞান, নতুন দার্শনিক সিদ্ধান্ত তাঁর চরিত্রের স্বাভাবিকতার পথেই প্রবেশ করল তাঁর সাহিত্যকর্মে। বিশ শতকে বিজ্ঞানী প্লাঙ্ক ও আইনস্টাইন বলেছিলেন, 'apart from the experiences of the subjects there is nothing, nothing, bare nothingness.' ব্যক্তির উপলব্ধিগত সত্যই যখন চূড়ান্ত সত্য তখন নির্বিকল্প

সত্য বলে তো কিছুই নেই। এই শতকের নতুন নাট্যরীতির প্রবর্তকেরা—Absurdist রা প্রচলিত ট্রাজেডি ও কমেডির রীতি ও আদর্শ বদল করে দিলেন। গতানুগতিক নাটক থেকে Absurd নাটকে প্রভেদ ঘটল কয়েকটি বিষয়ে :

১) সনাতন পদ্ধতির নাটকের চরিত্রগুলি নাট্যকারদের দ্বারা সুপরিলক্ষিত এবং সচেতন উদ্দেশ্যাভিমুখী। এই নতুন রীতির নাটকের চরিত্রগুলি যেমন খুব পরিচিত নয়, তেমনি তাদের উদ্দেশ্য অস্পষ্ট।

২) সনাতন পদ্ধতির নাটকের পাত্র-পাত্রীর সংলাপ সুসংগঠিত, কিন্তু অ্যাবসার্ড নাটকের সংলাপ অর্থহীন বাজে কথা।

৩) প্রথানুগত নাটকের কাহিনী আদ্যন্ত সুগ্রথিত, কিন্তু অ্যাবসার্ড নাটকের সূত্রপাত যে-কোন ক্ষেত্র থেকে এবং সমাপ্তিও অনির্দিষ্ট জগতে।

৪) অ্যাবসার্ড নাটকের নাট্যকার পাঠক ও দর্শকের মনে এই বোধ জাগিয়ে দেবে যে, 'the dignity of man lies in his ability to face reality in all its senselessness ; to accept it freely, without fear, without illusion, and to laugh at it.'

মোটকথা, অ্যাবসার্ড নাট্যকারেরা, যাঁরা ছিলেন মূলতঃ অ্যাবসার্ড দর্শনের শিল্পরূপ দাতা, তাঁরা প্রত্যেকেই সচেতন শিল্পী, কিন্তু প্রথানুগত নয়। ফলে তাঁদের রচনায় বহু সময় এসে যায় ভাষাগত অসংগতি, ঘটনাগত আপাত অর্থহীনতা। সমাজের নিয়ম মেনেও অ্যামিডি-কে কেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্ফীত উত্তরীমান মৃতদেহের সঙ্গী হতে হয়েছিল? 'Rhinoceros'-এর ডেইজি এবং বেরেঞ্জার ছাড়া আর সকলে কেনই বা রূপান্তরিত হল গণ্ডারে? আরাবেল অদ্ভুত যুক্তি কিভাবে তুলে দেন বারাঙ্গনার মুখে ধর্মের নির্দেশ যেহেতু প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হওয়া অতএব কেন সে নিজের দেহ অপরের কাছে তুলে ধরবে না? সমাজের চলিত নিয়ম এবং বিশ্বাসকে আঘাত করলেই তাকে 'উদ্ভট' মনে হয়। ফ্রানৎস কাফ্কা-র 'জোসেফকে' জ্যোৎস্নারাতে দু'জন নির্বাক ঘাতকের হাতে যখন প্রাণ বিসর্জন দিল তখন কি জানত তার অপরাধটা কী এবং কার কাছে? বিচার হচ্ছে অথচ আসামীর কৈফিয়ত দেওয়ার নেই। সুতরাং কাফকা-র Metamorphorsis-এর নায়ক গ্রেগোর সামসা যখন বিরাট এক পোকায় পরিণত হয় তখন চমক জাগে না। কী তফাৎ একটা বোধহীন মানুষের সঙ্গে কুকুরের এবং গণ্ডারের?

পাশ্চাত্ত্যের নাট্যকার-ঔপন্যাসিক-গল্পকার প্রচলিত ছক ভেঙে যে পথে বিচরণ শুরু করেছিলেন তার পিছনে Absurd দর্শন ছিল সক্রিয়; তাই ফর্ম-এও তাঁরা এনেছিলেন চলিত রীতির ব্যতিক্রম। কেন তাঁরা ফর্ম ভাঙছেন তারও কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন বিভিন্ন সুযোগে। কিন্তু ছকভাঙ্গা ছন্দ ও ভাষার রূপদক্ষ সুকুমার রায়ের শিল্পচেতনায় যে ছিল এক আশ্চর্য সুমিতিবোধ তা যেন তাঁর তাত্ত্বিক সত্তার সঙ্গে স্রষ্টা সত্তার বৈপরীত্য ঘোষণা করে। ব্যাপারটা আসলে তা নয়। অ্যালবি প্রমুখ Absurdist-দের মত সুকুমারের তত্ত্বোচ্চারণও তাঁর Logical Sense প্রমাণ করে; সেখানে কোন Non-sense utterance নেই। যেমন :

শিল্পীর মনের ভাবটিকে রক্ষা করিতে হইলে এরূপ একটা 'মিথ্যা'র আশ্রয় লওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর ছিল না। শিল্পের হিসাবে অত্যুক্তিটা যথার্থ ভাবসম্মত সুতরাং এক্ষেত্রে সত্যসম্মত।

'মিথ্যা' বলতে এখানে যে অতিশয়োক্তি বা Exaggeration বোঝানো হয়েছে, সুকুমার রায় শিল্পী হিসেবে তার সাধক ছিলেন, প্রচলিত অর্থে 'মিথ্যা'র নয়। Realism বলতে লোকে যা বোঝে তা যে শিল্প সাধনার প্রতিবন্ধক তাত্ত্বিক-সুকুমার তা ভালোভাবেই জানতেন। শিল্পের Reality যে স্বতন্ত্র ব্যাপার, Exaggeration-এর সঙ্গে তার কোন বিরোধ নেই, এমন কি প্রাত্যক্ষিক সত্যের সঙ্গেও নয় তা বুঝেই সাহিত্যের রাজদরবারে যার প্রবেশাধিকার ছিল না, ছিল চিরকালের শত্রুতা, সেই 'ফটোগ্রাফি'কে সুকুমার দিলেন শিল্পের মর্যাদা। সতর্ক প্রাজ্ঞ তাত্ত্বিকের মত 'অতিশয়োক্তি' এবং 'অতিকথন'-এর পার্থক্য তিনি চমৎকার বুঝিয়ে দেন এই বলে :

অতিরিক্ত কথা বলাটাও একপ্রকারের অত্যুক্তি এবং কাব্যের ন্যায় শিল্পেও তা নিন্দনীয়।

'হযবরল' হয়ে যাওয়া জীবনটার মানুষগুলো যখন 'আবোল তাবোল' বকে তখন সুকুমার তাঁর বিদ্রূপের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা ব্যবহার করেন জাগতিক নিয়মকানুন সব ভেঙে। সেগুলি 'অতিশয়োক্তি' হতে পারে, 'অতিকথন' নয়। কাফকা যদি লিখতে পারেন ছিল মানুষ হল বিকটাকার পোকা, ইওনেস্কো ভাবতে পারেন ছিল মানুষ হল গণ্ডার অথবা জ্যান্ত মানুষের চেয়ে মড়া মানুষের বার বেশী, তাহ'লে সুকুমারের বেড়াল রুমাল হতে পারে চন্দ্রবিন্দুও হতে পারে। হিজিবিজবিজের এধার ওধার চতুর্দশ পুরুষের সবার নামই "হিজিবিজবিজ" কেবল শ্বশুরের নাম বিস্কুট। মহাকবি বলেছিলেন, নামে কী আসে যায়! তবে তাঁর মনে পড়েছিল গোলাপের উপমান। কিন্তু সুকুমার বেছে নিলেন এমন নাম যা হাসির ধূম ছুটিয়ে প্রজ্ঞাবান নামীদের কানটি মর্দন করে দিল। জাগতিক হিসেব নিকেশ তালগোল পাকিয়ে গেল যখন দেখা গেল 'সাত দুগুণে ১৪, বয়স ২৬ ইঞ্চি, জমা আড়াই সের, খরচ ৩৭ বৎসর'। প্রচলিত আইন কানুনের দুরবস্থা এমন করে আর কে লিখেছেন ?

শিবঠাকুরের আপন দেশে,
আইন কানুন সর্বনেশে!
কেউ যদি যায় পিছলে পড়ে
প্যায়দা এসে পাকড়ে ধরে,
কাজির কাছে হয় বিচার—
একুশ টাকা দণ্ড তার ॥১

এই শিবঠাকুরটি কে ? আর তাঁর দেশটাই বা কোথায় ? এ যে ইংরেজ-শাসিত জননী ভারতভূমি তা বুঝতে কষ্ট হয় না। কাফ্‌কা-র 'জোসেফকে' জানতই না তার অপরাধটা কী ? ক্যামু-র মিউরসল্টও কি সত্যিই অপরাধী ছিল ? নাই বা হোক তারা অপরাধী। কিন্তু আইন যখন আছে, আসামীও আছে, আইনের জন্যই আসামী

আইন বাঁচাতে গেলে আসামী বানাতে হবে। সুকুমারও একুশে আইন-এর নির্বিচার শাস্তির নিষ্ঠুরতা নিয়ে যেমন ব্যঙ্গ করেছেন, তেমনি আইন ব্যবস্থার Absurdityও চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন:

> প্যাঁচা গম্ভীর হয়ে বলল, 'সবাই চুপ কর, আমি মোকদ্দমার রায় দেব।' এই বলেই কানে-কলম-দেওয়া খরগোশকে হুকুম করল, 'যা বলছি লিখে নাও: মানহানির মোকদ্দমা, চব্বিশ নম্বর। ফরিয়াদী-সজারু। আসামী-দাঁড়াও। আসামী কই?' তখন সবাই বলল, 'ঐ যা! আসামী তো কেউ নেই।' তাড়াতাড়ি ভুলিয়ে-ভালিয়ে নেড়াকে আসামী দাঁড় করানো হল। নেড়াটা বোকা, সে ভাবল আসামীরাও বুঝি পয়সা পাবে, তাই সে কোনো আপত্তি করল না।

হুকুম হল—নেড়ার তিনমাস জেল আর সাতদিনের ফাঁসি। আইনের নির্দেশ, বয়স ও খরচের unit, ন্যায়-অন্যায় সবই তো মানুষের তৈরি এবং দীর্ঘকালীন বলে সত্য বলে স্বীকৃত। কিন্তু জীবনের তথাকথিত মূল্যবোধ গোলমাল হয়ে গেলে 'অতিকথন' বর্জন করে সাহিত্যিক অতিশয়োক্তির শৈল্পিকপন্থা অবলম্বন করতে পারেন বৈকি! শব্দের যে-অর্থ অভিধানে মেলে তাই যে শেষ কথা নয় তা তো পণ্ডিতেরা বলে গিয়েছেন অনেক আগে। সুতরাং আভিধানিক অর্থও প্রচলিত unitগুলোর মতই নাও মান্য হতে পারে। ক্ষতি কি যদি জুতোর নাম হয় অবিমৃষ্যকারিতা, ছাতার নাম প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, গাড়ুর নাম পরমকল্যাণ-বরেষু, কাকের নাম কাক্কেশ্বর কুচকুচে অথবা দ্রিঘাংচু হয়?

চার

য়ুরোপীয় অ্যাবসার্ডিস্টদের একটা প্রচণ্ড জ্বালা ছিল, প্রতিবাদ ছিল, প্রথা ভেঙে নতুন দিনকে স্বাগত জানানোর সদর্থক বাসনা ছিল। নইলে এডওয়ার্ড অ্যালবি 'Transatlantic Review' পত্রিকার মুখপাত্রের কাছে বলতেন না 'the responsibilily of the writer is to be a short of demonic social critic to present the world and people in it as he sees it and say 'Do you like it? If you don't like it change it?' সমকালের সামাজিক প্রথার অনেক কিছুই সহ্য করতে পারেন নি সুকুমার। তাঁর 'হুঁকো মুখো হ্যাংলা' এবং 'রামগরুড়ের ছানা'রা হামেশাই ঘুরে বেড়ায় বাঙলাদেশের সমাজে। 'ট্যাঁশ গরু' যে গরু নয় 'আসলেতে পাখি সে।'—তাকে দেখতে পাওয়া যায় 'হারুদের অফিসে এবং তাও তো নয় চেহারাখানাও তার চেনা-চেনা ঠেকে: চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু, মুখখানা মস্ত,/ফিট্‌ফাট্ কালোচুলে টেরিকাটা চোস্ত।' মোটকথা সে সাগরপারের সাহেব নয়, তাহলে চুল কালো হত না, সে ইঙ্গ-বঙ্গ পরিবারের কুলাঙ্গার। সুকুমার প্রাণভরে রাগ বাণিয়েছেন এই 'রামগরুড়' এবং 'ট্যাঁশ গরু'দের নিয়ে। অর্থকৌলীন্যই যে একালের সামাজিক মানুষের প্রথম ও শেষ কথা এই general truth বা সাধারণ সত্য যেমন দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত তেমনি তা যে কতটা নিষ্ঠুর ও নিদারুণ কাফকা-র 'Metamorphorsis'-এর গল্পকায়

বুঝিয়ে দিলেন ঠিক বিপরীত কোণ থেকে জীবনের উপর আলোকপাত করে। Absurd কে 'উদ্ভট' এবং 'অর্থহীন' বলে যাঁরা এর ঐতিহাসিক অস্তিত্বটুকুমাত্র স্বীকার করেন তাঁরা ভুলে যান যে Absurd-এর মূলে আছে একটি দার্শনিক ভিত্তি। এই দর্শন অন্যান্য দর্শনের মতই সত্যান্বেষী। পার্থক্য এইখানে যে, এই দর্শনের বৈশিষ্ট্য হল সত্যকে দেখা কিন্তু দর্শনীয়কে উল্টো করে দেখা। নইলে অ্যালবি বলতেন না যে, এই সমাজের বিধিব্যবস্থা যদি পছন্দ না হয়, তাহ'লে 'change it'—একে বদল কর। শ্রীযুক্ত অনুপম মজুমদার তাঁর 'সময়ের আয়নায় আবোলতাবোল' শীর্ষক দীর্ঘ গবেষণা নিবন্ধে কিছু সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'আবোলতাবোল'-এর চরিত্রগুলি কতটা সমকালীন তা বিস্তারিত আলোচনা করে তিনি লিখছেন ঃ

> আবোলতাবোলের ছবিটাই অধিকতর বাস্তব। প্রথমটা ভয় পেলেও স্বল্পকালের মধ্যেই একদল 'দেশপূজ্য,' যাঁরা মণ্টেগু সাহেবের দেওয়া স্বরাজের মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নে মশগুল তাঁরা কিন্তু লাটসাহেবের 'অনুমত্যানুসারে' ও 'সুনির্দিষ্ট' পদ্ধতিতে 'কংগ্রেসী দরখাস্তবৃত্তি'তে অটল থাকলেন।[৩]

পুনশ্চ ঃ 'একুশে আইন' এবং 'হযবরল'-এর শেষ কিস্তি—বিচার দৃশ্য—সন্দেশের একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আইন ও বিচার ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরের ফাঁকা অসারতাটুকু চূড়ান্তভাবে উন্মোচিত হয়েছে 'হযবরল' এই দৃশ্যে, যেখানে আসামী এবং সাক্ষী যোগাড় হয় পয়সা দিয়ে, বিচারক ঘুমোয় আর উকিল আইনের 'মস্ত একটা বই দিয়ে আস্তে আস্তে' পিঠ থাবড়ে মক্কেলকে সান্ত্বনা দেয়।'[৪]

অনুপমবাবু যথেষ্ট যুক্তি দিয়েই প্রমাণ করেছেন যে, সুকুমার রায় নিছক খেয়াল রসের কবি ছিলেন না, ছিলেন absurd পন্থী সত্যান্বেষী। শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য প্রাজ্ঞ ও সুলেখক। তিনি এ বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন ঃ[৫]

> সুকুমার রায়ের সঙ্গে অ্যাবসার্ডবাদীর মিলের চেয়ে গরমিলই ঢের বেশি। দর্শনে সাহিত্যে নাটকে 'অ্যাবসার্ড' বলতে বোঝায় ঃ অর্থহীন উদ্দেশ্যরহিত। এ এক বোধ, যার উদ্ভব অস্তিত্বের তীব্রতম সংকট থেকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পশ্চিম জগতের বিশেষ পরিস্থিতি এই সংকটবোধের অব্যবহিত পটভূমি।

'অ্যাবসার্ড' বলতে বোঝায় 'অর্থহীন', 'উদ্দেশ্যরহিত'- এতো অ্যাবসার্ড-এর আভিধানিক অর্থ। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বিশ্বাসহীন প্রেমহীন জগতে সংকটময় পরিস্থিতিতে যখন কোন 'art form'-এর উদ্ভব হয়েছে, তখন কি তা 'অর্থহীন' বা 'উদ্দেশ্যরহিত' হতে পারে? শিল্প-সাহিত্যে যাকে 'ননসেন্স' বলি তা কি প্রচলিত অর্থে 'ননসেন্স'? যখন 'ফর্ম'-এর মধ্যে আর্ট-এর দাবি নিয়ে কোন রচনা আত্মপ্রকাশ করে তখন তাকে 'অর্থহীন' বলা যায় না। মানুষের কোন্ কর্মটি উদ্দেশ্যরহিত? মনীষী মার্কস হিসেব করেই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, কথার ঝোঁকে নয়। অ্যাবসার্ড-এরও উদ্দেশ্য থাকে, বক্তব্যের অর্থ থাকে। তার প্রমাণ হিসেবে অ্যালবি-র কথা আগেই উল্লেখ করেছি। আর একটি ঘটনাও উল্লেখ্য। ১৯৫৭-এর ১৯-এ নভেম্বর তারিখে

সান্‌ফ্রান্সিসকো অঞ্চলের চৌদ্দশ দণ্ডিত অপরাধীর সম্মুখে স্যামুয়েল বেকেট-এর 'ওয়েটিং ফর গোডো' যখন অভিনীত হয়েছিল তখন তারা কেউ বলেছিল 'Godot is Society' কেউ-বা বলেছিল 'He is the outside' অথচ ১৯৫৫ নাগাদ লণ্ডনের সুশিক্ষিত নাট্যমোদীদের কাছে এই নাটক ছিল অস্পষ্ট এবং অর্থহীন বাক্‌জাল বিস্তারের নমুনা মাত্র। বেকেটের উক্ত নাটক তারপর একসময় বিশ্বজয় করল। বিশ্বজয় করেছিল সুইফট অম্লমধুর 'গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত' এবং শিশুচিত্তজয়ী ফ্যানটাসির দৃষ্টান্ত 'আজব দেশে অ্যালিস'। বিশ্বাস করি, 'হযবরল' এবং 'আবোল তাবোল' যদি ইংরেজিতে লেখা হত তাহ'লে দেশ বিদেশের সুচতুর গবেষকরা দেখতেন দেশের আইন, মাননিরূপণের 'একক,' বিদেশী শাসকদের অত্যাচার, স্বদেশীদের অনুকরণপ্রিয়তা, ভণ্ডামি, নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত আত্মতুষ্টি প্রভৃতি বিচিত্র ব্যাপার সমাজবীক্ষকের কোন্‌ জায়গা থেকে সুকুমার রায় পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। অভিনবপদ্ধতিতে দেখাটাই একজন শিল্পিকে স্বাতন্ত্র্য দেয়। সঙ্গে যদি যুক্ত হয় অভিনব পদ্ধতির লেখা তাহ'লে কী দাঁড়ায়! এখানেই শেষ নয়। লেখার সঙ্গে যদি সন্ধি করে রেখা-তাহ'লে? তাহ'লে সেই 'ননসেন্স ক্লাব' ও 'মণ্ডা ক্লাবে'র শ্রদ্ধেয় সদস্যটি লুইস ক্যারল ও টেনিয়েলকে এক হাতে ধ'রে অন্যহাত সুইফট-এর দিকে বাড়িয়ে কি দ্রুত পদক্ষেপে চলে আসেন নি বেকেট-ইওনেস্কো-অ্যালবি-আরাবেল-এর জগতের দিকে?

বেকেটের জন্ম ১৯০৬-এ, জাঁ জেনের ১৯১০-এ, ইওনেস্কো-র ১৯১২ তে, আদামভের ১৯১৩-তে, আরাবেলের ১৯৩২-এ। এ'রা সকলেই সুকুমারের অনুজাত। সুকুমারের বয়স যখন আঠারো সেই সময় জাঁ পল সার্ত্র-এর জন্ম। এ'রা তথাকথিত জীবনরস-রসিকদের রোমান্টিক স্বপ্নমগ্নতার বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু সে তো মৃত্যুকে ভালোবেসে নয়। জীবনকে অধিকতর ভালোবেসে। অ্যালবি-র 'The American Dream'-এ মার্কিনী জীবনকে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করা হয়েছে, 'The Zoo Story' তে আছে বুর্জোয়া সুখভোগের অর্থশূন্যতার প্রতি কটাক্ষ, আরাবেল-এর 'The Automobile Graveyard'-এ বারাঙ্গনাবৃত্তির প্রতি সমর্থনের ছলে সনাতন ধর্মধ্বজীদের আঘাত হানার বাসনা এবং 'The Two Executioners'-এ সনাতন নীতির মানদণ্ডে গোলমাল পাকিয়ে চোখ খুলে দেওয়ার প্রচেষ্টা। সার্ত্র-এর 'The Respectable Prostitute' কি চোখ খুলে দেয় নি? সুতরাং অ্যাবসার্ডিস্টরা উদ্দেশ্যহীন এবং তাঁদের বক্তব্য অর্থহীন, একথা মানা যায় না। অনুরূপ কারণেই দেশ-কালের প্রেক্ষাপটে অর্থবহ হয়ে ওঠে—'মুগুর আমার হাল্‌কা এমন মারলে তোমার লাগবে না।' এই আহ্বানের মোলায়েম ভদ্রতা নিমেষে দূর হয়ে আসল রূপ প্রকাশ পেল 'অভয় দিচ্ছি, শুনছ না যে, ধরব নাকি ঠ্যাং দুটো?' তারপরই চরম পরিণতির হুঙ্কার: 'বসলে তোমার মুণ্ডু চেপে বুঝবে তখন কাণ্ডটা।' বেনিয়াটোলার পালোয়ানের বর্ণনায় কবির 'রাগ বানানো'র চেষ্টা হয়ত নেই, কিন্তু বিজ্ঞান-শিক্ষার যে-প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে "মুণ্ডুতে ম্যাগনেট ফেলে, বাঁশ দিয়ে রিফ্লেক্ট ক'রে/ইঁট দিয়ে ভেলসিটি কষে দেখি মাথা ঘোরে কি না ঘোরে'—মোটেও সস্তা non-sense-এর যথেচ্ছাচার নয়। সবচেয়ে ভালো

লাগে 'পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড়'—এমন কথা শুনলে কৌতুক উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, কিন্তু চমক লাগে যদি পরামর্শ মেলে 'কাগজের রোগী কেটে আগে কর মক্স।' এমন সাপকে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করার পালোয়ানি করতে ইচ্ছে হয় যে 'করে নাকো ফোঁসফাঁস মারে নাকো ঢুশঢাশ।' মনে হয় আমাদের স্বরাজসাধনের মধ্যে সুকুমার দেখেছিলেন 'ছায়াবাজি'র খেলা এবং ইংরেজের দেওয়া মিথ্যা প্রতিশ্রুতিকে বলেছিলেন 'খুড়োর কল,' গলাবাজ বক্তৃতাবাজ দেশসেবকদের বলেছিলেন ভীষ্মলোচন শর্মা যাকে ঠাণ্ডা করতে লেগেছিল একটি মাত্র 'পাগলা ছাগলের গুঁতো।' সুকুমারের এই উদ্ভট পরিকল্পনাগুলোকে Visualize করতে সাহায্য করেছিল তাঁর অসামান্য ছবিগুলো। কবিতা ও ছবির Aesthetics বৈধ মতেই তো কিছু ভিন্ন। কবিতা বাঙ্ময়, ছবি নির্বাক; যদিও ইঙ্গিতগর্ভ শৈল্পিক language উভয় আর্টফর্মেই বিদ্যমান। সুকুমারের ক্ষেত্রেও কবিতার ভাষা ও ছবির ইঙ্গিত অর্থগৌরবেই গৌরবান্বিত হয়েছিল। দ্বৈতাদ্বৈতবাদীদের অর্থহীন বিতর্কে যে-মাথাওয়ালা মানুষগুলো সময় নষ্ট করে, তাদেরই গড়া 'সাম্যসিদ্ধান্ত' সভায় কাঁচা কচু শ্রীমান ভবদুলাল অসামান্য দক্ষতায় ভালোমানুষের মত অকপট ভঙ্গিতে সংহারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অনুপ্রাসের চাবুক আছড়ে পড়ছে 'চলে চটপট চকিত চরণ চোঁচা চম্পট নৃত্যে'। শব্দ ও অর্থে জটপাকানো 'অবাক জলপান'-এ এবং 'তেজীয়ান'-এ কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যায়। 'তেজীয়ান'-এর তেজ কোথায় গেল যখন বাবুমশায় 'ঝাড়ুবর্দার হারুসর্দার'-এর বালতিতে লাথি মেরে শেষকালে 'বুঝি ঠ্যাং যায় খোঁড়া ল্যাংচায় দেখে ভ্যাংচায় ছেলে'? বচন সর্বস্ব বিদ্যেবোঝাই বাবুমশায় নৌকায় চেপে ঝড়ের মুখে পড়ে যখন জানলেন তিনি সাঁতার জানেন না, তখন মূর্খ মাঝি-র নরম কথার তীব্র চাবুক ঝলসে উঠল 'তোমার দেখি জীবনখানা ষোলো আনাই মিছে।' 'ইস্কুলের গল্প'-এর দাশু 'পাগলা'। কিন্তু তার কাণ্ডকারখানায় শিক্ষাজীবীদের কাছাকোচা সামলে নিতে হয়েছে। যাঁরা বিদ্যাদানের চেয়ে নিদ্রাদেবীর সাধনায় অধিক সিদ্ধকাম অথচ শাসনের মুহূর্তে রক্তচক্ষু যমদূত সদৃশ সেইসব শিক্ষকদের সন্ত্রস্ত করে দেয় সুকুমারের বেত্রাঘাত। 'হিঘাংচু' হয়ত 'কাক্কেশ্বর কুচকুচে'-এর আত্মীয়। কিন্তু কাক্কেশ্বরের বেশ তথাকথিত পাণ্ডিত্য ছিল। আর 'হিঘাংচু'-র একটিমাত্র ডাক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিদ্বজ্জনের যে বিভ্রাট তা তথাকথিত পাণ্ডিত্যের absurdity ছাড়া কী! বেচারা 'অসিলক্ষণ পণ্ডিত'! পুরাতত্ত্ববিদরাও বাদ যান নি।—"চন্দ্রখাই বলল, 'এ জন্তুটার নাম দেওয়া যাক চিল্লানোসরাস্'। ছক্কড় সিং বলল, 'উ বাচ্চাকো নাম দেও, বেচারাথেরিয়াম।"……"আমাদের ছাপাখানার একটা ছোকরা ঠাট্টা করে বলল, 'আপনি কোন থেরিয়াম?' আর একজন বলল, 'উনি হচ্ছেন গপ্পথেরিয়াম—বসে বসে গপ্প মারছেন।"[৬]

৫

সন্দেহ নেই, সুকুমারের অজস্র রচনায় মজা আছে, স্রেফ কৌতুক আছে, কিন্তু যেখানে পাঠকের কৌতুকের মৌতাত বেশ জমে ওঠে, সেখানেই অকস্মাৎ ভৌতিক চড়—

সম্মুখে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত উজ্জ্বল দুটি চোখের মালিক সুকুমার রায়, যিনি তাঁর স্বল্প আয়ুষ্কালে (৩৬/৩৭ বছর) বাঙালীদের ঝিমিয়ে পড়তে দেন নি রোমান্টিকতার আফিঙ খেয়ে। তাঁর দেখার চোখ ছিল, ফটোগ্রাফীতে বস্তুর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য আবিষ্কারের প্রচেষ্টা ছিল, চিত্রজগতে কিউবিজম্‌ ফিউচারিজম ও সমকালীন অন্যান্য আন্দোলনের বক্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল। তাঁর নান্দনিক ভাবনা এই বিশ্বাসের কেন্দ্র থেকে চ্যুত হন নি যে. 'শিল্পের হিসাবে অত্যুক্তিটা যথার্থ ভাবসঙ্গত, সুতরাং এক্ষেত্রে সত্যসঙ্গত।" ভারতীয় শিল্পের স্বভাবধর্ম ও শিল্পের সংজ্ঞা নিয়ে অর্ধেন্দ্রকুমারের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ঘটেছিল। কিন্তু তাঁকে ছড়ার শিল্পী, কবি, চিত্রকর যিনি যাই বলুন, nonsense-এর স্রষ্টা বলুন অথবা বলুন অ্যাবসার্ডিস্ট, সুকুমারও বলতে পারতেন বিশেষণে কী আসে যায়! সুকুমার শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর এই মূল সিদ্ধান্ত-ভিত্তি থেকে সরে আসেন নি কখনও :

> রিয়ালিজম শিল্পের মূল ভিত্তি, আইডিয়ালিজমে তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ, এবং উভয়ের সমন্বয়ে তাহার পূর্ণ সফলতা।[৭]

গর্কি-র সঙ্গে তাকে তুলনা করছি না কিন্তু সুকুমারের এই কথাটা পড়তেই মনে পড়ে গেল গর্কি-র কথাটা :

> ...'in great artists realism and romanticism seem to have bliended ?'

'রিয়ালিজম' ও 'রোমান্টিসিজম' কে সব বড় শিল্পীই মেশাতে চেষ্টা করেন, সফলও হন অনেকে, কিন্তু তন্দ্রাচ্ছন্ন মনে যে 'ফ্যানটাসি'র জগৎ জন্মে তাকে রোমান্স-এর ভিয়েনে চড়িয়ে সাহিত্যের Reality সৃষ্টি করতে পারেন কত জন? সেই সংখ্যাল্পদের অন্যতম রূপে অবশ্যই সুকুমার রায়ের নাম উচ্চারণ করতে হয়।

১. একুশে আইন / আবোল তাবোল।
২. হ য ব র ল।
৩. অনুপম মজুমদার / ...প্রস্তুতি পর্ব। পৃ: ৬৭
৪. ঐ
৫. প্রস্তুতি পর্ব। পৃ: ১৭৯
৬. 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি' / সন্দেশ, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ : ১৩৩০।
৭. বর্ণমালাতত্ত্ব...



সুকুমার জগত

সুকুমার রায়ের কবিতায় কৌতুকের উপকরণ হয়ে এসেছিল হেড আফিসের বড়বাবু, পোস্তা থেকে সংবাদ পেয়ে ছুটে আসা মানুষটি যে পাত্র হিসাবে গঙ্গারামের যোগ্যতার বিবরণ দিয়ে যায়, গ্রীষ্মকালে কালোয়াতি গান গাওয়া ভীষ্মলোচন শর্মা, দ্রুতগতিতে চলবার প্রেরণা যোগাবার আজব কল-বানানো চণ্ডীদাসের খুড়ো, ছায়ার সঙ্গে লড়াই করা পাগলা জগাই, চিকিৎসার জন্য শিশিভর্তি ছায়া তৈরি রাখা ছায়াতত্ত্ববিদ, বাবুরাম সাপুড়ের কাছ থেকে নির্বিরোধ সাপ চেয়ে রাখা মানুষজন, কাগজের রোগী কেটে হাত মক্সো করা হাতুড়ে ডাক্তার, খাবার পাহারা দেওয়া কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ, পঞ্চভূতের মূলে বা প্রপঞ্চময় বিশ্বতরুর শিকড়ে জমা রস বা বস্তুপিণ্ড কীভাবে সূক্ষ্ম থেকে স্থূলেতে পরিণত হয় সে সব তত্ত্ব আলোচনা বলতে চাওয়া বুড়ো বা শুনতে না চাওয়া শ্যামাদাস, রামধনুর রঙ পাকা নয় এই জেনে কাজ ফেলে যারা রামধনু দেখতে থাকে সেই লোকেদের উপর চটে যাওয়া খুঁত ধরা বুড়ো, বাবুদের ছেলেদের দাঁত দেখা গেলে ঢাক ঢোল কাঁশি বাঁশি করতাল বাজিয়ে ধুমধাম করে ভয়ে ভ্যাবাচাকা পাইয়ে দেয় যে বাবুর পার্ষদগণ। এই তালিকায় যুক্ত করা যায় শিবঠাকুরের আপনদেশের বিধায়ক-গণকে যাঁরা একুশে আইন জারী করেন। যুক্ত করা যায় বাংলানিবাসী হুঁকো মুখো হ্যাংলাকে যে শরীরের মধ্যখানে বসা মাছি মারবার ল্যাজ পাচ্ছে না বলে নিতান্ত চিন্তিত অথচ যার ডান দিকে বাঁ দিকে দুদিকে দুটি ল্যাজ আছে।

এদের সঙ্গে চলে আসে বোম্বাগড়ের রাজা রাজমন্ত্রী রাজার খুড়ো রাজার পিসি রাণী বা রাণীর দাদা। সর্দি হলে ডিগবাজি খাওয়া লোক, জ্যোৎস্না হলে চোখে

আলতা দেওয়া লোক অথবা লেপমুড়ি দেওয়া ওস্তাদ, মাথায় ডাকটিকিট মারা পণ্ডিত, পাল্লা দিয়ে গায়ের জোরে গিটকিরি দেওয়া বা তবলা বাজানো মানুষ এরাইবা কৌতুকের উপকরণ হিসাবে কম কিসে। চলতে ফিরতে জীবনে এমন মানুষও আমরা দেখি যারা ঝগড়া করে মারামারির উপক্রম হবার মুহূর্তে দাদা বলে শেকহ্যাণ্ড করে শোধবোধ করে সব মিটিয়ে নেয়। জীবনের কৌতুক খুঁজতে চারপাশে একটু তাকাতেই কত উপকরণ! জ্যোতিষীর কাছে হাত দেখিয়ে বিপর্যস্ত নন্দ গোঁসাইয়ের মত লোকও তো কম দেখিনা। তাছাড়া একটু বাড়িয়ে বললেন যে মানুষ কৌতুকের উপকরণ হয়ে ওঠে তার উদাহরণও তো অজস্র। স্বদেশী জিনিস বানাবার নানান ফর্মুলাওয়ালা [বই বা 'হাজার জিনিস'-এর মতো] কেতাবের মধ্যে পাগলা ষাঁড় তাড়া করলে রক্ষা পাবার উপায় খুঁজে না পাওয়া মানুষ, নীলকালি গুলে কপকপ মাছি ধরে গিলে ফেলা, দুধভাত ফেলে শিলনোড়া খেতে চাওয়া, প্লেট দিয়ে শিশিবোতল ভাঙা, মোমবাতি দেশলাই চোষা ডানপিটে ছেলে, ঊনিশমন ওজনের ষষ্ঠীচরণ ফুটস্কোপ দিয়ে ঘিলুর ভেজাল মাপা বিজ্ঞানী এদের মিছিল চলেছে তাঁর কবিতাগুলিতে।

এ তালিকা থেকে হাসির রসের দুটো ধারা বেরিয়ে আসে।

প্রথম ধারা উদ্ভূত হয় যে মানুষগুলিকে নিয়ে তাদের মধ্যে আছে রামধনুর রঙ পাকা নয় বলে অভিযোগ আনা খুঁতখুতে বুড়ো বা বাংলা নিবাসী হুঁকোমুখো হ্যাংলা বা হাসতে মানা রামগরুড়ের ছানা অথবা জ্যোতিষীর কাছে হাত দেখাবার পর ভবিষ্যতের ফাঁড়ার ভয়ে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত নন্দ গোস্সাইয়ের মত মানুষ। এরা চিরকালের বা এদের যে কোনও কালেই ফেলা যায়। দ্বিতীয় ধারাটি প্রবাহিত হয় যাদের নিয়ে তাদের মধ্যে আছে চিকিৎসাবিদ্যায় রপ্ত হওয়ার জন্য কাগজ কেটে হাত মকসো করা হাতুড়ে ডাক্তার বা চণ্ডীদাসের খুড়ো বা ফুটস্কোপ দিয়ে মগজের খুলির ভেজাল মাপা বিজ্ঞানী। এদের অস্তিত্ব একালেই।

এই মানুষগুলি যে হাসির উপকরণ হয়ে উঠতে পারল তার কারণ এই মানুষগুলির চরিত্র স্বভাব ভাবনা আচরণের মধ্যে দৃশ্যত অসঙ্গতি আছে আর সবাই জানেন হাসির মূলকথা হল অসঙ্গতি। কখনও মানুষের স্বভাবজ বা প্রকৃতিগত অসঙ্গতির জন্য তা চিরকালীন কখনও তা এ কালের বা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ বা বিংশশতাব্দীর প্রথমার্ধের টানাপোড়েনজাত অসঙ্গতির জন্য একাল বা সমকাল সম্ভব। একদল লোক চিরকালই হাসির পাত্র সে খুঁতধরা বুড়ো হোক বা রামগরুড়ের ছানাই হোক-আর একদল লোক হাসির পাত্র হয়ে ওঠে একালে জন্ম নেওয়ার সূত্রে। চণ্ডীদাসের খুড়োকে পাই একাল বলেই (আজব কল)। এমন কি একাল বলেই প্রপঞ্চময় বিশ্বতরুর শিকড়ে রস জোগাবার তত্ত্ব বলা মানুষটিকেও পাই। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে হিন্দুধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করার অসাধারণ প্রবণতার জন্যই তার আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ হিং টিং ছট কবিতার মধ্যে এই প্রবণতাকেই ব্যঙ্গ করেছিলেন আর এঁকেছিলেন গৌড়ীপণ্ডিতকে।

সুকুমারের কবিতায় সেই সমালোচনা নেই যা দিয়ে এক একটা শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বিদ্রূপের চাবুক হানা যায়। এসব কবিতা পড়তে পড়তে উদ্ভট অসঙ্গতিতে হেসে ফেলি আমরা, রাগ করতে পারি না কারণ মনে পড়ে যায় এই অসঙ্গতির মধ্যেই তো বাস করি আমরা। তবু উদ্ভটের আতিশয্য তাঁর কবিতাতেই বেশি, গল্পে অতটা নয়।

রোদে রাঙা ইঁটের পাজার উপরে জামা কাপড় এঁটে ঠোঁঙাভরা বাদাম ভাজা হাতে যে রাজা বসে থাকেন তার কল্পনাটিই উদ্ভট। তিনি শ্লেট ধরে হিসাব করতে বসেন যে সমস্যার তা হল নেড়া কবার বেলতলাতে যায়।

রাজা যখন প্রশ্নের উত্তর পান নেড়া বেলতলাতে যায় 'হরেদরে হয়তো মাসে নিদেন পক্ষে পঁচিশবার' তখন আমরা নতুন করে হেসে ফেলি। হাসি এই জন্য যে বেলতলাতে নেড়া একবারের বেশি যেতে পারে না যেতে সাহস করে না এটা প্রবাদের জ্ঞান হিসাবে আমাদের জানা থাকলেও কোন কেতাবে সে কথা কোথাও লেখা থাকে না। রোগা ভিস্তিওয়ালা যে বেলতলায় নেড়াকে দেখতে পায় সে বেলতলা তো বিশেষ কোনও জায়গার নাম এবং নেড়া তো হলেও হতে পারে যে কোনও বালকের নাম—মাথা মুড়িয়ে ফেলা যে কোনও লোকমাত্র নয়। রাজার অত উদ্বেগ, শ্লেট হাতে অত গণনা, অত ঘটা, অত চিন্তা যেন সবার মনে সঞ্চারিত হয়ে যায়—কিন্তু তাঁর প্রশ্নের সঙ্গে ভিস্তিওয়ালার উত্তরের কোনও মিল থাকে না। পাঠকেরা এই অমিলটাকে বুঝে তৎক্ষণাৎ হেসে ফেলে। ইতোমধ্যে কিন্তু আরও অনেক কাণ্ড ঘটেছে, সেগুলিও মজা পাবার পক্ষে যথেষ্ট। যেমন রাজার রাঙা ইঁটের পাঁজার উপরে বসা—এই জায়গাটা বেছে নেওয়াটাই ছিল উদ্ভট ব্যাপার! রাজার ঠোঙা ভরা বাদাম ভাজা খাওয়াটাই অপ্রত্যাশিত কিন্তু মজার ব্যাপার হল রাজা তা খাচ্ছেন কিন্তু গিলছেন না। ঝাঁ ঝাঁ রোদে তিনি বৃষ্টি নামাতে হাঁকছেন! সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করে রাজার চিন্তার কারণ কি? তারা লক্ষ করে রাজার রাঙামুখ এমন পানসে যে মনে হয় তা যেন 'তেলেভাজা আমসি'। রাজার মুখের এ রকম পরিণতির উপমা অপ্রত্যাশিত অথচ প্রজাদের উদ্বেগটা যে প্রকৃত তাতে সন্দেহ থাকে না। সবচাইতে কৌতুককর লাগে রাজার সম্পর্কে বলতে গিয়ে কোনও সম্ভ্রমার্থক বিশেষণ বা ক্রিয়ারূপ তারা ব্যবহার করে না সোজাসুজি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করে 'রাজা বুঝি ভেবেই মোলো'। এমন লোক রাজার পাশে থাকে যাদের রাজার পাশে থাকবার কথা নয় যেমন রোগা এক ভিস্তিওলা। সে রাজার নিরাপত্তা বাহিনীর ধার ধারে না—নিরাপত্তা বাহিনী থাকেও না রাজার—নিরাপত্তা বাহিনী থাকে না সেই রাজার যাকে প্রজারা ভালবাসে। সে ঢিপ করে বাড়িয়ে গলা প্রণাম করল দু পায়ে তাঁর। সে অনায়াসে বলে দেয় 'এতে আর গোল হবে কি নেড়াকে তো নিত্য দেখি আপন চোখে পরিষ্কার।'

৩

সুকুমার রায়ের সব গল্পগুলিতে কিন্তু এতটা উদ্ভট আতিশয্য নেই। তাঁর বেশির

ভাগ গল্প তুলনায় অনেক স্নিগ্ধ অনেক সরল। কবিতায় যে অর্থহীনতার বা nonsense-এর জগৎ প্রকাশিত হয় গল্প লেখার সময় সুকুমার রায় সর্বদা সেই অর্থহীন উদ্ভট বা nonsense-এর জগৎ প্রকাশ করার দিকে যান নি। তাঁর বেশির ভাগ গল্পেই অনুদ্ভট চেনাশুনা জগৎ ধরা পড়েছে। এর ফলে যাঁরা কবিতার উদ্ভট আতিশয্যের মধ্যে সর্বদাই দ্বিতীয় অর্থের সন্ধান করেন তাঁরাও গল্পের মধ্যে সেই দ্বিতীয় অর্থ খোঁজা থেকে বিরত থাকেন।

দেশ বিদেশের রূপকথা উপকথা লোককথার গল্প ছাড়া নানা গল্প ও অন্যান্য গল্প পর্যায়ে গল্পগুলিই তাঁর গল্পের সিংহভাগ দখল করে আছে। এই পর্যায়ের গল্পে যা ধরা পড়ে তা উদ্ভটের সন্ধান নয় তাঁর মনের প্রসন্নতা। ইস্কুলের গল্প পর্যায়েও তাই তবে তফাতের মধ্যে রূপকথা বা উপকথা বা লোককথার রাজ্যের রাজা রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র কোটাল রাণী বা ধূর্তনাপিত চালাক দরজি তাঁতি জোলা জেলে জেলেবুড়ির গল্পের পাত্রপাত্রীর বদলে এতে ভিড় করে আসে আমাদের চারপাশে দেখা মানুষগুলি। কবিতার রাজ্যের হেডঅফিসের বড় বাবু বা গাইয়ে ভীষ্মলোচন শর্মার মত এখানেও থাকেন রাগী কেদারবাবু বা ডাকাত ভেবে ভয় পাওয়া হারুবাবু।

তাঁর কবিতার পাত্রপাত্রীদের স্বভাব প্রবণতা ও আচরণ এবং বিশেষ কালে বিধৃত সিচুয়েশন ধরে দু জাতের হাসির উৎসের সন্ধান করেছিলাম। তেমনি তাঁর গল্পগুলির ক্ষেত্রেও পাত্রপাত্রী ধরে দুটি ধারা লক্ষ করা যায়। প্রথম ধারায় থাকে দেশবিদেশের গল্পের মধ্যে থাকা রূপকথা লোককথা উপকথার পাত্রপাত্রী যাদের মধ্যে প্রাণিজগৎ থেকে সংগৃহীত উপাদানও রয়েছে। দ্বিতীয় ধারায় থাকে আমাদের পরিচিত জগতের মানুষেরা। এরা আপন স্বভাব ও প্রবণতার জন্য চিরকালীন হাসির উৎস হয়ে ওঠে, কেউ কেউ বা একালের পরিস্থিতির জন্য সমকালীন বা একালীন।

প্রথম শ্রেণীর গল্পের মধ্যে পড়ে ওয়াসিলিসা, পাজি পিটার, দেবতার সাজা (১৯১৩), বোকাবুড়ি (১৯১৫) খৃষ্টবাহন, দুষ্টু দরজি, ভাঙাতারা, তিনবন্ধু দ্রিঘাংচু, ছয়বীর, খুকুর লড়াই দেখা, রামের শঙ্খ (১৯১৬), হারকিউলিস, নাপিত পণ্ডিত, বুদ্ধিমানের সাজা, একবছরের রাজা, ঠুকে মারি আর মুখে মারি (১৯১৭), দেবতার দুর্বুদ্ধি, অর্ফিয়ুস, আশ্চর্যছবি, দুইবন্ধু (১৯১৮), অশ্বের বর চাওয়া, অসিলক্ষণ (১৯১৯), লোলির পাহারা, সূদন ওঝা, টাকার আপদ (১৯২০), শ্বেতপুরী আর লালপুরী, বুদ্ধিমান শিষ্য (১), রাজার অসুখ (১৯২১), বুদ্ধিমান শিষ্য (২), দানের হিসাব (১৯২২)।

এগুলির মধ্যে জাপানী কথা থেকে সংগৃহীত হয়েছে ওয়াসিলিসা, ব্যাঙের সমুদ্র দেখা, আশ্চর্য ছবি, ভাঙাতারা, বুদ্ধের কথা থেকে সংগৃহীত হয়েছে খুকুর লড়াই দেখা, ছয়বীর। দেবতার সাজা, পাজি পিটার, অর্ফিয়ুস, হারকিউলিস, খৃষ্টবাহন জাতীয় গল্পগুলি গ্রীক বা খ্রীষ্টীয় কাহিনী থেকে সংগৃহীত হয়েছে। আরবী পারসী কাহিনী থেকে সংগৃহীত হয়েছে বুদ্ধিমানের সাজা, নাপিত পণ্ডিত, দুষ্টু দরজি, একবছরের রাজা।

এ সব গল্পের কিছু একেবারে রূপকথার ইচ্ছাপূরণ জাতীয়। তাতে হিংসুকেরা জব্দ হয়, ভালরা পুরস্কৃত হয়, মন্দরা সাজা পায়। যেমন ওয়াসিলিসা গল্পটি। এতে সৎ মা আর তার হিংসুকে মেয়েদের জব্দ হওয়া আর অনাথা বালিকার রাণীতে পরিণত হওয়ার কাহিনী রয়েছে। ঠক মানুষের কাহিনী আছে পাজি পিটার দুষ্টু দরজি, রামের শঙ্খ, বুদ্ধিমানের সাজা, অসিলক্ষণ পণ্ডিত, সূদন ওঝা এসব গল্পের মধ্যে। এর মধ্যে পাজি হয়েও সাজা পায় না কেবল পাজি পিটার আর সূদন ওঝা। কিন্তু ধিক্কৃত হয় কৃপণ রাজা (দানের হিসাব) বা নির্বোধ লোক (বুদ্ধিমান শিষ্য)।

সব জাগতিক বিপত্তির সমাধান পাওয়া যায় এমন গল্প হল এক বছরের রাজা যে এক বছরের মধ্যেই ভবিষ্যৎ জীবনের ব্যবস্থা করে রাখে। অথবা তিনবন্ধু গল্প যেখানে রূপকথার রাজপুত্র তার তিনবন্ধুর সাহায্যে সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পায়। অথবা রাজার অসুখ গল্প যেখানে রাজার সমস্ত অসুখ সেরে যায় সব ছেড়ে দেওয়া ফকিরের মনের সুখ দেখে।

একটি গল্পে দেখি আয়নার ব্যবহার না জানা সরল মানুষের কথা। এতেও পাঠকরা তৃপ্ত হয় গল্পের পাত্রপাত্রীদের অজ্ঞতাকে দেখে আর তুলনায় নিজের উৎকর্ষ সম্পর্কে সচেতন হয়ে। পাঠকের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠম্মন্যতা হাসির গল্পের আর এক উপাদান। আছাড় খেয়ে পড়ে যাওয়া মানুষকে দেখে আছাড় না খাওয়া অন্যমানুষরা সেই মুহূর্তে নিজেদের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতা বা উৎকর্ষ অনুভব করে যেমন তৃপ্তি পায়।

লোক সমাজে প্রচলিত গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে বোকাবুড়ি। মোহর পেয়েছে বুড়ো কিন্তু রাতারাতি বড় মানুষী করতে চায় নি এই ভয়ে যে নজরে পড়লে রাজা সব কেড়ে নেবে। এদিকে পাছে তার বুড়ি সবাইকে সব বলে দেয় এইজন্য বুড়িকে দেখিয়ে দেখিয়ে গাছ থেকে মাছ এবং জল থেকে খরগোশ তুলে তারপর মোহর পাওয়ার কথা জানাল। ফলে বুড়ি যখন লোকেদের বলে যে যেদিন গাছ থেকে মাছ ধরা হয়েছে এবং জল থেকে খরগোশ সেদিনই মোহর পাওয়া গেছে তখন লোকেরা বুঝল ব্যাপারটা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে লেখা জগদীশ চন্দ্র গুপ্তর ষোলোকলার এক কলা গল্পটির উপাদানও বোধহয় একই উৎস থেকে সংগৃহীত। চাষার বৌ মাঠের মাঝে মাগুর মাছ রেখেছিল। হিসাব করে সেই কোণায় রেখেছিল ঠিক যেখানটিতে চাষা লাঙল দেবে। লোকেরা স্বভাবতই মাঠের মধ্যে মাগুর মাছ পাওয়ার গল্প শুনে ভেবেছিল রোদে লাঙল চালিয়ে চাষীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

৪

কবিতায় যেমন দেখি উদ্ভট তথ্যের সমাহার এবং আতিশায্য, সুকুমার রায়ের গল্পের জগতেও তেমনি উদ্ভট তথ্য এবং বাড়িয়ে বলা। ফলে এখানেও অদ্ভুত মজার এবং হাসির পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়। উনিশ মন ওজনের ষষ্ঠীচরণ যেমন খেলার ছলে যখন তখন হাতি নিয়ে লোফালুফি করে তখন বাড়িয়ে বলার ফলে যে মজাটা তৈরি হয়

অনুরূপ মজা দেখি ঠুকে মারি পালোয়ান আর মুখে মারি পালোয়ানের গল্পে ঠুকে মারি পালোয়ানটি যখন মুখে মারি পালোয়ানের বাড়ির সামনে থেকে একটি তালগাছ তুলে নিয়ে মুখে মারির ছেলেকে বলল :

ওরে খোকা তোর বাবাকে বলিস আমার একটা ছড়ির দরকার ছিল তাই এটা নিয়ে চললাম।

খোকা তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, ওমা দেখেছ? ঐ দুষ্টু লোকটা বাবার খড়কে কাঠি নিয়ে পালিয়ে গেল।

প্রচণ্ডবল ঠুকে মারি তালগাছ দিয়ে ছড়ি বানাবে এই কথাটিই সাংঘাতিক বাড়িয়ে বলা—কিন্তু মুখে মারির ছেলের কথা তো আরও বাড়িয়ে বলা। খড়কে কাঠি তো দাঁত খুঁচোতে লাগে। লম্বা তালগাছ যার দাঁত খুঁচোবার খড়কে কাঠি সে না জানি কত বৃহদাকৃতি। এই বাড়িয়ে বলার মধ্যে যে উদ্ভটত্ব আছে সেটাই উপভোগ্য।

উদ্ভটত্বকে দু ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারি অর্থহীন উদ্ভটত্ব আর ইঙ্গিতগর্ভ উদ্ভটত্ব। প্রথমটিকে ইংরেজীতে বলি nonsense আর দ্বিতীয়টি Absurd। প্রথমটি নিয়ে কোনও কথা নেই :

আমড়া গাছের নোংরা ছায়া কামড়ে যদি খায়
ল্যাংড়া লোকের ঠ্যাং গজাবে সন্দেহ নেই তায়।

ছায়াবাজি কবিতার এ ধরণের অদ্ভুত কার্যকারণ সম্পর্কটাই অর্থহীন উদ্ভট বা nonsense। কিংবা কাঠবুড়ো কবিতায় :

হাঁড়ি নিয়ে দাড়িমুখো কে যেন কে বৃদ্ধ
রোদে বসে চেটে খায় ভিজে কাঠ সিদ্ধ।

হাঁড়িতে ভিজে কাঠ সেদ্ধ করে রোদে বসে যে বুড়ো চেটে খায় তার উদ্ভটত্ব স্বপ্রকাশ। তার কাজকর্ম তার বলা কার্যকারণ সম্পর্কও তাই :

মাথা নেড়ে গান করে গুন্‌গুন্ সংগীত
ভাব দেখে মনে হয় না-জানি কি পণ্ডিত!
বিড়্ বিড়্ কি যে বকে নাহি তার অর্থ—
'আকাশেতে ঝুল ঝোলে কাঠে তাই গর্ত।'

কাঠে গর্ত হওয়ার কারণ আকাশেতে ঝুল ঝোলা! ঝুল ঝুলতে দেখি ঘরের দেওয়ালের কোণে মাকড়সার জালের সঙ্গে ধোঁয়াধুলো কালি আটকে যে চেহারাটা দাঁড়ায় আকাশে সেই অবলম্বন কোথায় যে ঝুল ঝুলবে অথচ সেই আকাশেই ঝুল ঝোলে বলে কাঠে গর্ত দেখা যাচ্ছে এমন কার্যকারণ যোগের ভাবনাটাই অর্থহীন উদ্ভট।

কিন্তু আপাত অসংলগ্ন ঘটনা পরিস্থিতি শব্দ যোজনার মধ্য দিয়ে দূরবর্তী সত্যের ইঙ্গিত যখন পাই, যখন নিছক ঘটনা বা পরিস্থিতি বা শব্দবিন্যাস মাত্রই লক্ষ্য নয় তখনই তাকে বলি Absurd বা ইঙ্গিতগর্ভ উদ্ভটত্ব।

শিবঠাকুরের আপন দেশে
আইন কানুন সর্বনেশে

কেউ যদি যায় পিছলে পড়ে
প্যায়দা এসে পাকড়ে ধরে
কাজির কাছে হয় বিচার
একুশ টাকা দণ্ড তার।

একুশে আইন কবিতাটির আরও এরকম ঘটনা কিন্তু ইঙ্গিতগর্ভ উদ্ভট। পিছলে পড়াটা এই শিবঠাকুরের আপন দেশে এমন অপরাধ যে কাজির বিচারে একুশটাকা দণ্ড হয়। সন্ধে ছটার আগে হাঁচতে হলে এই দেশে টিকিট লাগে আর বিনা টিকিটে হাঁচলে একুশ দফা হাঁচিয়ে মারে কোটাল। চলতে ফিরতে ডাইনে বাঁয়ে চাইলে শাস্তি দুপুর রোদে ঘামিয়ে নিয়ে একুশ হাতা জল গেলানো। এসব কোন দেশে হয়? নিজেদের দেশেই এরকম খামখেয়ালী একুশে আইনের প্রকারভেদ কি আমরা দেখিনি?

সুকুমার রায়ের কবিতার nonsense বা অর্থহীন উদ্ভটত্বকে কখনও কখনও পণ্ডিতেরা sur-realistic চিন্তার প্রকাশ বলে মনে করেছেন। সে জন্যই কাঠবুড়ো কবিতায় পাই।

কোন্ ফুটো খেতে ভাল কোন্‌টা বা মন্দ,
কোন্ কোন্ ফাটলের কি রকম গন্ধ

বা শব্দকল্পদ্রুম কবিতায় ফুল ফোটার শব্দ শোনা গন্ধ ছুটে যাওয়ার শব্দ শোনা ঢং ঢং আওয়াজে ব্যথা বাজার শব্দ শোনা সবই এই বাস্তবতা ছাড়িয়ে বাস্তবতা পেরোনো আর এক অধিবাস্তবতার ছোঁয়া নিয়ে আসে যখন চেতন অবচেতন সমানে সক্রিয়—জাগ্রত জগৎ আর স্বপ্নের জগৎ সমান ভাবে গতিশীল এবং ক্রিয়াশীল।

কবিতার জগতে এই যে অর্থহীন উদ্ভটত্ব বা ইঙ্গিতগর্ভ উদ্ভটত্ব অথবা কার্যকারণ সম্পর্কের অধিবাস্তবতা, তা গল্পের জগতে স্বতন্ত্র প্রকরণের খাতিরে সেই চেহারা নিয়ে আসতে পারে না। তার স্বরূপটা পালটে যায়।

কাক এসে গম্ভীর গলায় কঃ করে শব্দ করল রাজসভায়। এর ফলে রাজসভা প্রথমে হতভম্ব হল পরে গোল বেধে গেল এবং সবাই তার অর্থ খুঁজতে ব্যস্ত হল। একটি লোক এসে বলল ওটা কাক নয় দ্রিঘাংচু। দ্রিঘাংচু যখন রাজার সামনে আসে তখন তাকে দেখতে দেখায় দাঁড়কাকের মত। তখন আশ্চর্য কাণ্ড হয় যদি তার সামনে কেউ এই মন্ত্র পড়েঃ

হলদে সবুজ ওড়াং ওটাং
ইঁট পাটকেল চিৎ পটাং
মুস্কিল আসান উড়ে মালী
ধর্মতলায় কর্মখালি।

কী সেই আশ্চর্য কাণ্ড তা কেউ জানে না।

সভার সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ঠিক যেমন হিংটিং ছটের ব্যাখ্যা পেয়ে দেশ সুদ্ধ লোক হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল।

এ গল্পের পিছনে কোনও বিদেশী গল্পের ছায়া আছে কি না জানি না কিন্তু বিদেশী আবহাওয়া নেই—মন্ত্রে তো নেইই। কাকের ডাকের অর্থ খোঁজায় কাক চরিত্র বিশ্বাসী মানুষদের বিশ্বাসকে ভিত্তি করে শেষ পর্যন্ত কোনও পরিণতিতে না পৌঁছবার মধ্যে শেষ করা, এমন কি অর্থহীন মন্ত্রের উপর বিশ্বাস নিয়ে এগিয়েও আশ্চর্যকাণ্ডের সন্ধান না পাওয়া এ সবই সেই জগতের ইঙ্গিত বয়ে আনে যেটা কাক চরিত্র ও মন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষদের বিশ্বাসের জগৎ।

৫

সুকুমার রায়ের পুত্র সত্যজিৎ রায়ের লেখা প্রফেসার শঙ্কুর নানা কাণ্ড কারখানা নিয়ে তৈরি কল্পবিজ্ঞানের অনেক গল্প যে গল্পের প্রেরণায় লেখা তা সুকুমার রায়ের হেঁশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি (১৯২৩)। বন্দাকুশ পাহাড়ে গিয়ে দেখা হ্যাংলা থেরিয়াম, ল্যাংড়া থেরিয়াম, গোমড়া থেরিয়াম, ল্যাগব্যাগার্নিস, চিল্লানোসরাস, বেচারা থেরিয়াম, বটকটোডন জাতীয় প্রাণী আর বন্দাকুশ পাহাড় কাকড়ামতী নদীর নাম করছেন তখন এসব প্রাণিজগৎ আর ভৌগোলিক উপাদান কল্পবিজ্ঞান ছাড়িয়ে ইঙ্গিতগর্ভ উদ্ভটত্বের রূপ পায়। এগুলি যে হলেও হতে পারে অর্থহীন উদ্ভটত্ব মান—তা এসব বিবরণ দেওয়া মানুষটিকে গপ্পথেরিরাম নাম দিয়েই ইঙ্গিত করা হয়েছে বটে-কিন্তু হ্যাংলা, ল্যাংড়া, ল্যাগব্যাগে, বেচারা চিল্লানো জাতীয় নামে যে এক একটা বিশিষ্ট স্বভাবের বা আকৃতির মানুষকে বোঝানো হচ্ছে তা ধরে ফেলতে কষ্ট হয় না। এরাই হাতিমি বা হুঁকোমুখো হ্যাংলা বা রামগরুড়ের ছানার পূর্বপুরুষ। প্রকৃতপক্ষে কবিতার জগৎ আর সুকুমার রায়ের গল্পের জগৎ যে পৃথক নয়—এই আশ্চর্য গল্পটি তার প্রমাণ। এখানে অর্থহীন উদ্ভটত্ব তার ইঙ্গিতগর্ভ উদ্ভটত্ব দুইই আছে। আর হাসির উপাদান হিসেবে এরা যেমন চিরকালীন তেমনি এদের উদ্ভাবনা কল্পবৈজ্ঞানিক বলে একালীন।

অর্থহীন উদ্ভটত্ব বা ইঙ্গিতগর্ভ উদ্ভটত্ব দুইই চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে হ য ব র ল-তে। এখানে স্বপ্নের জগতে রুমাল হয়ে যায় বেড়াল! এখানে না বুঝলেও বোঝা বনে যাবার ভয়ে বুঝেছি বলে স্বীকার করতে হয় সব অসংলগ্ন কথাবার্তা ঘটনা পরিস্থিতি। এখানে আপেক্ষিকতাবাদ চূড়ান্ত রূপ পায় কাক্কেশ্বর কুচকুচের হিসাবপত্রে। আদালতের কার্যকলাপের অর্থহীন উদ্ভটত্ব ধরা পড়ে যায়। বস্তু-প্রতিবস্তুর জগতের ইঙ্গিত বহন করে আনে উধোবুধো। এখানে হিজবিজ্‌বিজের হাসির কারণগুলি অদ্ভুত। এখানে বেহায়া ন্যাড়ারা গান গাইতে চায় হাসিমুখে যে সব গানের দ্বিতীয় পদ থাকে অন্য গানে, গানে থাকে অর্থহীন উদ্ভট শব্দবিন্যাস নাইকো মানে নাইকো সুর। এখানে আছে মামলায় মিথ্যা সাক্ষী ঝিমুতে থাকা জজ। বিচার বিভ্রাটে হয়ে যায় নির্দোষ ব্যক্তির সাজা। সবই ঘটে যায় নিয়ন্ত্রণহীন স্বপ্নের জগতের কার্যকলাপের মত।

হ য ব র ল-কে গল্পের মধ্যে ফেলা সঙ্গত নয়! এর নানা ঘটনাবলী এর সংলাপ

নির্ভরতা ও স্বপ্নজগতের দূরবর্তী সংলগ্নতা একে অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের তুলনায় আশ্চর্যসৃষ্টির স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। একে নিছক গল্প বলতে পারি না।

তবু সুকুমার রায়ের গল্প কবিতায় প্রবণতার দিকটি বুঝবার জন একে বাদ দিয়ে কোনও আলোচনাই হয় না। এখানেও 'বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া নিয়মহারা হিসাব হীন আজগুবি চাল বেঠিক বেতাল ও মাতাল রঙ্গ।' কবিতার Nonsense বা অর্থহীন উদ্ভটত্ব অথবা Absurd বা ইঙ্গিতগর্ভ উদ্ভটত্ব অথবা Surrealist এর জাগ্রত স্বপ্নের অধিবাস্তবত্ব হাতধরাধরি করে, থাকে, ক্রমে মিলে মিশে যায়।

৬

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সুকুমার রায়ের নানা গল্পের ও অন্যান্য গল্পের বা ইস্কুলের গল্পের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক। এখানেও দেখি কবিতার মানুষ গুলির যে দু ভাগ সেই দুভাগের পাত্রপাত্রী এখানেও ভিড় করেছে। কখনও চরিত্রগত অসঙ্গতি, অপ্রত্যাশিত প্রবণতা অদ্ভুত ঘটনা বা পরিস্থিতি এখানেও আছে। অর্থহীন উদ্ভটত্ব এখানে কম। Sur-realist-এর জগৎ হ য ব র ল ছাড়া নেই। ইঙ্গিতগর্ভ উদ্ভটত্বও উঁকি দেয় তবে কবিতার বদলে গল্পের প্রকরণে তা এসেছে বলে তার চরিত্র একটু স্বতন্ত্র ধরণের হয়।

ছাতার মালিক (১৯১৯) গল্পে যেমন আছে দেড় হাত মানুষেরা। এখানে গিরগিটি মানুষের ভাষায় কথা বলে দেখে তারা তাজ্জব হয়—বহুরূপী গিরগিটি ব্যাঙের ছাতার কথা শুনে হাসতে থাকে আর বলে।

'ব্যাঙের ছাতাকি হে? ওটা বুঝি ব্যাঙের ছাতা হল? যেমন বুদ্ধি তোমাদের।
ওটা ছাতাও নয় ব্যাঙেরও কিছু নয়। যারা বোকা তারা বলে ব্যাঙের ছাতা।'

ব্যাঙের ছাতার আসল কথা বলে দেওয়াটাই এখানে মূল ব্যাপার। ইঙ্গিতগর্ভ বা অর্থহীন কি না তা নির্ভর করছে আমাদের ধরে নেওয়ার উপরে। যদি নিছক স্বাদেই সন্তুষ্ট থাকি তাহলে অর্থহীন উদ্ভট বলে একে মেনে নেওয়া যায় যদি স্বাদের চাইতে বেশি কিছু অর্থ চাই তাহলে ইঙ্গিতগর্ভ বলে মেনে নিতে আপত্তি থাকে না কারণ তা পাওয়া যাচ্ছে। এমনি ব্যাঙের রাজা গল্পে (১৯২০) দেখি রাজা চেয়ে ব্যাঙেরা একবার পেল ভাঙা ডাল একবার পেল ব্যাঙ খাওয়া বক। রাজতন্ত্র ভাল না রাজাহীন নৈরাজ্য ভাল সে বিষয়ে ইঙ্গিত আছে কি গল্পের মধ্যে? যদি কেউ সে ইঙ্গিতকে নেন মেনে তাহলেও আপত্তি করার কিছু নেই।

'উকিলের বুদ্ধি' গল্পে দেখি চাষাকে পাগল সাজিয়ে উকিল তার পাওনা মকুব করিয়ে শেষে নিজের পারিশ্রমিক চাইতে গিয়ে দেখল চাষা একই বুদ্ধি নিয়ে পাগলের অভিনয় করে যাচ্ছে। উকিল এবার জব্দ। চাষার এই আচরণ অপ্রত্যাশিত একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে—কিন্তু এখানে যে হাসির উদ্ভব হচ্ছে তার মূলে যে উকিল বা চাষা তারা চিরকালের মানুষ।

যেমন চিরকালের খুকিকে দেখি 'পুতুলের ভোজ' (১৯২০) গল্পে। 'হিংসুটি' গল্পে যেমন দেখি হিংসুটিদের শিক্ষা। নীতিমূলক গল্প বলা যায় কি? তা বলা ঠিক নয়। আসলে গল্প বলা হয়ে গেলে নীতি আপনিই মনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে যেমন করে 'পেটুক' গল্পে (১৯২৭), 'গোপালের পড়া' (১৯২৩) গল্পে, 'যতীনের জুতো' (১৯১২) গল্পে। 'সবজান্তা দাদা' গল্পে দেখি সবজান্তা দাদা হাউই ওড়াবার বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে বিপদে পড়ে তবু বাহাদুরি নিতে ছাড়ে না। ছোটদের মনস্তত্ত্ব এরকমই হয়। কিন্তু সে শুধু ছোটদেরই? এ তো একশ্রেণীর মানুষদের কথা যারা চিরকালই আছে। এরাই তো সুকুমার রায়ের কবিতায় কৌতুকের উপকরণ হয়ে আসে, গল্পেও আসে। হিংসুটিদের গানে যারা আছে তারাই কি হিংসুটি গল্পে, সবজান্তা দাদা গল্পে দেখা দেয় না? 'গল্প' নামে গল্পটিতে মোটা বিশ্বম্ভর আর রোগা কানাই হয়ে দেখা দেয় না কি 'নারদ নারদ' কবিতার লোক দুটি।

এমনি আর একটু তাকালেই দেখতে পাব 'হাতুড়ে' কবিতার কাগজের রোগীকাটা ডাক্তার বা 'নোটবুক' কবিতার বিবিধ প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহকারী ব্যক্তি অথবা ফুটস্কোপ দিয়ে মগজের ঘিলুর মধ্যে ভেজালের পরিমাণ বার করা বিজ্ঞানী—তাকেই দেখতে পাব 'নিধিরাম পাটকেল' গল্পে যিনি আবিষ্কার করেছিলেন 'গন্ধবিকট তেল' যে তেল খেলে পিলের ওষুধ মাখলে ঘায়ের মলম আর গোঁফে মাখলে দেড় দিনে আধ হাত গোঁফ বেরোয়।' কবিতায় চণ্ডীদাসের খুড়ো দ্রুত চলবার আজব কল বানান ইনি বানান বাতাসভরা হাপর দিয়ে চালনা করা কামান। হাসির উপকরণ তৈরির এমন চরিত্র একাল-সম্ভব। কামানের গোলাত অদ্ভুত জিনিস দিয়ে তৈরি। বিছুটির আরক, লঙ্কার ধোঁয়া ছারপোকার আতর গাঁদালের রস পচামুলের একসট্রাক্‌ট। এরকম একটা গোলা ফেটে যে দুর্ঘটনা ঘটল তাতে তাঁর কার্তিকের মত চেহারা এখন কী রকম হয়ে গেছে। কী রকম যে হয়েছে তা বোঝা যাবে পরিপূরক ছবিটি দেখে। ছবিটি শুধু পরিপূরক বললে কম বলা হবে। ছবিটি গল্পের পরিপূরণ করে তার স্বাদ আরও বাড়িয়ে দেয়।

৭

কবিতার জগতের মানুষগুলির মধ্যে অসঙ্গতির ঝোঁকটা বেশি। গল্পের মানুষগুলি তার তুলনায় অনেক বেশি সহজ জানাশোনা মানুষ। কিন্তু অনায়াসে তারা হাসির গল্পের উপকরণ হয়ে ওঠেন হাসির পরিস্থিতির জন্য। এরকম পরিস্থিতি বার করে নেওয়ার মধ্যেই গল্পগুলির নির্মাণ সম্ভবপর। স্টেশন থেকে নেমে বাড়ি ফেরার সময় হারুবাবু ভয় পান পেছনে একটি লোক তাঁকে অনুসরণ করছে ভেবে। তাই বেঁকেচুরে ঝোপ জঙ্গল ডিঙিয়ে চলতে গিয়েও দেখলেন লোকটি পিছু ছাড়ছে না। মরিয়া হয়ে শেষপর্যন্ত হারুবাবু লোকটিকে ছাতা বাগিয়ে চেপে ধরতে গিয়ে দেখলেন মোটেই ভয় পাওয়ার মত চেহারা নয় লোকটির। জানলেন সে পিছু নিয়েছে এইজন্য

যে স্টেশন মাস্টার হারুবাবুকে দেখিয়ে বলে দিয়েছিলেন যে এর সঙ্গে গেলেই হারুবাবুর পাশের বাড়িতে যে বলরামবাবু থাকেন তাঁর বাড়ি পোঁছে যাবেন। নিরীহ লোকটি এবার হারুবাবুকে প্রশ্ন করেন "তা আপনি কি বরাবর এইরকম করে বেঁকেচুরে চলেন নাকি ?" (ডাকাত নাকি ?) এ প্রশ্নের সত্য উত্তর দেওয়ায় মুস্কিল আছে। সেই মুস্কিলের সূত্রেই হাসির সিচুয়েশন তৈরি হয়ে যায়। মিথ্যে ভয় পাওয়া মানুষ স্বীকার করতে লজ্জা পায় যে সে ভয় পেয়েছিল। মানুষের এই মৌলিক এবং চিরকালীন দুর্বলতার চেহারা স্নকুমার রায় জানতেন।

'রাগের ওষুধ' (১৯১৫) নামে একটা গল্প আছে—সেখানেও আশ্চর্য সিচুয়েশন। সবাই বলে হঠাৎ রাগ উঠে গেলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় তাহলে রাগ কমে যায়। কিছুক্ষণটা কতক্ষণ না এক থেকে বিশ অবধি গুণতে যতটা সময় লাগে ততক্ষণ। রাগী কেদারবাবুর ক্ষেত্রে প্রেসক্রিপশন ছিল এক থেকে একশো অবধি গোনা। কিন্তু ইস্কুলের ছেলেদের মার্বেল খেলার মার্বেল পায়ে এসে লাগতেই কেদারবাবু যখন দারুণ রেগে লাফ দিয়ে লাঠি উঁচিয়ে মাঠে গিয়ে পড়লেন তখন ছেলেরা পালিয়ে গেল আর কেদারবাবু মনে করলেন পরীক্ষা করে দেখা যাক এক থেকে একশো অবধি গুণলে রাগ কমে কি না। এই গুণতে শুরু করতেই লোকেরা ভাবল পাগল না কি—তাদের এই ভাবনা আর মন্তব্যে কেদার বাবু ক্রমশ বেশি করে রাগছেন। কেদারবাবু তবু গুণে চলেছেন আর একশো অবধি গুণেই চেঁচাতে লাগলেন 'কোন হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া মিথ্যাবাদী বলেছে একশো গুণলে রাগ থামে ?' বলেই ডাইনে বাঁয়ে দুমদাম লাঠির ঘা।

সুস্থ লোককে পাগল ভাবলে সুস্থ লোকটি চটে যেতেই পারে—এই থেকেই সিচুয়েশনটির উৎপত্তি—কিন্তু এ সিচুয়েশনের জন্য তাঁকে উদ্ভট কল্পনার মধ্যে যেতে হয় নি। আমাদের চারপাশের মানুষ ও পরিবেশের থেকেই তিনি তুলে নিয়েছেন পরিস্থিতিটিকে। কবিতার এরকম পরিস্থিতিটিকে। কবিতায় এরকম পরিস্থিতি যখন তিনি আনেন তখন সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত করে দেন উদ্ভট বিষয়গুলি—গল্পে উদ্ভটত্ব বর্জিত করে সোজাসুজি পরিস্থিতিটির মধ্যে চলে আসেন। 'ভয় পেয়োনা, ভয় পেয়োনা, তোমায় আমি মারব না' যে বলছে কবিতায় ছবিতে তার চেহারা দেখে উদ্ভট পরিস্থিতিটি বুঝে নেওয়া যায়। কিন্তু ডাকাত নাকি বা রাগের ওষুধে পরিস্থিতি আছে—উদ্ভটত্ব নেই। প্রকরণ পার্থক্যেই এই পরিবেশন পার্থক্য চলে এসেছে একথা মনে করা অন্যায় হবে না।

নানা গল্প পর্যায়ে এমন গল্প আছে যার মধ্যে পণ্ডিত মশাইয়ের বুদ্ধি ধরা পড়ে। এসব পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য থাকতে পারে কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান নেই। এই কাণ্ডজ্ঞানহীনতা থেকেই সিচুয়েশনের উৎপত্তি। পণ্ডিতমশাই সিদ্ধান্ত করেছিলেন কলুর বলদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথানেড়ে ঘণ্টা বাজিয়ে কলুকে যে ফাঁকি দেয় না তার কারণ বলদ ন্যায়শাস্ত্র পড়ে নি। এই রকম পণ্ডিতমশাই বা বিদ্যেবোঝাই বাবু মশাইয়েরা বার বার এসেছে স্নকুমার রায়ের রচনায়। যে কেতাবে হাজার জিনিস লেখা

থাকে সেখানে ষাঁড় গুঁতো দিতে এলে কী করা উচিত তা খুঁজতে হয় কেতাবী পণ্ডিতকে —নোটবই নিয়ে টুকে রাখতে হয় 'কাতুকুতু দিলে গরু কেন করে ছটফট' বা 'ঝোলাগুড় কিসে দেয় সাবান না পটকা'। সেই বিদ্যেবোঝাই বাবু মশাই মাঝিকে ভর্ৎসনা করেছিলেন চন্দ্রসূর্য কেন উদিত হয় কেন তাতে গ্রহণ লাগে, কেন সমুদ্রের জল লবণাক্ত এসব না জেনে জীবনের বারো আনাই বৃথা করে ফেলেছে। তারপরই ঝড় উঠেছে, নৌকা ডোবার অবস্থা হয়ে এসেছে এখন সাঁতার না জানা বাবু মশাইয়ের জীবনের ষোলোআনাই যে বৃথা হয়ে যাচ্ছে—এখন কি করা ?

৮

সুকুমার রায়ের গল্প বলার কায়দা জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছে ইস্কুলের গল্প পর্যায়ের গল্প গুলিতে। আমাদের সকলেরই বিদ্যালয় জীবনের নানা অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু সুকুমার রায়ের এই পর্যায়ের গল্পের মত অভিজ্ঞতা সকলের হয়েছে কি না সন্দেহ। কত রকমের অভিজ্ঞতা! নরেনের মতো ষণ্ডা ছেলের স্বভাব বদলে যায় (খোঁড়া সুধীর-বৈশাখ ১৯১৭) ছাত্রদের কবিতার রোগ সেরে যায় একমাস ধরে একটি কবিতা পঞ্চাশবার করে লিখে। কবিতাটি উদ্ধৃতির যোগ্য ঃ

পদে পদে মিল খুঁজি গুণে দেখি চোদ্দো
মনে করি লিখিতেছি ভয়ানক পদ্য!
নয় হবু-ভবভূতি নয় কালিদাস
কবিতার ঘাস খেয়ে চরি বারোমাস।

(আশ্চর্য কবিতা—জ্যৈষ্ঠ্য ১৯১৭)

ছেলেদের মারধোরকরা নতুন পণ্ডিত হরিপ্রসন্ন নামে, ছাত্র বলে ভুল করে হেড মাষ্টার মশাইকে পিটিয়ে দেন এবং শেষপর্যন্ত ইস্কুল থেকে চলে যান (নতুন পণ্ডিত—আষাঢ় ১৯১৭)। আজগুবি বস্তুকে চেনানো হয় জগ্যিদাসের মামার মন্ত্রে বলে কারণ মামাকে নিয়ে জগ্যিদাস বানিয়ে বানিয়ে অনেক আজগুবি কথা বলত। (জগ্যিদাসের মামা—শ্রাবণ ১৯১৭)। এ পর্যায়ের গল্পের মধ্যে ইস্কুলের নানা চরিত্রের ছাত্রদের মধ্যে আছে চালিয়াৎ শ্যামচাঁদ (চালিয়াৎ—জৈষ্ঠ্য ১৯১৭), যার সম্পর্কে বানিয়ে বলছে তার সামনেই যে বানাচ্ছে একথা না জেনে ধরা পড়ে যাওয়া সবজান্তা দুলিরাম (সবজান্তা—ভাদ্র ১৯১৮), আছে নন্দলালের মতো ছাত্র-প্রাইজ পাবার চেষ্টায় প্রাণপণ পড়ে সংস্কৃততে সে যেবার প্রথম হল সেবার পুরস্কার পেল ইতিহাসে প্রথম হওয়া ছাত্র (নন্দলালের মন্দ কপাল—আশ্বিন ১৯১৮)। আছে সেই ডিটেকটিভ ছাত্র যে কিনা চোর ধরবার নানা ফন্দীফিকির করে কিন্তু ধরতে পারে না খাবার খেয়ে যাওয়া চোরটি আসলে একটি বেড়াল (ডিটেকটিভ—কার্তিক ১৯১৮)। এর সঙ্গে কি মিলিয়ে নেওয়া যায় না আবোল তাবোলের 'চোরধরা' কবিতা এবং সঙ্গের

পরিপূরক ছবিটিকে—। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ঢাল তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি টাকমাথা দাড়িওয়ালা লোক, তারই পিছনে থালাভর্তি খাবার থেকে চুরি করে খেয়ে যাচ্ছে একটা বেড়াল। আকাশেও কয়েকটা পাখি উড়ছে বলাবাহুল্য তাদের দৃষ্টিও খাবারের দিকে : দূরে আরও একটি বেড়ালকে দৌড়ে আসতে দেখা যাচ্ছে।

এ পর্যায়ের গল্পের মধ্যে আছে ব্যস্ততার মধ্যে নাটক করার বিপত্তি নিয়ে বিষ্ণুবাহন (বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয়—ফাল্গুন ১৯১৮), বাহাদুরি দেখানোর অভ্যাসের ফলে যার দুর্দশার একশেষ হয় সেই ভোলানাথ (ভোলানাথের সর্দারি—চৈত্র ১৯১৮), ভাল মাঞ্জা ভেবে দেশলাইয়ের মশলা চুরি করে এনে যার বিপত্তি হয়েছিল সেই ব্যোমকেশ (ব্যোমকেশের মাঞ্জা—আষাঢ় ১৯২০) আর আছে ছবি আঁকা নিধিরাম (নিধিরামের ছবি)।

কিন্তু সকলের ওপরে আছে দাশু। সেই স্কুলে একটা বাক্স এনে কাউকে তা দেখতে বা ধরতে না দিয়ে সকলের কৌতূহল জাগ্রত করে শেষে সবাইকে 'অতিরিক্ত কৌতূহল ভাল নয়' 'কাঁচকলা খাও' ইত্যাদি লিখে বাক্সের মধ্যে তা রেখে তামাশা দেখে! রামপদর হাঁড়িতে চীনে পটকা ফাটিয়ে পণ্ডিতমশাইকে শুদ্ধ সারা ইস্কুলকে ভ্যাবাচাকা খাইয়ে দেয়! নাটক করতে নেমে পার্ট ভুলে জিভ কেটে হেসে ফেলে। নাটকের দিন যার করার কথা তাকে সরিয়ে নিজে দেবদূতের ভূমিকায় নামে। শুধু তাই নয় যেখানে তার পার্ট নেই সেখানে 'আবার সে এসেছে ফিরিয়া' বলে স্টেজে ঢুকে পড়ে। ঘাবড়ানো মন্ত্রীকে সর্দারি করে বলে 'বলে যাও কি বলিতেছিলে!' প্রতিহারী সেজেছিল রাখাল বলে যে ছেলেটি তাকে দেখে বলে ওঠে 'চেয়েছিল জোর করে ঠেকাতে আমায়ে এই হতভাগা' আর পরক্ষণেই চাঁটি মেরে তার পাগড়ি ফেলে দেয়—রাজার দেওয়ার কথা যে দীর্ঘ বক্তৃতা তা সে নিজেই দিয়ে দেয় এবং শেষে বলে 'যাও সবে নিজ নিজ কাজে।' ঘণ্টা বেজে ওঠে, পর্দা পড়ে যায়, অভিনেতারা দাশুকে নিয়ে আর পারে না। (দাশুর খ্যাপামি—আশ্বিন ১৯২০)।

ছাত্র বা ছেলেমানুষ বলেই নয়, অভিনেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার বাসনা দর্শকমণ্ডলীর সামনে প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনা অযাচিত সর্দারির এই পরিস্থিতি পরম্পরাই কৌতুকের উৎস খুলে দিয়েছে।

অভিনয়ের জগতে এইরকম একটি অভিনেতা যেমন দর্শকের সামনে অন্য অভিনেতাদের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অসহায় অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে তেমনি মাস্টারমশাইদের কাছে এইরকম ছাত্র সহপাঠীদের মধ্যে এমন ফাজিল ও মিচকেও কী দারুণ পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে তার উদাহরণ দাশু। যেমন চীনে পটকা গল্পে। পণ্ডিত মশাই ঘুমিয়েছিলেন বলেই দাশু 'চীনে পটকা' ফাটাতে পেরেছিল। দাশু তারপরও নিরীহ নালিশকারীর মত বলতে যায় যে 'আপনি যখন ঘুমোচ্ছিলেন তখন ওরা শ্লেট নিয়ে খেলা করছিল।' পটকা ফাটাবার ঘটনার পর শ্লেট নিয়ে খেলা করার নালিশ এই দুটো ঘটনা সামলাবার আগে পণ্ডিতমশাইকে সামলাতে হয় ক্লাশে নিজের ঘুমিয়ে পড়ার পরিস্থিতি। কিন্তু শুধু ঘটনাগত পরিস্থিতি নয় শব্দ ব্যবহারের দক্ষতাও পরিস্থিতি

তৈরি করে এখানে।

নিধিরাম কালাচাঁদের আঁকা ছবি দেখে একের পর এক সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে যাচ্ছিল বলে কালাচাঁদ রেগে মেগে নিধিরামকে মারল। হেড মাষ্টারমশাই কালাচাঁদকে জিজ্ঞেস করলেন নিধিরামকে সে মেরেছে কি না। কালাচাঁদ উত্তর দেয় 'আজ্ঞে না মারব কেন? কান মলে দিয়েছিলাম, গালে খামচে দিয়েছিলাম আর একটুখানি চুল ধরে ঝাঁকিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলাম।'

এগুলি মারা নয়। চুল ধরে ঝাঁকিয়ে মাটিতে ফেলতে হলে কতটা জোর লাগে আন্দাজ করা কঠিন নয়—তবু নির্দ্বিধায় যে বিশেষণটি সে ব্যবহার করে তা হল 'একটুখানি'। 'একটুখানি' শব্দটি কী অমোঘ।

শিল্পীর আঁকার উপরে ক্রমান্বয়ে সংশোধনী প্রস্তাব আনার ব্যাপারটিতেই যে পরিস্থিতি গড়ে ওঠে তার অসঙ্গতি বোঝা কঠিন নয়—তার মধ্যে মাঝে মাঝে এরকম উক্তি প্রত্যুক্তি সংলাপ শব্দ ব্যবহার আরও মশলা যুগিয়ে দেয়। কৌশলটি এত অনায়াসে ব্যবহৃত হয় যে তা কৌশল বলে মনেই হয় না। তবু এটা পরিস্থিতি নির্মাণের কৌশলই। এই কৌশলের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে অপর একটি অমোঘ কৌশল—তা হল বর্ণনাকারীর নিরীহ ভাবভঙ্গি।

৯

বস্তুত বর্ণনাকারীর গোবেচারা ভাবভঙ্গি প্রত্যেকটি গল্পের ক্ষেত্রেই এক একটা নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব করে। বর্ণনাকারী সাধারণত মন্তব্য ক'রে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে না—নিজেই বুঝে নিতে চেষ্টা করে। এই ভঙ্গিটিই প্রসন্ন হাসির পরিস্থিতির জন্ম দেয়। দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি:

আশ্চর্য কবিতা গল্পে পণ্ডিত মশাই যেমন বসন্তের টীকার মত কবিতা রোগের টীকা দিয়ে দিলেন তখন বর্ণনাকারী ছাত্রটি বলছে। 'এ কবিতার কী আশ্চর্য গুণ তারপর হইতে কবিতা লেখার ফ্যাশান স্কুল হইতে একেবারেই উঠিয়া গেল।' চীনে পটকা গল্পে রামপদর মিহিদানার হাঁড়িতে চীনে পটকা ফাটিয়ে পাগলা দাশু যুক্তি দিয়ে যায় রামপদর মিহিদানা নিয়ে রামপদ যদি যা ইচ্ছে তাই করতে পারে তবে তার পটকা নিয়ে সেও যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। এহেন যুক্তির পর আর তর্ক চলে না। তাই মাষ্টারমশাই ছাত্র সবাই চলে গেল। তখন বর্ণনাকারীর মন্তব্য:

'ছুটির পর আমরা সবাই মিলিয়া কত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে তাহার দোষ বুঝাইতে পারিলাম না।'

কালাচাঁদের ছবি গল্পটির কথা বলেছি। যেখানে কালাচাঁদ এঁকেছে খাণ্ডব দাহনের ছবি সেখানে নিধিরাম ছবিটাকে এদিকে ওদিকে পালটে সীতার অগ্নিপরীক্ষায় রূপান্তরিত করতে বলল, তারপরেই আবার অন্যরকমভাবে ওটিকে শিশুপালবধের ছবিতে পরিণত করতে পরামর্শ দিল; এ প্রস্তাব নিধিরামের পছন্দ না হওয়াতে

পরমুহূর্তেই ওটিকে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে রূপান্তরিত করতে বলে আবার তার পরের মুহূর্তেই পরামর্শ দেয় সমুদ্রমন্থনের ছবিতে পরিণত করার জন্য। এরপরই কালাচাঁদ থাকতে না পেরে নিধিরামকে মেরেছিল। বর্ণনাকারীর কথা এখন এইরকম :

'ব্যাপারটি কি বোঝা গেল না তাই সন্ধ্যায় সবায় মিলিয়া কালাচাঁদের বাড়িতে গেলাম। আমি বলিলাম 'ভাই কালাচাঁদ আমরা তোমার সেই ছবিটা দেখতে চাই সেই যে সমুদ্রলঙ্ঘন না কি যেন?' রমাপ্রসাদ বলিল, 'দূ্যৎ সমুদ্রলঙ্ঘন কিসের? অগ্নিপরীক্ষা।' আর একজন বলিল না না কি একটা বধ। কেন জানি না কালাচাঁদ হাঁ হাঁ করিয়া একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল।'

শিল্পীর ছবি দর্শকদের মনে শিল্পীর অভিপ্রেত বক্তব্য পৌঁছে দিতে পারছে না এটাই তার রাগের কারণ হতে পারে তার উপরে একের পর এক সংশোধনী প্রস্তাব, এরপরেও ছেলেরা খাণ্ডবদহনকে সমুদ্রমন্থন ব'লে উল্লেখ করতে গিয়ে সমুদ্রলঙ্ঘন বলে, অগ্নিপরীক্ষার কথা বলে। কিন্তু কালাচাঁদের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে নিরীহ মন্তব্য করে কালাচাঁদ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছে কেন তারা জানে না! এই 'কেন জানি না' শব্দ কটির নিরীহ ভঙ্গিই গল্পের স্বাদ বাড়িয়ে দেয়।

বর্ণনাকারীর নিরীহ বর্ণনভঙ্গির দ্বারা সৃষ্ট হাসি উৎসারিত হয় হ য ব র ল তে। সেখানে আটবছর তিনমাস বয়সী গল্প বলা ছেলেটি যে ভঙ্গিতে কথা বলে তাতেই আজগুবি ও উদ্ভট ঘটনাগুলির মজা বেড়ে যায়। সে সহজেই বলে :

'আমি ভারি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। তাই থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম ও হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। এই রকম শুনতে শুনতে আমার কেমন রাগ ধরে গেল। আমি ভয়ানক আপত্তি করে বললাম, এ হতেই পারে না। বুকের মাপও ছাব্বিশ ইঞ্চি গলাও ছাব্বিশ ইঞ্চি? আমি কি শুয়োর?'

ভুরিভুরি উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু তার বোধহয় আর দরকার নেই। বিশৃঙ্খল ঘটনা, অর্থহীন তথ্যসম্ভার, সংগতিসূত্রহীন চরিত্র, অভিনব চারিত্রিক প্রবণতা, স্বভাব এ সবই তাঁর ইঙ্গিত মাত্র যেন সারিবন্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে যায়। তখন বড়দের আর ছোটদের জগতের মধ্যেকার দুরতিক্রম্য ব্যবধানের মিথ যায় ভেঙে। ছোটরা যখন এই জগৎটাতে অনায়াসে বেড়িয়ে বেড়ায় তখন বড়রা চমকে গিয়ে মনে করে দেখে এই বিশৃঙ্খল জগতে সেও বিচরণ করত শুধু নয় এখনও বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। তাঁর কবিতাতে কেবল উদ্ভট অসঙ্গতির মাধ্যমে গড়ে ওঠা শুভ্র হাস্যরস পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় জীবনের বিচিত্র স্বাদ। তাঁর গল্পের জগতেও তেমনি দেখতে পাই আমাদেরই মনের লোভ হিংসা বাহাদুরি দেখাবার প্রবণতা শিশুর প্রাণবান্ চঞ্চলতা, আমাদের অল্পসল্প আয়ত্ত করা বা অনায়ত্ত বিজ্ঞান ইত্যাদির মাধ্যমে গড়ে ওঠা হাসির রস। আধার বদল হলে তরল পদার্থের আকার বদলে যায় গল্পের জগতে এসে তেমনি কবিতার জগতের একই উপাদান পাত্রপাত্রী সব ভিন্ন আকার মাত্র ধারণ করে। কিন্তু ফল একই থাকে। ব্যবহৃত উপাদানগুলি এখানেও যৌক্তিকতার প্রতিতুলনার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠা পৃথিবীর প্রতি আমাদের মনোভাবকে আগ্রহী এবং সহনশীল করে তোলে।



খেয়ালরসের কবি

রেখা রায়চৌধুরী

বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে সুকুমার রায় আবির্ভূত হন বর্তমান শতাব্দীরই গোড়ার দিকে। আর সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেই সুকুমার রায় জানিয়ে দিলেন বাংলা কবিতায় তিনি এনেছেন এক নতুন রস। সেই রসের নাম, তাঁরই ভাষায় "খেয়াল রস।" পাশ্চাত্য সাহিত্যের এডওয়ার্ড লীয়র এবং লুইস ক্যারলের "ননসেন্স-ভার্স"—এ যে রসের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীর পরিচয় ঘটেছিল আগেই, আবোল তাবোল-এ সেই "ননসেন্স ভার্স" রচনা করে কবি কৈফিয়ৎ দিলেন—

"যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব,
তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার।
ইহা খেয়ালরসের বই, সুতরাং সে-রস
যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না,
এ-পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।"

অর্থাৎ আবোল তাবোল-এর ছড়ার জগতে কৌতুকরস আস্বাদন করতে সুকুমার রায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রকৃত রসিক পাঠককে—'হাঁড়িচাঁচা"দের নয় আর "রামগরুড়ের ছানা"দের তো একেবারেই নয়। সুকুমার রায়ের এই অভিনব রচনাসম্ভার বাংলার শিশু সাহিত্যকে হঠাৎই যেন বেশ খানিকটা সাবালক করে তুলল: আর ছেলেভুলানো ভূত-প্রেত-দত্যি-দানোর গল্পের জগত থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাসাহিত্যের ক্ষুদে পাঠকেরা পেয়ে গেল এক অফুরান মজা ও চিরন্তন আনন্দের জগত। শিশু, কিশোর, বয়স্ক সব পাঠকের জন্য এই দুর্লভ আনন্দের আস্বাদ সেদিন বয়ে নিয়ে এসেছিল

সুকুমার রায়ের "আবোল তাবোল।"

আপাতদৃষ্টিতে সুকুমার রায়ের রচনাকে আজগুবি কল্পনা, অসংলগ্ন প্রলাপ বা নিতান্তই কৌতুককর কিছু ছেলেমানুষী বলে মনে হতেই পারে। কারণ সুকুমার-সাহিত্য কচিকাঁচাদের পাঠ্য, আর তা নির্মল আনন্দের উৎসও বটে। কিন্তু তার চেয়েও আরো কিছু, আরোও বেশি দিয়েছেন বলেই সুকুমার রায় বাংলাসাহিত্যে স্মরণীয় প্রতিভা। তাঁর সাহিত্য একাধারে শিশুপাঠ্য, সাধারণভাবে সাবালক পাঠ্য এবং বিশেষভাবে বিদগ্ধজনের সাহিত্য। চার্লি চ্যাপলিনের মতই তিনিও স্তরবহুল শিল্প। ভোক্তার তারতম্য অনুসারে কাউকেই বঞ্চিত হতে হয় না। সেই অর্থেই "প্রলাপেতে সফলতা" লাভ করে সুকুমার রায়ের কবিতা শিল্পসীমায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

সুকুমার রায় ছিলেন "টুনটুনির বই" —খ্যাত উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র। অর্থাৎ পারিবারিক সূত্রে তাঁরা পিতা-পুত্র ছিলেন শিশুসাহিত্যের কারবারী। এছাড়া বিজ্ঞানের সুযোগ্য এবং সফল ছাত্র, ফটোগ্রাফিতে পারদর্শী, চিত্ররচনায় দক্ষ সুকুমার রায় একসময় ছোটদের পত্রিকা "সন্দেশে"র সম্পাদকও ছিলেন। আর সাহিত্যকৃতিতে আধুনিক বাংলাসাহিত্যে তাঁর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য। যেমন পাশ্চাত্ত্যসাহিত্যে ছিলেন লীয়ার বা লুইস্ ক্যারল। এঁদের রচনা পাঠ করে সুকমার রায় বাংলায় "আবোল তাবোল" রচনা করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন কিনা, একেবারে নিশ্চয় করে বলা না গেলেও, লীয়র এবং ক্যারলের জীবনধারায় সঙ্গে কিছু পরিবেশগত সাদৃশ্য যে সুকুমার রায়ের ছিল, তা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। এডোয়ার্ড লীয়র ছিলেন চিত্ররচনায় দক্ষ শিল্পী। ছেলেমেয়েদের আমোদ দেবার জন্যই ইনি "ননসেন্স ভার্স" লিখতে সুরু করেন। অপরদিকে লুইস্ ক্যারল ছিলেন অক্সফোর্ডের কৃতি ছাত্র—গণিতের গবেষক-শিক্ষক। ইনিও চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন আবার ফটোগ্রাফিতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। ইনিও তাঁর অধ্যাপকের কন্যার জন্য অ্যালিস্-এর কাহিনীগুলো লিখেছিলেন। এদেশেও দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত জীবনে কাব্য, কবিতা, গান, নাটক রচনা করেছেন প্রচুর, কিন্তু যখন তিনি অদ্ভুতরসের কবিতা 'খাপছাড়া' আর আজগুবি কল্পনা প্রসূত 'সে' রচনা করছিলেন তখন কিন্তু তার পাশাপাশি তিনি বিজ্ঞান সাধনা করে চলেছিলেন, তার ফলশ্রুতি দেখেছি 'বিশ্বপরিচয়-'এ। রবীন্দ্রনাথও এই জাতীয় রচনাগুলো লিখেছিলেন 'ছেলেদের'-জন্য। অনুরূপভাবে বলা যায়, সুকুমার রায়ের 'আবোলতাবোল' এর অধিকাংশ কবিতাই 'সন্দেশে'-এ প্রকাশিত, সুকুমার রায় ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে ডিগ্রী লাভ করেন। নিজ পরিবারে ভাইবোন, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বড় হয়েছিলেন, আর ছেলেমানুষদের স্নেহবন্ধনে থেকেই বোধ হয়, ছোটদের জন্য ছড়া, গল্প, নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ছোটদের সাহচর্য আর বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ বা আগ্রহ—এই দু'টিই এদেশের ও ওদেশের শিশুসাহিত্যের রচয়িতাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই থেকে আমরা বোধহয় একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে 'mathematical precisionই হল বিজ্ঞানরীতি। উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির পেছনে এই

বিজ্ঞানরীতি দাঁড়িয়ে অসম্ভব কথা ও কল্পনার চালটাকে শাসিত করে। সে-জন্যই 'যা-তা লেখা তেমন সহজ নয় তো' ওদেশের Lear, Raspe, H. G. Wells, Carroll, এদেশের ত্রৈলোক্যনাথ সুকুমার রায়, রাজশেখর বসু, সকলেই যে বিজ্ঞানীমনের অধিকারী ছিলেন, তা হ'ল উদ্ঘাটিত সত্য।[১]

সাধারণভাবে সাহিত্যকে আমরা বয়স্কদের কুক্ষিগত করে রেখেছি। বাংলাসাহিত্যে শিশুসাহিত্যের ধারাটি বড়ই অবহেলিত। অবশ্য এইসঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে শিশুসাহিত্য বলতে, কিছু অর্থহীন, বক্তব্যহীন, প্রলাপমাত্রকেই বোঝায় না। 'শিশুসাহিত্য' বলতে, তার একটি বিশেষ সংজ্ঞা নির্দেশ না করেও বলা যায়, শিশুমনকে তুষ্ট, তৃপ্ত ও আনন্দিত করে এমন কিছু রচনা, তা গল্পেই বলা হোক বা ছড়াতেই বলা হোক, তাকেই আমরা শিশুদের জন্য রচনা বলে চিহ্নিত করতে পারি। এই ধরণের রচনার কখনও কখনও বিশেষ কিছু বক্তব্য থাকলেও, তা গভীরে নিহিত থাকে-সেটি শিশুমনকে স্পর্শ না করলেও, বড়দের কাছে তার একটি পৃথক মূল্য থাকে। এই ধরণের "সৎ" শিশুসাহিত্য যখন আমাদের সাহিত্যভাণ্ডারে খুব অল্পই ছিল, তখন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর "টুনটুনির বই"-বাংলাসাহিত্যের নবদিগন্ত খুলে দিল। আর একটু পরেই কোনওরকম হিতোপদেশ না দিয়ে একেবারে ছোটদের মনের মতন বেশ কিছু কৌতুকরসোচ্ছল ছড়া, গল্প, নাটিকা লিখলেন সেই বিখ্যাত রায়চৌধুরী পরিবারের সন্তান এই সুকুমার রায়। হাস্য ও কৌতুকের যে অজস্র ধারা উৎসারিত হয়েছিল সুকুমার রায়ের কবিতায়, তার মূলে দেশি ও বিদেশি প্রভাব ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কতকগুলি রচনার প্রভাব যে পড়েছিল, সে কথা স্মরণ করে সুকুমার সেন মহাশয় বলেন—'এ ছাড়াও আরেকটি আদর্শ ছিল যা প্রবলতর, তা হ'ল রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কতকগুলি রচনা "হাস্যকৌতুক" বইয়ে সংকলিত নাট্যখণ্ডগুলি "বৈকুণ্ঠের খাতা" প্রহসন, এবং "হিং টিং ছট্"-এর মতো কবিতা।

শিশুসাহিত্য বলতে প্রথমেই মনে পড়ে রূপকথা-জাতীয় রচনা যা সম্ভব অসম্ভবের সীমা পেরিয়ে গিয়েও হয়ে ওঠে অপরূপ। এছাড়াও আমরা পাই আর একধরণের রচনা, যার বক্তব্য কিছু থাক বা না থাক, কৌতুকরসই এতে প্রাধান্য লাভ করে। এই ধরণের রচনাগুলো শিশুসেব্য তো বটেই কিন্তু এর সবকটিই যে শিশুবোধ্য হয়ে ওঠে, তা কিন্তু একেবারেই নয়। "আবোল তাবোল" এর কবি সুকুমার রায় এই দুইধরণের ছড়া বা কবিতারচনায় নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। একদিকে যেমন রয়েছে শুধুই মজার বর্ণনা

হাতিমির দশা দেখ-তিমি ভাবে জলে যাই
হাতি বলে, "এই বেলা জঙ্গলে চল ভাই"
সিংহের শিং নেই, এই তার কষ্ট—
হরিণের সাথে মিলে শিং হল পষ্ট। (খিচুড়ি)

অন্যদিকে রয়েছে অপূর্ব কাব্যে যা প্রায় রূপকথার মতো—

হেথায় রঙিন আকাশতলে

স্বপন দোলা হাওয়ায় দোলে
সুরের নেশার ঝরণা ছোটে,
আকাশকুসুম আপনি ফোটে
রঙিয়ে আকাশ, রঙিয়ে মন
চমক জাগে ক্ষণে ক্ষণ। (আবোল তাবোল-প্রান্তিক)

এই ধরণের রচনাকে শুধুমাত্র 'ছড়া' বা 'আবোল তাবোল'—বলে নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না।

আধুনিক বাংলাসাহিত্যে সুকুমার রায় অতুলনীয় বা অনন্য বলে স্বীকৃত। "অসম্ভবের ছন্দেতে" "খেয়াল রসের বই" রচনা করেই কবি তাঁর নিতান্ত স্বল্প জীবনে সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছেন। কারণ বাংলাসাহিত্যে এই ধরণের রচনার পথিকৃৎ তিনিই। সুকুমার নিজে ছিলেন নির্বিরোধী আমুদে মানুষ। ছোট্ট একটি কথাকে নিয়ে নানাধরণের কৌতুক সৃষ্টি করতে, তাঁর জুড়ি ছিল না। সেই মানুষ যখন বিলেতে গেলেন, তখন সুকুমার রায়ের পরিচয় ঘটে লীয়ের ও ক্যারলের সঙ্গে অবশ্যই তাঁদের সাহিত্যরচনার মাধ্যমে। এরপরে তিনি উৎসাহিত হয়ে বাংলায় "ননসেন্স-ভার্স" রচনা করেন। কারণ বোধহয় এই যে,—ক্যারলের মতো তিনিও (সুকুমার রায়) ছিলেন একাধারে শিল্পী ও বিজ্ঞানী; লিয়রের মতো একাধারে চিত্রী ও লেখক, ক্যারলের মতোই শব্দতত্ত্বে সন্ধানী ছিলেন, আর উভয়ের মতোই জন্মেছিলেন লজিকনিষ্ঠ মনের সঙ্গে খামখেয়ালি মেজাজ নিয়ে। এ-দুয়ের মিলন ঘটলে তবেই সত্যিকার খেয়াল-খাতা লেখা যায়, নয়তো ও বস্তু আক্ষরিক অর্থেই "ননসেন্স" হয়ে পড়ে।[২]

এডওয়ার্ড লীয়র ও লুইস্ ক্যারলের কোনও কোনও কবিতার সঙ্গে সুকুমার রায়ের রচনাগত সৌসাদৃশ্য স্বাভাবিকভাবেই আমাদের নজরে পড়ে—Lear এর The owl and pussy cat-এর কয়েকটি লাইন—

The owl looked up to the star above,
And sang to small, guitar,
O lovely pussy ! O pussy, my love,
What a beautiful pussy you are,
You are
You are
What a beautiful pussy you are[৩]

মনে করিয়ে দেয় সুকমার রায়ের "প্যাঁচা আর প্যাঁচানী"র কথা সুকুমার রায়ের প্যাঁচা বলছে—

তোর গানে পেঁচি রে :
সব ভুলে গেছি রে,
চাঁদমুখে মিঠে গান

শুনে ঝরে দুনয়ান।

আবার Lewis Carroll-এর

"The white knight Tells his Tale"-এ ক্যারল লিখছেন

He said 'I look for butterflies
That sleep among the wheat;
I make them into motton pies,
And sell them in the street,
'I sell them into men' he said,
Who sail on stormy seas,
A trifle, if you please".[8]

এই "আজগুবি চাল"-আমরা সুকুমার রায়ের "ছায়াবাজীতে" দেখতে পাই। সুকুমার রায় লিখেছেন—

ছায়াধরার ব্যবসা করি তাও জাননা বুঝি?
রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া, হরেকরকম পুঁজি!
শিশির ভেজা সদ্য ছায়া, সকাল বেলায় তাজা,
গ্রীষ্মকালে শুকনো ছায়া ভীষণ রোদে ভাজা।

আরও আছে এই ধরণের উদাহরণ। ক্যারল-এর ঐ একই কবিতায় কবি বলছেন—

'I heard him then, for I had just
Completed my design
To keep the Menai bridge from rust
By bolling it in wine.'[৫]

সুকুমার রায় লিখছেন—

রাত্রে কেন ট্যাঁকঘড়িটা ডুবিয়ে রাখে ঘিয়ে
কেন রাজার বিছানা পাতে শিরীষ কাগজ দিয়ে
(বোম্বাগড়ের রাজা)

কল্পনার অসঙ্গতিই এই ছড়াগুলোতে আমাদের খোরাক জুগিয়েছে। আবোল-তাবোল ময় ছড়িয়ে রয়েছে এই ধরণের বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া নিয়মহারা হিসেব-হীন সব কাণ্ডকারখানা। শিশুসাহিত্য সত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে শিশুর বিশ্বাসে, শিশুর মনে তাই আবোল তাবোল এর জগত বাস্তব না হয়েও সত্য রঙ্গব্যঙ্গের রচনার গতি বড় নয় সেখানে বড় প্রয়োজন যতির। এই কথা তিনি জানতেন এবং বুঝতেন বলেই সুকুমার রায় আবোলতাবোলকে নিয়মহীন-এর নৈরাজ্যে নিয়ে যাননি বা অর্থহীন প্রলাপে আবোলতাবোলকে ব্যর্থ হয়ে যেতে দেননি। এই বই-এ কোথাও কোথাও সুকুমার রায় ছবি ও কৌতুকের বহিরাবরণের মধ্যে হাল্কা চালে চলতে চলতে বেশ গভীর কথা বলেছেন। যেমন—

মন বলে আর কেন সংসারে থাকি
বিলকুল সব দেখি ভেল্কির ফাঁকি (হুলোর গান)

কিংবা যেখানে বলছেন—

হেথায় রঙিন আকাশতলে
স্বপন দোলা হাওয়ায় দোলে
সুরের নেশার ঝরনা ছোটে·
আকাশ কুসুম আপনি ফোটে

(আবোল তাবোল)

এইসব সময়ে সুকুমার রায়কে শুধুমাত্র সরস শিশু-পাঠ্য ছড়ার জনক বলে মনে হয় না, তাঁকে 'সাবালক পাঠ্য' কবিতার কবি বলতে ইচ্ছে করে।

'আবোল তাবোল' নামকরণ, 'আবোল তাবোল'-এর 'কৈফিয়ৎ' অংশ আর 'আবোল তাবোল'-এর 'আয়রে ভোলা, খেয়াল খোলা/স্বপন দোলা নাচিয়ে আয়',—কবিতার মধ্য দিয়ে একটি ভূমিকা করেছেন সুকুমার রায়। এই ভূমিকার মধ্য দিয়ে 'ক্ষ্যাপামো'র একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। এই পরিবেশেই সৃষ্টি হয়েছে, 'লড়াই ক্ষ্যাপা' 'কুমড়ো পটাশ' 'বুড়ীর বাড়ী', 'অবাক কাণ্ড' 'গন্ধ বিচার' 'ঠিকানা' —এইসব এবং এইরকম আরও কত পদ্যে! কিন্তু এই সবগুলো কি শুধুই খ্যাপার গান? একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই আপাত-পাগলাটের জগত থেকে কবি, পাঠককে নিয়ে পৌঁছে যান কাব্যের জগতে তখন কাব্যিক সুষমায় ভরে ওঠে কবি কল্পনা। 'পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড়ে'র ভালত্ব প্রতিপন্ন করতে কবি বলেছেন—

মেঘ-মাখানো আকাশ ভাল,
ঢেউ-জাগানো বাতাস ভাল,

আবার ভূতের মায়ের ছেলে আদরের অদ্ভুত উদ্ভট প্রকাশ ঘটেছে এইভাবে—'ওরে আমার বাঁদর-নাচন আদর-গেলা কোঁৎকারে' আর তার ঠিক পরেই আসছে অপূর্ব কিছু পংক্তি। যেমন—

···ওরে আমার বাদ্‌লা রোদে জষ্ঠি মাসের বিষ্টিরে,
···ওরে আমার জোছনা হাওয়ার স্বপনঘোড়ার চড়নদার।

কখনও আবার 'রামগরুড়ের ছানা'র রাগী রাগী গোমড়ামুখ বর্ণনা করতে করতে, হঠাৎ বলে ফেলেন—

ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাক জ্বলে আলোর তালে
হাসির ঠারে ঠারে।

কিংবা মাঝরাতে আকাশে চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যে হুলো মালপোয়া লোভী হয়ে ওঠে, তার কথা বলতে গিয়ে কবি সুকুমার রায় বলছেন—

বিদ্‌ঘুটে রাত্তিরে ঘুট্‌ঘুটে ফাঁকা,
গাছপালা মিশ্‌মিশে মখ্‌মলে ঢাকা
জট্‌বাঁধা ঝুল কালো বটগাছতলে,
ধক্‌ধক্ জোনাকির চক্‌মক জ্বলে।

সুকুমার রায় তাঁর ছড়াগুলোতে ভাবের 'খিচুড়ি' করলেও ছন্দশিল্পী হিসেবে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি 'ছন্দের ব্যাকরণ' মেনে চলেছেন সযত্নে। আবার এরই সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়, তাঁর কবিতায় যেমন রয়েছে অনুপ্রাসের ঝঙ্কার, তেমনি রয়েছে যমকের চমক। অনুপ্রাসের ধ্বনিঝঙ্কারে সুকুমার রায়ের 'শব্দকল্পদ্রুম' অনুরণিত। কবি বলছেন—

'চুপ চাপ ঐ শোন, ঝুপ ঝাপ ঝপাস।
চাঁদ বুঝি ডুবে গেল? গব্ গব্ গ-বাস্।
খ্যাঁশ খ্যাঁশ ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ, রাত কাটে ঐ রে।
দুড় দাড় চুরমার—ঘুম ভাঙে কই রে!'

'শব্দকল্পদ্রুমের' ধ্বনিকৌতুকের সঙ্গে সঙ্গে একটা নতুন জগৎ নতুন খবর নিয়ে আসে আমাদের কাছে—তা হচ্ছে ফুল ফোটা বা রাতকাটার একটা শব্দ আছে, আবার গন্ধ ছুটে যাওয়ার কিংবা হিমপড়ার আছে এক একটি অদৃশ্য ছবি।

অনুপ্রাস রচনায় সুকুমার রায়ের ক্ষমতার পরিচয় আমরা পেয়েছি, যমক প্রয়োগেও তিনি ছিলেন নিপুণ অথচ সচেতন শিল্পী। 'খাই-খাই' বা 'পাকাপাকি'-তে রয়েছে আগাগোড়াই যমকের ঠাসবুনানি। যেমন—

আকাশেতে কাৎ হয়ে গোঁৎ খায় ঘুড়িটা,
পালোয়ান খায় দেখ ডিগ্‌বাজি কুড়িটা।
ফুটবলে ঠেলা খাই, ভিড়ে খাই ধাক্কা,
কাশীতে প্রসাদ খেয়ে সাধু হই পাক্কা।' (খাই-খাই)

কিংবা আবার—

রাঁধুনি বসিয়া পাকে পাক দেয় হাঁড়িতে
সজোরে পাকালে চোখ ছেলে কাঁদে বাড়িতে।
(পাকাপাকি) পাকায়ে পাকায়ে দাড়ি টান হয়ে থাকে সে।
দু'হাতে পাকালে গোঁফ তবু নাহি পাকে সে॥

শব্দ আর ছন্দের ধ্বনিগত আকর্ষণ সুকুমার রায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, অনুকার শব্দে ভরে আছে তাঁর লেখা। শব্দব্যবহারের ব্যাকারণগত কৌতুকও তিনি ধরিয়ে দিতে চান পাঠকদের. এ কথা ঠিক, এর সবচাইতে ভাল উদাহরণ হচ্ছে 'বুড়ীর বাড়ী'। এই বাড়ী বর্ণনায় কাঁচা ঘরের নড়বড়ে ভাবটা কবি ফুটিয়ে তুলেছেন হস্তধ্বনিগুলোর অবিরাম প্রয়োগে। আর সেই সঙ্গে রয়েছে চমকপ্রদ বর্ণনা—

'গালভরা হাসিমুখে চালভাজা মুড়ি
ঝুরঝুরে প'ড়ো ঘরে থুরথুরে বুড়ী।'

'জোড়কলম' শব্দের ব্যবহার বা ইংরেজী শব্দ বাংলায় প্রয়োগের সুন্দর উদাহরণ রয়েছে যথাক্রমে 'খিচুড়ি' আর 'নারদ নারদ'-এ। বাংলার সঙ্গে ইংরেজী শব্দ জুড়ে দিয়ে ঝগড়াটা যখন বেশ জমে উঠেছে, তখনই এল 'শান্তির' প্রস্তাব—

"শেক্‌হ্যাণ্ড আর 'দাদা' বল সব শোধ বোধ ঘরে চল"।

"ডোণ্ট পরোয়া অল্‌রাইট্‌ হাউ ডুয়ুডু গুড নাইট।"

এরপর আসে আবোল তাবোল-এর চিত্র-রচনার প্রসঙ্গ। লীয়র-এর লিমেরিক গুলোর মত আবোল তাবোল-এর পদ্যগুলোও অনেকাংশে চিত্রনির্ভর। এরমধ্যে কিছু কিছু চিত্র শিশুমনে ভয় না হলেও, বেশ অস্বস্তি জাগায়। যেমন 'ভয় পেয়োনা', 'ট্যাঁশ গরু' প্রভৃতি কবিতার চিত্রগুলো। অন্যদিকে চিত্রের জন্যই মজাটা পুরোপুরি পাওয়া যায় 'খুড়োর কল' 'চোরধরা' 'কি মুস্কিল', 'কাঁদুনে' প্রভৃতি কবিতায়। খুড়োর কলের চিত্রটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে কেন—

'এমনি করে লোভের টানে খাবার পানে চেয়ে,
উৎসাহেতে হুঁস রবে না চলবে কেবল ধেয়ে।'

'চোরধরা'তে ঢাল নিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হোল যেদিকে, ঠিক তার উল্টোদিক থেকে 'রামু', 'দামু', 'ওপাড়ার ঘোষ বোস্‌'—কেউই নয়, কাক, পাখী, বিড়াল এরা এসে করে দিল পাতাখানা শূন্যি'! চিত্রের জন্যই কবিতাটিতে একটি আলাদা মেজাজ এসেছে। 'কি মুস্কিল' সম্বন্ধেও ঠিক ঐ একই কথাই বলা যায়।

'কাঁদুনে' বুথ সাহেবের বাচ্চা—
'কাঁদবে না সে যখন তখন, রাখবে কেবল রাগ পুষে,
কাঁদবে যখন খেয়াল হ'ব খুন-কাঁদুনে রাক্ষুসে'

এমন বাচ্চার চিত্র যথার্থভাবেই আঁকা হয়েছে। তাতে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে —'গিলতে চাহে দালানবাড়ী হাঁখানি তার হাঁক্‌ দিয়ে'।

আবোল তাবোল-এর প্রায় সব কবিতাই কৌতুকরসে ভরপুর কিন্তু বিশেষ করে মজাদার হয়ে উঠেছে উপস্থাপনার গুণে 'আহ্লাদী' আর 'রামগরুড়ের ছানা' ছড়া দুটি, দুটি কবিতাকে পর পর সাজানো হয়েছে। সিগনেট প্রেস-এর আবোল তাবোল-এ বাঁয়ের পাতায় 'আহ্লাদী' আর ডাইনে রয়েছে 'রামগরুড়ের ছানা'। 'আহ্লাদী' বলছে —'হাসছি কেন কেউ জানে না, পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই'—আর 'রামগরুড়ের ছানা?'

'সদাই মরে ত্রাসে—ঐ বুঝি কেউ হাসে।'

এই দুই বিপরীত কোটির দুই চরিত্রকে পশাপাশি রাখলে অজিত ঘোষের মন্তব্যের সার্থকতা অনুধাবন করা যায়। তিনি বলেন—'কৌতুকময় হাস্যরসের মধ্যে উদ্ভট ও অস্বাবিক ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ থাকে! যাহা সহজেই মনকে ধাক্কা দিয়া সচকিত ও আমোদিত করিয়া তোলে তাহাই এই হাস্যরসের প্রাণ।' আবার এই সঙ্গেই মনে পড়ে সুকুমার রায়ের "ট্যাঁশ গরু"কে। যার কথা বলতে গিয়ে কবি বলছেন— 'ট্যাঁশ গরু গরু নয়, আসলেতে পাখি সে'—

সুকুমার রায়ের সৃষ্টিতে যেমন রয়েছে কাষ্ঠ-বিশারদ "কাঠবুড়ো", তেমনি আবার অন্যদিকে রয়েছে "হাতুড়ে"। তার জানা আছে ডাক্তারি 'বিদ্যেটা নয় কিছু শক্ত।' গুরুর নির্দেশে কাগজের রোগী কেটে কেটে সে হাত পাকিয়েছে। এবার সে তার বিদ্যেটা প্রয়োগ করতে চায় জ্যান্ত রোগীর ওপরে।

সেইজন্য মানুষকে অভয় দিয়ে সে বলছে—

'কার কানে কট্‌কট্‌ করে নাকে সর্দি,
এস, এস ভয় কিসে? আমি আছি বদ্যি।
শুয়ে কেরে? ঠ্যাং-ভাঙা, ধ'রে আন এখেনে।
স্ক্রুপ দিয়ে এ'টে দেব কিরকম দেখে নে।
গালফোলা কাঁদ কেন? দাঁতে বুঝি বেদনা?
এস এস ঠুকে দেই—আর মিছে কে'দো না।'

"ফুটস্কোপ"—কি তা হয়ত বৈজ্ঞানিক জানেন না, কিন্তু তাই দিয়ে 'মুন্ডুটা' দেখলে নাকি বোঝা যায়—। কোন দিকে বুদ্ধিটা খোলে, কোন দিকে ঠেকে যায় চাপা,
কতখানি ভস্‌ভস্‌ খিলু, কতখানি ঠক্‌ঠকে ফাঁপা।

কিংবা—মুন্ডুতে 'ম্যাগনেট' ফেলে, বাঁশ দিয়ে 'রিফ্লেক্‌ট' ক'রে,
ই'ট দিয়ে 'ভেলসিটি' কষে দেখি মাথা ঘোরে কিনা ঘোরে,

এই যে কাষ্ঠতত্ত্ববিদ্‌ বা ডাক্তার বা বৈজ্ঞানিক—এরা কেউই কিন্তু আমাদের অপরিচিত নয়। তবুও এই পদ্যগুলোর কোথাও কোনও ব্যঙ্গ বা শ্লেষ নিহিত রয়েছে একথা মনে না করাই ভাল। কারণ এতে যে কৌতুকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, কিছুটা ভাবনার অভিনবত্বে আর কিছুটা ভাষার কারিকুরিতে, এইজন্যই বোধহয় বলা হয়—

'Nonsense verse makes absurd assertions. It often jingles and uses non existent words. Thus combining pleasant orderly sounds with absurdities which frustrate the intellert.'[৬]

সুকুমার রায়ের রচনার ক্ষেত্রে এ তো উম্ঘাটিত সত্য।

ব্যক্তিগতজীবনে সুকুমার রায় ছিলেন কৌতুকপ্রিয় আর মজলিসী মেজাজের মানুষ। তিনি জেহাদ ঘোষণা করেছেন গোমরামুখিতার বিরুদ্ধে। সম্ভবতঃ এইজন্যই তিনি 'নন্‌সেন্স' ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন। আর এরও কিছুদিন পরে আরও একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়,যেটির নাম ছিল 'মান্ডে ক্লাব'—সুকুমার রায় তর্জমা করে তাকেই করে তোলেন 'মন্ডা সম্মেলন'। এই সমস্ত নামকরণের মধ্য দিয়ে মোটামুটিভাবে আভাস পাওয়া যাচ্ছিল যে, সুকুমার রায়ের সাহিত্যের মূলধারাটি কোন পথে প্রবাহিত হতে চলেছে। আর তাঁর এই পথটি তৈরী হয়েছিল তাঁর "অসাধারণ পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা", "অফুরন্ত কল্পনাশক্তি" ও "অসংলগ্ন অর্থহীন বাক্য" সমষ্টির" সমন্বয়ে।

সাধারণতঃ "নন্‌সেন্স"-এর জগতটা হয় একটু আলাদা ধরণের। কখনও তা হয় রূপকথার রাজ্যের কাছাকাছি আবার কখনও বা অসম্ভব, অকল্পনীর সমস্ত কিছুকে নিয়েই। কিন্তু সুকুমার রায়ের ক্ষেত্রে দেখি তার কিছু ব্যতিক্রম। সুকুমার রায়ের একটা নিজস্ব জগৎ ছিল, বলা যায় সেটি ছিল তার একান্ত নিজস্ব একটি জগৎ। এই জগৎ সম্বন্ধেই জীবনানন্দ দাশ বলছেন—'সুকুমার রায়ের পৃথিবী আবোল

তাবোল-এ যা সত্য হয়ে ফলে উঠেছে তা মোটেই আমাদের চেনাজানা পৃথিবী কিংবা তার প্রতিচ্ছবির মতো বাস্তব না হয়েও তেমনি পরিচিত ও তেমনি সত্য।' বলা যেতে পারে এই জগতেই সুকুমার রায়ের খাঁটি সাহিত্যিক ননসেন্সগুলো নির্মল হাসির উদ্রেক করেছে, যদিও তা করেছে গাম্ভীর্যের মুখোশ পরে। যেমন 'গোঁফ চুরি'র বড়বাবু—তিনি 'হেড অফিসের বড়বাবু'—অমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হঠাৎ—

'রেগে আগুন তেলে বেগুন, তেড়ে বলেন তিনি
কারো কথার ধার ধারিনে, সব ব্যাটাকেই চিনি।
নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা,
এমন গোঁফ তো রাখত জানি শ্যামবাবুদের গয়লা।
এ গোঁফ যদি আমার বলিস্ করব তোদের জবাই—
এই না বলে জরিমানা কল্লেন তিনি সবায়।'

গোঁফ চুরি কখনও কারও হয় না কিন্তু এখানে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে যে, ছোটদের সঙ্গে মিলে বড়দেরও সাময়িকভাবে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করবে যে, যা কখনও হয় না, তাই আবার কখনও হতেও পারে।

আমরা যখন পড়ি—

রোদে রাঙা ইঁটের পাঁজা তার উপরে বসল রাজা
ঠোঙাভরা বাদামভাজা খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না
গায় আঁটা গরমজামা পুড়ে পিঠ হচ্ছে ঝামা,
রাজা বলে বৃষ্টি নামা—নইলে কিছু মিলছে না।

তখন কিন্তু ছন্দ-মিলের যাদু আমাদের ভুলিয়ে দেয়, তা নয়, এর চাইতেও বেশি অবাক লাগে ভাবতে—রাজার আসন "রোদে রাঙা ইঁটের পাঁজা"—কেন? কেনই বা রাজা বাদাম ভাজা খাচ্ছেন, যদি বা খাচ্ছেন, তা গিলছেন না কেন? যে গরমজামা শীত নিবারণ করে,, সেই গরমজামা পরে কেন রাজা বৃষ্টির প্রত্যাশায় রয়েছেন?—এই সমস্ত অকল্পনীয় ব্যাপার আর তার সঙ্গে শব্দ ছন্দ চিত্র মিলিয়ে আমাদের নিয়ে যায় এক কৌতুকের জগতে, যা একেবারেই সাধারণ নয়, কিছুটা অভিনবও বটে। এইজন্যই বোধহয় শঙ্খ ঘোষ বলেছেন—'লিয়ার বা সুকুমার রায়ের মত লেখকেরা তাই ঘুরে বেড়ান একই সঙ্গে দুই ভিন্ন তলে; ছোটদের আর বড়োদের দুই তল, রঙ্গের আর সত্যের দুই তল। সুকুমার রায়ের বিষয়ে আরো একটু এগিয়ে হয়তো বলা যায় খেয়ালের আর কল্পনার দুই তল।' —এই দুই তলের মিলনের ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায় আবোলতাবোল-এর অনেক কবিতায়।

সুকুমার রায়ের কৌতুক বা হাসি শ্লেষমিশ্রিত ছিল না, তবে ব্যঙ্গ ছিল না কোথাও, একটা বোধহয় বলা যায় না। 'কিম্ভূত' 'সৎপাত্র' খুঁতধরা বুড়ো' 'একুশে আইন'—প্রভৃতি কবিতাতে ব্যঙ্গের সুর প্রচ্ছন্নভাবে থাকলেও রয়েছে। এগুলো আপাতদৃষ্টিতে

'Playful Poetry' কিন্তু 'It often combines light-heartedness or whimsy with a mildly "Satiric thrust."[৮]

তাঁর সমস্ত রচনার পরিপ্রেক্ষিতে 'আবোলতাবোল'-এর স্রষ্টা সম্বন্ধে বলা যায়—'If Nonsense be madness, most certainly there is method in it. Great Nonsense creators like Sukumar Roy have mastered what can be called vss. communication—or verbal visual synchronized communication—that with the laser beam of laughter opens magic doors into the mind.'[৯]

'আবোল তাবোল'-এর আজগুবি জগতে যখন সবকিছুই উল্টোপাল্টা চালে চলে, তখন নিয়মে চলছে শুধু একজনই—সে হচ্ছে "বুদ্যিবুড়ো"। সারাদিন না খেলে তার খিদে পায়, সে চোখ দিয়েই দেখে আর কান দিয়েই শোনে। তার সবকিছুই এত স্বাভাবিক যে, 'আবোল তাবোল'-এর অসম্ভবের জগতে বুদ্যিবুড়ো এক নতুন কৌতুকের সৃষ্টি করেছে।

এই সঙ্গেই সুকুমার রায়ের অন্য আর একরকমের ছড়ার কথা উল্লেখ করতে হয়। যেগুলোতে কবি নতুনভাবে চমক সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রায় সব ছড়াগুলিই চিত্র সমন্বিত কিন্তু আলোচ্য ছড়াগুলোর বৈশিষ্ট্য এই যে, এইগুলো সৃষ্টি হয়েছে বাংলা প্রবাদবচনের সমন্বয়ে। আর চিত্রগুলো হয়েছে ছড়ার সহগামী। এই চিত্রআর অনুগামী ছড়াগুলো আমাদের এক নতুন রসের সন্ধান দেয়। আর এইসঙ্গেই সুকুমার রায়ের সম্বন্ধে এক নতুন উপলব্ধির সঞ্চার হয়। কবি যে কত অনায়াসে শব্দের একেবারে গভীরে প্রবেশ করে অর্থ চয়ন করে আনতে পারতেন, তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। 'ছবি ও গল্পে'—'গোল্লা পাওয়া', 'রাগে আগুন হওয়া', 'পিটিয়ে তুলো ধোনা', 'বুকফাটা' 'চোখের জলে ভাসা' বা 'আহ্লাদে আটখানা হওয়া'—যেভাবে চিত্রিত হয়েছে, তাতে কবির বলা কথাই সত্যি হয়ে ওঠে—'যেমনধারা কথায় শুনি হুবহু তাই আঁকি।'

সুকুমার রায়ের কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আবোলতাবোল-এর কথা সর্বপ্রথমেই মনে পড়ে কারণ এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ আর একমাত্র এই বইটিই তিনি সম্পাদন করতে পেরেছেন। কিন্তু আবোলতাবোল-এর সঙ্গে খাই-খাই-এর কথাও এসে যায়, যদিও এই দুটি গ্রন্থকে সমগোত্রীয় সব সময় ভাবা যায় না। কারণ—'খাই-খাই পদ্যে লেখা হলেও আসলে একটি প্রবন্ধ বা অভিধানের ছিন্নপত্র, অথচ রঙে, রসে উজ্জ্বল ; পণ্ডিতের সঙ্গে রসিক এখানে মিলেছে। আর রসিকতায় শান দিয়ে যাচ্ছে ছন্দ-মিলের দাঁড়ি-কমা।[১০]

সবশেষে বলতে হয়, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা—কারণ তিনি একাই ছিলেন একটি যুগের স্রষ্টা। সেই রবীন্দ্রযুগে সুকুমার রায় জন্মেছেন, বড় হয়েছেন, কবিতা রচনা করেছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অলক্ষ্য যে তাঁর ওপর পড়েছে, এ তো খুবই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু ও 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যের দুটি কবিতার কিছু প্রসঙ্গ পাই সুকুমার রায়ের 'শিশুর দেহ' ও 'হরিষে বিষাদ' কবিতাতে।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের "বহুবিচিত্র ব্যক্তিত্ব", তাঁর গান, তাঁর সৃষ্টি, তাঁদের সঙ্গে পারিবারিক পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা—এই সমস্ত কিছুই সুকুমার রায়কে তাঁর রচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। সুকুমার রায় রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ ছিলেন কিন্তু "নির্বিবাদী ভক্ত" ছিলেন না। বিলেত প্রবাসের সময়, তিনি রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু কবিতার অনুবাদও করেছিলেন। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের জীবনসায়াহ্নের কিছু রচনায় সুকুমার রায় নিজের প্রচ্ছন্ন অথচ গভীর এক প্রভাবের স্বাক্ষর রেখে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের "খাপছাড়া" রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ যেন সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল-এর জগতে প্রবেশ করেছিলেন। কবি নিজেই 'খাপছাড়ার'র গোড়াতেই বলেছেন—

লেখার কথা মাথায় যদি ছোটে
তখন আমি লিখতে পারি হয়তো!
কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে,
যা-তা লেখা তেমন সহজ নয় তো।'

রবীন্দ্রনাথ নিজে উপলব্ধি করেছিলেন "ছেলেমিতে-সিদ্ধি" লাভ করা সহজ নয়, তাই যা-তা লেখায় যিনি সফলতা অর্জন করেছিলেন তাঁর সেই 'যুবক বন্ধু' সুকুমার রায় সম্বন্ধে বিস্তারিত অনেক কথা না বললেও, অল্পকথায় সুকুমার রায়ের কবিতাকৃতির সুন্দর পরিচয় আর কবির প্রতি তাঁর অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। সুকুমার রায়ের 'পাগলা দাশুর' ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— 'সুকুমারের লেখনী থেকে যে অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎসধারা বাংলাসাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে তা অতুলনীয়। তাঁর সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছল গতি, তার ভাবসমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা পদে পদে চমৎকৃতি আনে। তার স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল সেইজন্যই তিনি তার বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরেছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে ব্যঙ্গরসিকতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আরও কয়েকটি দেখা গিয়েছে, কিন্তু সুকুমারের হাস্যোচ্ছ্বাসের বিশেষত্ব তাঁর প্রতিভার যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে তার ঠিক সমশ্রেণীর রচনা দেখা যায় না।'

এইখানেই সুকুমার রায়ের অনন্যতা। আর এই সঙ্গেই স্মরণ করতে হয় সত্যজিৎ রায়ের মন্তব্য। তিনি সুকুমার রায়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলছেন—'তাঁর শেষ রচনা ছিল আবোলতাবোলের শেষ কবিতা, যার বিচিত্র মিশ্র রস বাংলা সাহিত্যে চিরকালের বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকবে। এটি রচনার সময় যে তাঁর উপর মৃত্যুর ছায়া পড়েছিল তার ইঙ্গিত এর শেষ কয়েক ছত্রে আছে—

আদিম কালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়ে এমন রসিকতা আর কোন রসস্রষ্টার পক্ষে সম্ভব হয়েছে বলে আমার জানা নেই।'

(১) প্রসঙ্গ উৎকল্পনার হাস্যরস—ডঃ শুভংকর চক্রবর্তী।

(২) (৮) (১০) প্রবন্ধ সংকলন—বুদ্ধদেব বসু

(৩) (৪) (৫) Comic and curious verse (Collected by J. M. Cohen)

(৬) আসম্ভবের ছন্দ—শঙ্খ ঘোষ, প্রস্তুতিপর্ব বিশেষ সংখ্যা সুকুমার রায়

(৭) (৮) A Dictionary of Literary Terms—Sylvan Barnet
Morton Berman
William Burto

(৯) The last priest of Nonsense —Kishore Chatterjee
(Miscellany, 25th January, 1987)



খেয়াল রসের ছবি

প্রণবরঞ্জন রায়

॥ ১ ॥

লিখতে শেখার বহু আগে থেকে মানুষ ছবি আঁকছে। পড়তে শেখার আগে থেকে ছবি দেখছে। বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ, বিবরণের বিশদ বাদ-দিয়ে তার উপর রঙিন কল্পনার রসান চড়িয়ে বর্ণনা (বিবরণ+বর্ণ=বর্ণনা), বর্ণনায় কল্পনা-ভাবনার মিশাল দিয়ে কাহিনী, আর পুরা-ঘটনা বর্ণনের কালে নীতি-কথার যোগাযোগ ঘটিয়ে পুরাণ[১] লিপিবদ্ধ করতে পারার অনেক আগে থেকে মানুষ বিম্বের সঙ্গে বিম্ব[২] যোগে, রূপকল্পের সঙ্গে রূপকল্প সাজিয়ে দৃশ্যাবর্ণনা করেছে, দৃশ্যকাহিনী নির্মাণ করেছে। মুখে মুখে ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে, দৃশ্যের বর্ণনা করতে করতে, কাহিনী বলতে গিয়ে কথাকার, বক্তা, প্রতিবেদক ছবির পরে ছবি বলেছেন। তা শুনতে শুনতে শ্রোতা মনের চোখে ছবির পর ছবি দেখেছেন। সে-সব ছবি পাথরে খোদাই করে, এঁকে ধরে রাখার চেষ্টায় সৃষ্ট হয়েছে ভারহুত, সাঁচীর রিলিফ, অজন্তার ছবির মতন সব দৃশ্যকাহিনী।

কিন্তু বিবরণ দেওয়া বর্ণনা করা, কাহিনী বলা ইত্যাদি ছবির, রিলিফ ভাস্কর্যের অন্যতম কাজ হলেও, ভাল শিল্পকর্মের একমাত্র অথবা মূল কাজ কখনও ছিল না। গুহাবাসী প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যখন বিম্বের পর বিম্ব সাজিয়ে বাইসন বা হরিণ শিকারের বর্ণনা সুচতুরভাবে দৃশ্যায়িত করেছে, তখন তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অঙ্কন কর্ম দিয়ে আসল শিকারের এক সমান্তরাল

অথচ বিকল্প ক্রিয়া করা। সে বিশ্বাস করত এই সমান্তরাল-বিকল্প ক্রিয়া তার আসল কাজের সহায়তা করবে। এই সমান্তরাল-বিকল্প ক্রিয়াটি কিন্তু গোষ্ঠীর সব মানুষ যৌথভাবে করত না। করত কয়েকজন বিশেষ অধিকারী। আর অন্য সবাই ভয়মিশ্রিত বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় সে-বিশেষ ক্রিয়া-কর্ম অবলোকন করত। শিকারের বর্ণনামূলক দৃশ্য সবাই যেমন সহজবুদ্ধিতে বুঝতে পারত, তেমনই যে-ছবি রহস্যময়ভাবে সত্যকার শিকারের সহায়ক হয়ে ওঠে—প্রাগৈতিহাসিক মানুষ তাকে সসম্ভ্রমে উঁচু বেদিতে বসিয়েছে। আগে মানুষ খেলনা বানিয়েছে। পুতুল বানানোর বিশেষ কৌশলকে অধিকারী লোকেরা ধ্যান-ধারণা ভাবনা কল্পনাকে মূর্ত করার কাজে লাগিয়ে গড়লেন মূর্তি। নির্মিত রূপকল্প পূজাবস্তুতে রূপান্তরিত হল। খেলার জিনিস সম্ভ্রমের জিনিসে পরিণত হল। দুই-ই শিল্পবস্তু, একটি সহজবোধ্য কাছের জিনিস অপরটি খানিকটা রহস্যময় সম্ভ্রমের বস্তু, দূরের জিনিস।

তবু, সম্ভ্রম-উদ্রেককর শিল্পবস্তু আর কাহিনীসম্ভব কাছের শিল্পবস্তুর বিচ্ছেদ কখনও সম্ভব হয়নি (কথাটা বোধ হয় সম্পূর্ণ ঠিক নয়। আধুনিক কালের সম্পূর্ণভাবে ধর্মসম্পর্কহীন শিল্পকর্মও অত্যন্ত দূরের, সম্ভ্রমের, বিস্ময়ের বস্তু হয়ে গিয়েছে। তবে, সে অন্য আলোচনা; এখানে অবান্তর।) কারণ, পুরাণকাহিনী পূজা বিষয় সহজভাবে কথা বলে লোককে কাছে টেনে নিয়েছে। একদিকে, সম্মানীয় পূজ্য শিল্পবস্তু যেমন ইঙ্গিতে-সংকেতে গভীরভাবে অনুভব সঞ্চার করেছে, অন্যদিকে তেমনি বর্ণনাত্মক কাহিনী কল্পনাকে উসকে দিয়ে গভীরের ব্যঞ্জনা সঞ্চার করেছে; কেবল ভিন্ন উপায়ে। তবুও, কাহিনী বর্ণনায় বিশদ বিবরণ, আর তার সঙ্গে অবান্তর বিশদ, যত বেশী জায়গা পেয়েছে, গল্প ঘটনার বিবরণ যত জাঁকিয়ে বসেছে, শিল্পবস্তু ততই তার বিস্ময় আর সম্ভ্রম জাগানোর ক্ষমতা হারিয়েছে। আবার উল্টো দিকে, বর্ণনাত্মক কাহিনী যতই অবান্তর বিশদের বিবরণ বাদ দিয়েছে, যতই তাতে চিহ্ন, সংকেত, ইঙ্গিতের ব্যবহার বেড়েছে, যতই তাতে ভাবনা-কল্পনার রসান চড়েছে, ততই শিল্পবস্তু বিস্ময়ের হয়ে উঠেছে, সম্ভ্রমের দাবীদার হয়েছে। দৃশ্যশিল্পে এই দুই বিপরীত-মুখী প্রবণতা চিরকালের।

আজকাল 'ছবি' আর 'ইলাস্ট্রেশন'-এর যে পার্থক্য করা হয়, তা হালফিলের ব্যাপার। তফাত যেটা আগেও ছিল আর এখনও আছে সেটা মূলগত নয়, গুণগত মাত্র। ছবি যেখানে একান্তভাবে লিখিত শব্দের উপর নির্ভরশীল তা' ইলাস্ট্রেশন হলেও নিকৃষ্ট ইলাস্ট্রেশন। সেখানে লিখিত শব্দের সাহায্য ছাড়া ছবির মর্মোদ্ধার করা যায় না। নীচু মানের অন্য ধরনের ইলাস্ট্রেশন আছে যেখানে ছবি বিম্বের ক্রম সাজিয়ে শুধু ঘটনার বিবরণ দেয় মাত্র, তার বেশী কিছু করে না। উৎকৃষ্ট বর্ণনাত্মক ছবি কিন্তু শুধুমাত্র ঘটনার বিবরণ দেয় না। অনুভব সঞ্চার করে। ইঙ্গিতে সংকেতে কল্পনাকে উসকে দেয়। ভাবায়, চিন্তার

খোরাক জোগায়। উৎকৃষ্ট বর্ণনাত্মক ছবি, লিখিত বা মৌখিক কাহিনীর সাহায্য ছাড়াই কাহিনী বর্ণনা করতে পারে। পারে লিখিত শব্দে বা মুখের বর্ণনায় নতুন অনুভবের মাত্রা যোগ করতে। পারে সম্ভ্রম আদায় করে নিতে। অর্থাৎ ছবির ছবি হয়ে উঠতে গেলেই তার বর্ণনাত্মক সত্তাকে বাদ দিতে হবে এমন কোন কথা নেই।

আদিম-প্রাচীন মৌখিক কাহিনী, আখ্যান, উপাখ্যান, পুরাণভিত্তিক দৃশ্য-কাহিনী বা ধর্মসম্বন্ধীয় লিখিত বা মৌখিক পুরাণনির্ভর সব দৃশ্যকাহিনীই দেয়াল বা গুহার গায়ে আঁকা হত অথবা রিলিফ হিসাবে উৎকীর্ণ হত। সাঁচী, ভারহুতের রিলিফ, অজন্তার ভিত্তিচিত্র এ-সবই বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত। কিন্তু এসব স্বনির্ভর দৃশ্যকাহিনী শুধুমাত্র পুরাঘটনার বিবরণ দেয় না। শুধু পুজ্য বিষয়ের কথা বলে না। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বর্ণনার ফাঁকে ইঙ্গিতে-সংকেতে অনুভব সঞ্চার করে। দৃশ্যশিল্পের দুই বিপরীতমুখী প্রবণতা এসে এক জায়গায় মিলে যায়।

ছাপা শুরু হবার আগে পর্যন্ত পুঁথি আর পুস্তক তৈরী হত শুধু পাঠক্ষম বিত্তশালী ও পদমর্যাদাসম্পন্ন পাঠকের আদেশে, মুষ্টিমেয় পাঠকের জন্য। এসব পুঁথি-পুস্তক তৈরীর আদিকাল থেকেই সেগুলি নকশাদ্বারা অলংকৃত এবং/অথবা বিম্ব সমাহারে রচিত চিত্রশোভিত হতে দেখা যায়[১]। শুধু নকশা দিয়ে অলংকৃত পুঁথি বা পুস্তক অবশ্য সংখ্যায় ততো বেশী কখনই হত না যত হত নকশা এবং বিম্বদ্বারা অলংকৃত ইলিউমিনেটেড ম্যানুস্ক্রিপ্ট। ইলাস্ট্রেটেড ম্যানুস্ক্রিপ্ট বা বিম্বসমাহারে রচিত চিত্রিত পুঁথি ও পুস্তক আবার দু'ধরনের হত। অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা-র মতন পালযুগের পুঁথি বা গুজরাতের জৈন কল্পসূত্র-র মতন দর্শন বিষয়ক প্রাচীন পুঁথিতে বিম্বসহকারে রচিত যে-সব ছবি দেখা যায় তা দূরতম অর্থে মাত্র পুঁথিতে লিখিত বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। ছবি স্বাধীন ও স্বনির্ভর। কল্পসূত্রের ছবির যদিও বা খানিকটা বর্ণনাত্মক ভঙ্গি থেকে থাকে, অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা-তে তো তা'ও না। সেখানে বিম্ব তো ধ্যানের, ধারণার মূর্তরূপ। ম্যানুস্ক্রিপ্টের ইলাস্ট্রেশন এখানে বিস্ময় ও সম্ভ্রম উদ্রেককর পুজ্য-বস্তু। অন্যদিকে, তুর্কো-আফগান সুলতানী আমলের জৌনপুরের শিল্পীরা যখন চৌরপঞ্চাশিকার মতন অশাস্ত্রীয় গ্রন্থ সচিত্রণ করেছেন, তখন ছবি লিখিত বর্ণনাকে অনুসরণ করলেও লেখা বর্ণনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে এবং লিখিত বর্ণনার সাহায্য ছাড়াও কাহিনীর খানিকটা স্বাদ দিতে পেরেছে ও স্বনির্ভর ছবি হিসাবে উপভোগ্য হয়েছে। মধ্য যুগের পারসীকরা আর মুঘল আমলের ভারতীয় চিত্রকররা গ্রন্থচিত্রণকে এমন একটা স্বয়ংসম্পূর্ণতা দিলেন যে দৃশ্যায়িত কাহিনী বা বর্ণনা অনুধাবন করার জন্য লিখিত কাহিনীর সাহায্য নেবার কোন প্রয়োজনই রইল না। এক একটি ছবি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বর্ণনাত্মক উপাখ্যান হয়ে উঠলো। শুধু ছবির পর ছবি সাজিয়ে, উপাখ্যানের পর উপাখ্যান জুড়ে এক

একটি আখ্যানমূলক দৃশ্যকাহিনীর গ্রন্থ গ্রথিত হল। নিরক্ষর আকবরের দেখার জন্য রচিত চিত্রমহাভারতের নামই যে শুধু পরিবর্তিত হয়ে রজমনামা হল তা নয়, মহাভারতের ধর্মীয় অনুষঙ্গ সেখানে গৌণ হয়ে গিয়ে, তার বিপুলবিচিত্র কাহিনী-সম্ভার নতুন এক লৌকিক গরিমা লাভ করল। মুঘল ইহলৌকিকতার প্রভাবে রাজপুত রাজাদের নির্দেশে চিত্রিত গীতগোবিন্দম্-এর ছবিতে অলৌকিক সম্ভ্রম-উদ্রেককর ভক্তিভাবের উপর লৌকিক প্রেম, কাম, কাব্যরস প্রাধান্য পেল, কাহিনী বর্ণনা তো রইলই।

পারসীক শাহ্‌নামা, সুলতানী আমলের চৌরপঞ্চাশিকা, মুঘল দরবারে আঁকা হামজানামা, আনওয়ার-এ-সুহাইলি, মেবার অথবা কাংড়া রাজন্যদের জন্য সৃষ্ট গীতগোবিন্দম্ ইত্যাদি সচিত্রিত পুঁথির ছবির রসগ্রহণের জন্য এসব কাব্য-কাহিনীর প্রাক্‌পরিচয় একান্ত আবশ্যক নয়, তার কারণ চিত্রিত দৃশ্যকাহিনী চিত্রগুণসমৃদ্ধ হবার কারণে অন্য নিরপেক্ষ ও স্বনির্ভর।

যে-পুঁথি-পুস্তক-গ্রন্থ-কিতাব ছিল মুষ্টিমেয়র জন্য, ছাপাই এসে সেসবকেই সর্বসাধারণ লভ্য করে তুললো। কি চীন দেশ, কিবা কোরিয়া কিংবা জাপান, অর্থাৎ যে-সব দেশে ছাপার উদ্ভাবন ও প্রচলন আগে হয়, এবং মহাদেশীয় ইউরোপে, লিপি ছাপাই শুরু হবার আগেই ছবি ছাপাই আরম্ভ হয়। ছবি-বাহিত বক্তব্য যাতে অধিকাংশ নিরক্ষরসহ বহুলোকের কাছে পৌঁছয় তার জন্য কাঠখোদাই করে ছবি ছাপা শুরু হল। লিপি ছাপা আরম্ভ হবার আগে ছবি ছাপার প্রচলন হবার ফলে, ইয়োরোপে অন্তত, লেখার সঙ্গে ছবি আর লেখা অনুসারী ছবি ছাপাইয়ের আগেই স্বনির্ভর পাতাজোড়া ছবি ছাপাই আরম্ভ হয় এবং পরবর্তী সময়ে লেখা অনুসারী ছবি ছাপাইয়ের পাশাপাশি স্বনির্ভর ছাপাই ছবি রচনা চলতে থাকে।

রিলিফ পদ্ধতিতে খোদাই করা কাঠের ব্লক থেকে ছবি ছাপার রীতি তো থাকলই। ধাতুপাতের উপর তক্ষণ করে, ধাতুপাতকে অ্যাসিডে খাইয়ে ইনতাল্লিও পদ্ধতিতে ছাপ নেবার পদ্ধতি আবিষ্কার হবার পর লিপি-সহায়তাবিহীন পাতাজোড়া স্বনির্ভর ছাপাই ছবি ক্রমশ হাতে আঁকা ছবির সমান মর্যাদা লাভ করে এবং ধীরে ধীরে সম্মানিত শিল্পে পরিণত হয়। তথাপি বহুজনের জন্য রচিত হবার কারণে হাতে-তৈরী মাত্রিকা থেকে হাতে-নেওয়া ছাপাই ছবি মূলত বর্ণনাধর্মী ও কাহিনীধর্মী হয়েই থেকে যায় (অবশ্য উডকাট, উড এনগ্রেভিং, মেটাল এনগ্রেভিং, এচিং ইত্যাদি মাধ্যমে সব দেশেই, বহু দেব-দেবী অন্যান্য পূজ্য বিষয়ের ছবি তৈরী করা হয়েছে। তবে লোকে সেগুলিকে ছবি হিসাবে না-দেখে পূজ্য বস্তু হিসাবেই গ্রহণ করেছেন।)

ফোটগ্রাফিক-যান্ত্রিক ছাপাই পদ্ধতি এসে, পুরনো অযান্ত্রিক ছাপাই পদ্ধতিগুলি বাতিল করলে পরে, হাতে-ছাপা ছবির চরিত্র বদলে যায়; হাতে আঁকা আর হাতে ছাপা ছবির বিষয়গত ও প্রকাশ-ভঙ্গিগত পার্থক্য আর বিশেষ

কিছুই থাকে না। তবে, সে অনেক পরের কথা এবং আমাদের বিবেচ্য বিষয়ও নয়।

নবম শতকের চীনা, দশম শতকের কোরিয়ান, একাদশ শতকের জাপানী, পঞ্চদশ শতকের ইয়োরোপীয় আর উনবিংশ শতকের বাঙালী ছাপাই ছবির শিল্পীরা একটা সহজ সত্য ছাপাইয়ের সেই আদি কালেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন ছাপাই-ছবিকে ভাল করতে গেলে ছবিটিকে ছাপার উপযোগী করে ভাবতে হবে, মাধ্যমের স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী তৈরী করতে হবে। হাতে আঁকা ছবি করার ভাবনা, তৈরীর করণ-কৌশল সেখানে অচল! তা'ছাড়া, যে বহুজনের মুখ চেয়ে ছবি ছাপাই প্রচলিত হয়েছিলো, সেই ইতরজন যাতে ছবির স্বাদগ্রহণ থেকে বঞ্চিত না হন, তার জন্য ছবিকে সহজগ্রাহ্য করার দায় স্বেচ্ছায় ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন ড্যুয়েরের, লুকাচ ক্রানাক, রেমব্রাণ্ডট-এর মতন দিকপাল শিল্পীরা। বর্ণনাধর্ম, আখ্যানধর্ম, কাহিনীধর্মের মধ্যেই তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন সহজগ্রাহ্যতার চাবিকাঠি।

যতদিন কেবল রিলিফ আর ইনতাল্লিও পদ্ধতিতে হাতে ছাপা ছবি তৈরী হত, ততদিন ছাপাই ছবির শিল্পীরা তাঁদের ছবি-পরিকল্পনায় মাধ্যমের গুণাগুণ সম্ভাবনা-সীমাবদ্ধতাকে অগ্রাধিকার দিতেন। ১৭৯৮ সালে লিথোগ্রাফির উদ্ভাবন এবং উনবিংশ শতকের প্রথম তিন দশকের মধ্যে তার সুপ্রতুল প্রচলন, অবস্থাটাকে বদলে দিলো।

লিথোগ্রাফি করে যেহেতু যে-কোন মাধ্যমে আঁকা ছবিকে সহজেই ছাপা যায়, মুদ্রকরা সেহেতু ছাপাইয়ের এই নবতম মাধ্যমটিকে অন্য মাধ্যমে আঁকা ছবির কপি করার কাজে লাগালেন। ফলে এ-মাধ্যমের নিজস্ব চরিত্রানুযায়ী ছবি তৈরী হল বড় কম। অবশ্য, ওঁরে দ্যুমিয়ের মতন শিল্পীও ছিলেন, যাঁরা অত সহজে ব্যাপারটা ছেড়ে দিলেন না। গগনেন্দ্রনাথও এই মাধ্যমের শারীরিক চরিত্র ও সাধারণগম্যতা সম্বন্ধে এতটাই ওয়াকিবহাল ছিলেন যে, তিনি তাঁর ব্যঙ্গচিত্রের প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন লিথোগ্রাফকে।

উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই যান্ত্রিক-ফোটগ্রাফিক পদ্ধতিতে ছবি, নকশা ছাপার চেষ্টা শুরু হয়ে যায়। কি করে যে-কোন মাধ্যমে আঁকা ছবি ছাপা যেতে পারে; কিভাবে মূল ছবির আলো-ছায়ার তারতম্য, ম্যাসের ঘনত্ব ও তলবিভাজনকে ছাপা ছবিতে টোনের দ্বারা প্রকাশ করা যায় অর্থাৎ কি কৌশলে টোনের তফাতকে ছাপে ধরা যায়; কি করে যে-কোন মাপের ছোট কিংবা বড় নকশা কিংবা ছবিকে ছাপার প্রয়োজনে বড় কিংবা ছোট করে নেওয়া যায়; আর কিভাবে ছাপা ব্যাপারটাকে মাধ্যম নিরপেক্ষ করে তোলা যায়—এসব নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হল গত শতকের শেষ পাদেই। পশ্চিম ইয়োরোপ আর মার্কিন দেশের বাইরে আর একটি মাত্র দেশে এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা কথঞ্চিৎ অনুরণন সৃষ্টি করেছিল। না, দেশ বললে ভুল হবে, কারণ অনুরণন তুলেছিল একটি বিশাল দেশের একটি মানুষের চেতনায়।

আমাদের পরম সৌভাগ্য, ছবি ও নকশা ইত্যাদি ছাপার ফোটগ্রাফিক-যান্ত্রিক পদ্ধতি-প্রকরণ উদ্ভাবন প্রচেষ্টায় একজন শ্রুতকীর্তি বাঙালীর নাম জড়িত। উনবিংশ শতকের কলকাতার ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বাঙালীরা যে কিছু কিছু মঙ্গলকর উদ্ভাবনী কাজকর্ম করার চেষ্টা করছিলেন, ছবি ছাপাই নিয়ে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর গবেষণাদি তার আরেকটি নিদর্শন। টোনের তারতম্যকে কি করে ছোট বড় ফুটকি আর ফুটকির সঙ্গে ফুটকির দূরত্ব ইতরবিশেষ করে ছাপাই ছবিতে ধরা যায় উপেন্দ্রকিশোর তাই হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখিয়ে বিলেতের পেনরোজ অ্যানুয়ালে তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেন। তবে নিছক গবেষণাই তাঁর লক্ষ্য ছিল না। শিশু ও কিশোরদের শিক্ষাপদ্ধতিকে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করে তোলায় ছবির ভূমিকা যে কি অপরিমেয় চিত্রকর উপেন্দ্রকিশোর সে সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। শিক্ষা প্রসারে ছাপা বইয়ের ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ তা ইউ রায় এন্ড সন্স নামে প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রকিশোর যত ভাল জানতেন তা তাঁর সমসাময়িক খুব কম লোকই জানতেন। শিক্ষাবিদ, শিশুসাহিত্যিক, শিল্পী, মুদ্রাকর উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ছবি-ছাপাই নিয়ে গবেষণাদির মূল উদ্দেশ্য ছিল—সুলিখিত, সুমুদ্রিত, সচিত্র আকর্ষণীয় বইয়ের সাহায্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো। আর সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯১৩ সালে তিনি ছোটদের জন্য সন্দেশ পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। পরিকল্পনায় এবং চরিত্রে যে-কোন ভারতীয় ভাষায় অভূতপূর্ব এই সন্দেশ। শিশুসাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী ও হাস্যরসশিল্পী হিসাবে সুকুমার রায়-এর সাধারণ্যে প্রকাশ এই সন্দেশ-এর পৃষ্ঠায়, পত্রিকার জন্ম বছরেই।

॥ ২ ॥

বালক সুকুমার ছেলেবেলায় পিতা উপেন্দ্রকিশোরকে নিশ্চয় ছবি আঁকতে দেখে থাকবেন। পরিবারের অন্যান্যদের মধ্যেও ছবি আঁকার চল ছিল। কিন্তু সুকুমার রায় ছেলেবেলায় নিজে ছবি নকশো করতেন কিনা জানা যায় না। অন্যদিকে, কিশোর বয়স থেকেই সুকুমার যে বিম্ব সৃষ্টিতে যন্ত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে আগ্রহী তার সাক্ষ্য মেলে খুড়তুতো বোন লীলা মজুমদারের স্মৃতিচারণে। পিসেমশাই 'কুন্তলীন'-খ্যাত-এচ সি বোসের দেখাদেখি সুকুমার ছোটবেলা থেকেই রীতিমত ফটোগ্রাফি চর্চা শুরু করেন। ছাপাখানা দোরগোড়ায় থাকায় ছাপার ক্রিয়াকৌশল তো সুকুমারের যৌবনের আগেই জানা হয়ে গিয়েছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করার পর রসায়নে আর পদার্থবিদ্যায় ডাবল অনার্স নিয়ে বি এস-সি পড়লেন প্রেসিডেন্সি কলেজে ; কলাবিদ্যা শিক্ষার দিকেই গেলেন না। ১৯০৬ সালে বি এস-সি অনার্স পাস করার ছ' বছর পরে বিলেত গেলেন, জলপানি নিয়েই। কিন্তু না, তত্ত্বগত বিজ্ঞান পড়তে নয়, এমন কি ফলিত রসায়ন বা ফলিত পদার্থবিদ্যা পড়তেও নয়। প্রথমে লন্ডন স্কুল অফ ফোটো এনগ্রেভিং অ্যান্ড লিথোগ্রাফি ও পরে ম্যানচেস্টার স্কুল অফ টেকনোলজিতে প্রিন্টিং টেকনোলজি শিখলেন। ১৯১৩ সালে রয়েল

ফোটগ্রাফিক সোসাইটির ফেলোশিপ নিয়ে দেশে ফিরলেন।[৫] অথচ, বিলেত যাবার আগে থেকেই যে তিনি ছবি আঁকতেন তার সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়ে গেছে ননসেন্স ক্লাবের নিমন্ত্রণ পত্রাদিতে আর ক্লাবের পত্রিকা সাড়ে বত্রিশ ভাজায় (পরিবারের সমবয়স্ক আর সমসাময়িক কলকাতার সমমনস্কদের নিয়ে তাতাবাবু—সুকুমার রায় কলেজ ছাড়ার অল্পকালের মধ্যেই এই ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।) স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, ছবি আঁকা শেখা, তার নিয়মিত চর্চার চেয়ে ছবি ছাপার যান্ত্রিক কলাকৌশল আয়ত্ত করা, ক্যামেরা যন্ত্র দিয়ে ছবি তৈরী করা ইত্যাদিকে সামাজিক ও বৈষয়িক দিক থেকে অধিকতর প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলেন সুকুমার রায়।

ছবি ব্যাপারটাকে সাহিত্যকর্মের মতন গুরুত্ব না দিলেও, রীতিমত চর্চা ছাড়াই ছবি তিনি এঁকেছিলেন, ছবি তাঁকে আঁকতে হয়েছিল। রীতিমত শিক্ষা আর চর্চা থাকলে যে দুর্বলতাগুলি থাকত না, সেগুলি তাঁর ছবিতে তো চোখে পড়ে। সুকুমার রায়ের অধিকাংশ ছবিই ড্রইং অথবা স্কেচ। ও'র টানা রেখা খুব সাবলীল না হওয়ায় অনেক সময় ড্রইং দুর্বল বলে মনে হয়। স্বশিক্ষিত হলেও উপেন্দ্র-কিশোরের ড্রইং অনেক প্রত্যয়ী। কিন্তু প্রেরণা, ধারণার স্বচ্ছতা আর উদ্ভাবন শক্তি থাকলে করণকৌশলের ঘাটতি পুষিয়ে গিয়ে প্রাপ্তি অনেক বেশী হতে পারে সুকুমার রায়ের ছবি তার প্রমাণ। ১৯০৬-০৭-এর ননসেন্স ক্লাবের সময় থেকে শুরু করে ১৯২৩-এ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সুকুমার রায় ছবি এঁকেছেন। কিন্তু ছবির জন্য ছবি কখনও আঁকেননি। লেখার সঙ্গে যাবার জন্য, লিখিত বক্তব্যের চাক্ষুষ রূপ দেবার জন্য, লিখিত বক্তব্যকে সাহায্য করার জন্য আর লিপিকে একটু নকশার সাজে সাজাবার জনাই ছবি এঁকেছেন। অর্থাৎ সাদামাটা ভাষায় যাকে বলে ইলাস্ট্রেশন —জ্ঞানত উনি তাই করতে চেয়েছেন। সেটাই স্বভাবিক। বিম্ব সৃষ্টিতে যন্ত্রের ভূমিকা হাতে-নাতে পরীক্ষা করে দেখতে আগ্রহী, সচিত্র সালংকারা ছাপা সম্বন্ধে উৎসাহী, জনশিক্ষা ও বিশেষ করে কিশোর শিক্ষা প্রসার এবং রুচি গঠনে আগ্রহী সাহিত্যিক যে ছবি আঁকা কাজটাকে ছাপার মাধ্যমে সাহিত্য রুচি প্রসারের সহযোগী কাজ হিসাবে দেখবেন—এ তো স্বাভাবিক। এঁকে তিনি এমন কিছু সৃষ্টি করতে চাননি যা দর্শক ভয়মিশ্রিত বিস্ময়ে দেখে বস্তুটিকে শ্রদ্ধার আসনে বসাবে। ছাপার জন্য সুকুমার ছবি এঁকেছেন। যা প্রচুর লোকের হাতে যাবে। যা প্রচুর লোক কাছে নিয়ে দেখবে, সহজে বুঝবে। যার থেকে লোক সহজ আনন্দ পাবে।

কিন্তু সুকুমার রায় কি নিছক ইলাস্ট্রেটর? তাঁর ছবির রস কি একান্তভাবে ভিত্তি-লেখার উপর নির্ভরশীল? লিখিত টেক্সট-এর সাহায্য ছাড়া তাঁর ছবির রস গ্রহণ সম্ভব নয়? তথ্যের বিবরণ বা ঘটনার বিবরণ দাখিল করার পরই কি ছবি তার আকর্ষণীয়তা হারায়? না, ছবি নিজগুণে লেখায় নতুন মাত্রা সংযোজন করে? লিখিত টেক্সটের সাহায্য ছাড়াই অনেকটা রসসঞ্চার করে? নিজগুণে আকর্ষণ করে? ছবি যদি লিখিত টেক্সটের সাহায্য ছাড়া কোন কাহিনী বর্ণনার ভঙ্গি করে—তবে সে ছবি বর্ণনাত্মক বা ন্যারেটিভ। গল্পের ভানটা যদি আরও একটু সরব হয় তবে

ইলাস্ট্রেটিভ মাত্র, কিন্তু ইলাস্ট্রেশন নয়। আসল প্রশ্নটা হল—ছবি তার রসের জন্য কতটা পরিমানে স্বশরীর-নির্ভর। অন্যনির্ভরতা বেড়ে গেলে ছবি ক্রমশ ছবিত্ব হারায়।

সুকুমার রায়ের ছবির গুণ বিশ্লেষণে তাঁর রসের কারবারের পরিচয়টা আগে নেওয়া দরকার।

॥ ৩ ॥

১৯০৬ থেকে '০৮-এর মধ্যে সমবয়স্ক আত্মীয়স্বজন ও সমমনস্ক বন্ধুদের নিয়ে সুকুমার রায় 'ননসেন্স ক্লাব' নামে একটি আসর গড়ে তোলেন। সারা উনিশ শতক ধরে শিক্ষিত শহুরে বাঙালী ভদ্রলোক 'এসোসিয়েশন' আর 'সোসাইটি' পত্তন করে তা-বড় তা-বড় বিষয় নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা করেছে আর সমাজের হিত-সাধন করার চিন্তায় বিনিদ্ররজনী কাটিয়েছে। এসবে ভাল কিছু হয়নি যে তা নয়। তবে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য রসকষহীন বাড়াবাড়িও কিছু কম হয়নি। নামকরণেই মালুম, সুকুমারবাবুর উদ্দেশ্য ছিল এমন এক আড্ডা, যার সদস্যরা গোমড়া মুখ করে শক্ত বিষয়ে চিন্তা করে ঘুম নষ্ট করবেন না আর সমাজের হিতসাধন করার নামে নিজেদের সূক্ষ্ম অনুভূতি সব ভোঁতা করে ফেলবেন না। তবে, তার মানে এ নয় যে, আত্মনিশ্চিত হয়ে পরনিন্দা পরচর্চা থেকে আমোদ লাভের গ্রাম্য চণ্ডী মণ্ডপী কায়দাটাকে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন। আসলে তিনি বুদ্ধিচর্চার সঙ্গে সুকুমারবৃত্তিচর্চার ভেদ মানতে চাননি। বলতে চেয়েছিলেন, রস সৃষ্টিই যদি সুকুমারবৃত্তির লক্ষ্য হয় তবে হাস্য-রসের মতন স্বাস্থ্যকর রসসৃষ্টি কেন তার অভীষ্ট হবে না। আসরের পত্রিকা সাড়ে বত্রিশ ভাজা-র প্রতিটি রচনা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত যে, হাস্যরসের উৎস, উপাদান, উপকরণ আমাদের পরিচিত পরি-পার্শ্বে ছড়িয়ে আছে, দেখবার চোখ থাকলেই তা দেখা যায়, শোনার কান থাকলে শোনা যায়, একটু খালি দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন প্রয়োজন, একটু উৎকর্ণ হওয়া দরকার। আসরের আয়োজিত উৎসবে যাতে সব সদস্যই সপরিবারে অংশ গ্রহণ করে আনন্দ পেতে পারেন সেজন্য সুকুমার রায় লিখলেন লক্ষ্মণের শক্তিশেল আর ঝালাপালা-র মতন সর্বজন উপভোগ্য দুটি নাটক। আসরকে কেন্দ্র করে সাহি-ত্যিকসুকুমার রায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটলো। যে হাস্যরসিক সুকুমার রায়কে পেলাম তিনি কালীপ্রসন্ন, ভবানীচরণ বা দীনবন্ধুর উত্তরসূরী নন। তিনি মধুসূদন দত্তেরও উত্তরাধিকারী নন। হয়তো-বা বঙ্কিমচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বসূরী। কিন্তু তিনি বিশিষ্ট। ইন্দ্রজিতের শক্তিশেলে লক্ষ্মণের আপাত মৃত্যু, বীর হনুমানের, বিশল্যকরণী আনয়ন ও লক্ষ্মণের পুনঃপ্রাণলাভ—রামায়ণের এই উপাখ্যানের একটি চিরপরিচিত রূপে আমরা অভ্যস্ত। প্রত্যাশিত ঘটনাক্রমের বিবরণের মধ্য দিয়ে আমরা করুণ রসে সিঞ্চিত হই, হতাশায় বিষাদে নিমগ্ন হই, বীররসে উদ্দীপ্ত হই এবং শেষে আনন্দে উদ্বেলিত হই। রাম, লক্ষ্মণ, হনুমানের

প্রতি সম্ভ্রমে মাথা নত করি। লক্ষ্মণের শক্তিশেল নাটকে সুকুমার রায় মূল ঘটনাক্রম একই রাখলেন। কিন্তু পাত্র-পাত্রীরা তাদের চিরাভ্যস্ত প্রত্যাশিত আচার, আচরণ, ব্যবহারের বদলে এমন অসংস্কৃত প্রাকৃতজনোচিত কাজ-কর্ম শুরু করে দিল যা আমাদের চিরাভ্যস্ত চেতনায় আঘাত দিল। তাদের অপ্রত্যাশিত কাণ্ডকারখানা আমাদের অসংগতিপূর্ণ মনে হল। কিন্তু সে-আঘাতের পরিমাণ ও মাত্রা এমন হল না যে তা আমাদের গুরুতর দুঃখ ভয় সৃষ্টি করতে পারে বা আমাদের স্বার্থবোধকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। ফলে, এহেন নিয়মবিরুদ্ধ অসংগতিতে আমরা কৌতুক অনুভব করলাম। আর, অসংগতিপূর্ণ ঘটনার অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতায় হাস্যোদ্ভাসিত হলাম।[৬]

ঝালাপালা নাটকের মূল বিষয় অপারঙ্গমের অনধিকার চর্চা। অনধিকার চর্চা দিয়ে লোক ঠকানোর চেষ্টা। শুধু এটুকু হলে কি হত? আমরা সেই অনধিকারীর উপর চটে যেতাম। বলতাম, একি অন্যায়, আমাদের মতন নিপাট সৎ মানুষের ক্ষতি করা হচ্ছে! কিন্তু ঝালাপালার অনধিকারীরা এতটাই অপটু আর বোকা যে তাদের দ্বারা কাউকে ঠকানো হয়ে ওঠে না। তাদের প্রাণান্তকর অপারঙ্গম প্রচেষ্টা আমাদের কাছে বোকামি বলে মনে হয়। তারা যে নিজেদের বোকামিটা ধরতে পারছে না দেখে মজা পাই। এই ঠগবাজ বদমাইশদের চেয়ে আমরা ভাল, এই বোকাদের চেয়ে আমরা বুদ্ধিমান ভেবে খানিকটা আত্মতৃপ্তি স্ফীতও হই। কৌতুকে যে হাসি, সে শুধু প্রত্যাশিত স্বাভাবিক ঘটনাপরম্পরার অনতিক্ষতিকারক ছন্দোভঙ্গ দেখেই নয়। অন্যের তুলনায় আমরা উচ্চতর এমন একটা সুখানুভূতি সংগোপনে আমাদের অহংকে তৃপ্ত করে বলেও আমরা খুশির হাসি হাসি।[৭] শুধু পরিহাস, শুধু কৌতুককে সুকুমার রায় ছাড়িয়ে যান বলেই তিনি অনন্য। ঝালাপালার বোকা ঠগবাজরা কোথায় যেন তাদের লোকঠকানো কাজের উদ্দেশ্য ভুলে কাজে আত্মনিমগ্ন। কাজের ফল যে হাস্যকর হচ্ছে, কিসসু হচ্ছে না, সেসব ভুলে করুণভাবে কাজের চর্চা করে যাচ্ছে। সুকুমার রায়ের কল্পনা যেখানে সেই কারুণ্যকে ছুঁয়ে যায়, সেখানে তাঁর কৌতুকবোধ এক নতুন মাত্রা পায়।[৮]

লক্ষ্মণের শক্তিশেল ও ঝালাপালা থেকেই সুকুমার রায়ের নিয়মহারা, হিসাবহীন, অসংগতিপূর্ণের কৌতুকাবহতা নিয়ে চর্চা শুরু। এই অসংগতি অনতিক্ষতিকারক ও কথঞ্চিৎ নির্দোষ বলেই কৌতুককর। নিয়মহারা হিসাবহীন ঘটনার ঘটকদের কার্যক্রম হাস্যোদ্রেককর হলেও কেন জানি অনতিকরুণ। কেন যেন মনে হয়, যা পরিচিত, যা নিয়মিত, যা সংগত, যা হিসাবমাফিক তাই যেন মেকী। ননসেন্স ক্লাবের জন্য রচিত এ দুটি নাটকের মধ্যেই সুকুমার রায়ের ভবিষ্যৎ জীবনের সব লেখা, সব ছবির সম্ভবনা যেন বীজের মতন লুকিয়ে ছিল। কেবল যা পাওয়া যায় না তা কিম্ভূতের ধারণা।

ননসেন্স ক্লাবের আমন্ত্রণ পত্র, নিমন্ত্রণ লিপির জন্য আঁকা ছবিতেই ইলাস্ট্রেটর হিসাবে সুকুমার রায়ের প্রথম আত্মপ্রকাশ। সেসব ছবিতে পাত্র-পাত্রী বেঢপ জামা-

কাপড় পরে, দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে অতিপ্রকট অঙ্গভঙ্গি করে, নাটুকেপনা করে। কিন্তু তারা এতটা অসচেতনভাবে, আত্মবিস্মৃত হয়ে অতিনাটুকে ভাবভঙ্গি করে যে, নিজেরাই বোঝে না যে তারা কি করছে আর কি তার ফল হচ্ছে! পরবর্তী কালের ছবিতে তো এরই একটা সংহত, ঘন রূপ দেখতে পাই। সুকুমার রায় বিলেত চলে যাওয়ায় ননসেন্স ক্লাবও বন্ধ হয়ে যায়। বহুকাল পরে তা আবার মাণ্ডে ক্লাব বা মণ্ডা ক্লাব নামে পুনরুজ্জীবিত হয়। ততদিনে সুকুমার-প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত।

সুকুমার রায়ের বিদেশ-প্রবাসের সময়েই উপেন্দ্রকিশোর সন্দেশ প্রকাশ করতে শুরু করেন। সন্দেশ-এর প্রথম বছরের চতুর্থ সংখ্যাতে (শ্রাবণ, ১৩২০) সুকুমার রায়ের একটি ছবি ছাপা হয়। 'ভবম্ হাজাম'। পাগড়ি সরিয়ে রাজার চুল কাটতে গিয়ে, রাজার মাথায় শিং দেখে হতভম্ব। এক হাতে কাঁচি রইল ধরা, অন্য হাত থেকে চিরুনি গেল খসে। মধ্যযুগ থেকেই ইয়োরোপে পুতুল-নাচ হাসি-মস্করার একটা প্রধান মাধ্যম ছিল। রিবল্‌ড্রির জন্য যে-সব পুতুল বানানো হত, তাদের চেহারাও করা হতো হাস্যোদ্রেককর। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাপের সমতা-হীনতাকে প্রকট করার জন্য গায়ের রঙের উজ্জ্বলতা অনুজ্জ্বলতা, স্ফীতি, ক্ষীণতা ইত্যাদিকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হত। জামা কাপড় হত বেঢপ। অঙ্গভঙ্গির অতিরঞ্জন তো থাকতই। শুধু 'ভবম হাজাম' নয়, সন্দেশের দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যার 'গুলিখোর' অষ্টম সংখ্যার 'ভাঙ্গা ধনুকের জ্যা ধরে/খোকা কাঁদল ভ্যাঁ করে' ইত্যাদি আরও অনেক ছবি যে ইয়োরোপের রিবলড পাপেট প্লে-র চরিত্রায়ণ-অনু-প্রাণিত তার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। মানুষ, পশু, পাখি বিস্বায়নে রিবল্‌ড্ পাপেট প্লে-র পুতুলের যে-আদল সন্দেশ-এর জন্য আঁকা প্রথম দিককার ছবিতে দেখা যায়, পরে তা' অনেকটা আত্মস্থ, রূপান্তরিত হয়ে গেলেও একটা রেশ শেষ পর্যন্ত থেকে যায়। আবোল তাবোল-এর 'হেড আফিসের বড়বাবু', 'চোর ধরা বুড়ো' 'ইঁটের পাঁজার উপর বসা রাজা', 'ডানপিটে ছেলে', 'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম', 'আহ্লাদী', 'ফসকে গেল' ইত্যাদির চরিত্র রূপায়ণ রীতি থেকে বোঝা যায় যে ইয়োরোপীয় পাপেট প্লে তাঁকে কতটা প্রভাবিত করেছিল। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। একটু মজাদার নাটকীয় ঘটনা বর্ণনের জন্য পাপেট প্লে-র ধরন থেকে ধার করার নজির আগেও আছে। পিটার ব্রুয়েঘেলের মতন অসাধারণ চিত্রকরও প্রভাবিত হয়েছিলেন। সুকু-মার রায়ের প্রায় সব ছবিতেই ঘটনা বর্ণনার যে অতিনাটকীয় ধরন দেখা যায় তার উৎস বোধ হয় ঐ রিবল্‌ড্ পাপেট প্লে।

পরিহাস আর কৌতুকের প্রতি সুকুমার রায়ের আকর্ষণ কোন দিনও কমেনি। তবে সন্দেশ-এর দ্বিতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ ১৩২১) প্রকাশিত 'খিচুড়ি' কবিতা (পরে আবোল তাবোলে অন্তর্ভুক্ত) ও সেই কবিতা সচিত্রণের জন্য অঙ্কিত হাঁসজারু, বকচ্ছপ, গিরগিটিয়া, বিছাগল, জিরাফড়িং, মোরগরু, হাতিমি, সিংহরিণ ইত্যাদি চরিত্রচিত্রণের মধ্য দিয়ে সুকুমার রায়ের কিম্ভূত ও উদ্ভট সম্পর্কিত ধারণা প্রথম প্রকাশ পেলো।

কৌতুককরের মতন কিম্ভূতও নিয়মহারা, হিসাবহীন, অসংগতি পূর্ণ এবং সে কারণে হাস্যোদ্রেককর। কিন্তু কৌতুককরের সঙ্গে কিম্ভূত বা উদ্ভটের একটা জাতের তফাত আছে। শিল্প-সাহিত্যে কৌতুক সৃষ্টি করা যায় সাধারণের স্বল্প ব্যতিক্রমকে একটু অতিরঞ্জিত করে চিত্রিত করে। কিন্তু কিম্ভূত অথবা উদ্ভটকে ধরতে হয় কল্পনা দিয়ে, আর কল্পনার রূপকল্প সৃষ্টি করে। কিম্ভূত বা উদ্ভট তাই কৌতুককরের মতন বাস্তবের ঠিক রূপান্তরিত প্রতিচ্ছবি নয়। বরং অধিকাংশ সময়েই বাস্তবের রূপক। রূপক ধর্ম যেহেতু আদতে শিল্পের নিজস্ব ধর্ম, সেহেতু উদ্ভট বা কিম্ভূতের ধারণা কৌতুক-করের ধারণার চেয়ে অধিকতর শিল্পসম্মত।[৯]

॥ ৪ ॥

ঔপনিবেশিক আধিপত্য শুরু হবার আগে পর্যন্ত ভারতের দৃশ্যশিল্পের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন কোন নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় না যা থেকে বোঝা যেতে পারে ভারতীয় শিল্পী, কারিগর এবং শিল্পরসিকরা হাস্যরস নামে একটি রসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। ভাঁড়ামি ছাড়া, অন্য যে-কোন ধরনের হাস্যরস সৃষ্টির জন্য যে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি আবশ্যক, মনে হয়, সমাজে তার অভাব ছিল। অভাব ছিল এই বিশ্বাসের যে সমালোচনা দিয়ে বিচ্যুতিকে পথে আনা যায়, বিকৃতিকে শোধরানো যায় ও অসংগতি দূর করা যায়। মার্গীয় বা দরবারি শিল্পে মাঝে মাঝে আর লোকশিল্পে বীভৎস এবং/কিংবা ভয়ঙ্কর রসের সাক্ষাৎ মেলে। ভয়ঙ্কর ও/বা বীভৎস রসসৃষ্টিতেও যা নিয়মহারা যা সংগতিহীন তা-ই প্রধান। রূপকল্প নির্মাণে তাই বল্গাছাড়া কল্পনা প্রাধান্য পায়। কিন্তু অতিরঞ্জন এক্ষেত্রে অনীহা কিংবা ভীতি-উৎপাদক। সমালোচনা নয়, প্রতিবাদ অথবা ঘৃণা মুখ্য হয়ে ওঠে বীভৎস ও ভয়ঙ্কর রসে।

ঐতিহাসিক কার্যকারণে, ঔপনিবেশিক পর্বে সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে ভারতীয় মানসে সমালোচনী মনোভাব সৃষ্ট হয়। দৃশ্যশিল্পে এই মনোভঙ্গির প্রথম সার্থক প্রকাশ কালীঘাটের পট। কালীঘাটের পটে সমালোচনা ব্যঙ্গের রূপ পেল—বিম্বের পারস্পরিক উপস্থাপনা গুণে, বিন্যাস গুণে, বর্ণনা গুণে; বিম্বের নিজস্ব রূপের গুণে নয়। বোধহয় বিম্বের ঐ দেশজ চরিত্র বজায় রেখে সেটা সম্ভব ছিল না। অন্য দিকে, ইংরেজ-প্রতিষ্ঠিত আর্ট স্কুলে শিক্ষিত বাবু শিল্পীরা পাশ্চ পত্রিকার কার্টুন, ক্যারিকেচার দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে উনবিংশ শতকের শেষ দিক থেকে যে-সব সমাজ-সমালোচনামূলক (অধিকাংশ সময়েই রক্ষণশীল মনোভাব থেকে, যে-কোন পরিবর্তনের বিরুদ্ধে) কার্টুন ক্যারিকেচার আঁকতে শুরু করলেন, তার কোনটিই কিন্তু বিম্বের পারস্পরিক উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে ঘটনা বা অবস্থা বর্ণনার বেশী কিছু হল না। কারণ শিল্পীরা কেউই বিম্ব রূপায়ণের ক্ষেত্রে উনবিংশ শতকের ইয়োরোপীয় প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবতার সীমা ছাড়িয়ে বিম্বের হাস্যোদ্রেককর রূপান্তর

ঘটাতে পারলেন না। গগনেন্দ্রনাথই প্রথম ভারতীয় শিল্পী যিনি বিশ্বের বর্ণনাত্মক উপস্থাপনের উপরে নির্ভর না করে, বিশ্বের রূপায়নকে রসপ্রকাশক করে তুললেন। তাঁর আগেকার সমালোচনাধর্মী ছবির তুলনায় অনেক বেশী শিল্পসম্মত হওয়া সত্ত্বেও গগনেন্দ্রনাথের ক্যারিকেচার সরাসরি ব্যঙ্গধর্মী ও শুধুই ব্যঙ্গপ্রবণ হবার কারণে, আগেকার কার্টুনিস্টদের ছবির মতনই একমাত্রিক এবং জটিলতাশূন্য।

সুকুমার রায়ই বোধ হয় প্রথম ভারতীয় হাস্যরস-ব্যাপারী শিল্পী যাঁর সমালোচনা একমাত্রিক নয়। বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষেপ পারঙ্গম তীরন্দাজী হওয়া তাঁর উদ্দেশ্য নয়। জটিলতা তাঁকে কৌতুহলী করে। জটিলতার মধ্যেই তিনি কৌতুকের উপাদান খুঁজে পান। কাঠ-বুড়ো, হেড অফিসের বড়বাবু, খুড়োর কলের খুড়ো লড়াই-ক্ষ্যাপা পাগলা, ছায়া-ধরা ব্যবসায়ী, কাজে খাটো বংশীধর, হিজিবিজবিজ বা ন্যাড়া—যাদের উদ্ভট, অসংগতিপূর্ণ কাণ্ড কারখানার কার্য-কারণ সম্পর্ক যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় না, যাদের কাজকর্ম অজ্ঞেয় উদ্ভট নিয়মে পরিচালিত হয় বলে, আমাদের মতন নিয়মের রাজত্বে বসবাসকারীদের হাস্যোদ্রেক করে—ছড়ায় এবং ছবিতে দেখি সুকুমার রায়ের সহানুভূতি যেন সেই সব আত্মমগ্ন ব্যতিক্রমীদের দিকেই। কখন-কখন এও মনে হয়, যাকে আমরা স্বাভাবিক নিয়ম-মাফিক, যুক্তিসংগত বলি, সুকুমার যেন প্রকারান্তরে তাকেই ব্যঙ্গ করছেন। অবশ্য একান্ত অনুচ্চ কণ্ঠে সে ব্যঙ্গ। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যতিক্রম, ব্যাষ্টির না-পসন্দ। কিন্তু যতক্ষণ সেই ব্যতিক্রম ব্যষ্টির পক্ষে ক্ষতিকারক নয়, ততক্ষণ ব্যষ্টিমনের কাছে ব্যতিক্রমী কাণ্ডকারখানা হাস্যোদ্রেককর। শুধু তাই নয়, ব্যষ্টিমন মজা পাবার জন্য ব্যতিক্রমী ব্যক্তিকে নিষ্ঠুরভাবে খুঁচিয়ে হাসির ব্যবস্থা করে নেয়। সুকুমার রায়ের ছবির ব্যতিক্রমী চরিত্রায়ণ থেকে জানতে কোন সন্দেহের অবকাশই থাকে না যে তার সহানুভূতি কোন দিকে। ব্যতিক্রমী চরিত্রদের উদ্ভট কর্মকাণ্ড হাস্যোদ্রেককর অবশ্যই, কিন্তু তাদের নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থা কি করুণ নয়? তাদের নিঃস্বার্থ আত্মনিমগ্ন কার্যক্রম কি শ্রদ্ধা জাগায় না? আবার দেখা যাক হুঁকোমুখো হ্যাংলা, রামগড়ুরের ছানা বা ট্যাঁশ গরুকে অথবা ভয় পেয়ো না'র সেই উদ্ভট জন্তুটিকে। এদের প্রত্যেকের চেহারাই বীভৎস, কিম্ভূত এবং ত্রাসজনক। কিন্তু হয় এরা নিজেরাই এত সন্ত্রস্ত অথবা এত সাধারণ এবং ত্রাসজননে অপারঙ্গম যে তাদের চেহারা টাই বিদ্রূপ হয়ে যায়। কি করুণ তারা যাদের আত্মপরিচয়টাই তাদের অস্তিত্বকে বিদ্রূপ করে। তারা কি অন্য কেউ? না, তারা আমাদেরই রূপক? আমরা যাঁদের কার্টুনিস্ট বা ক্যারিকেচারিস্ট বলে থাকি তাঁরা সাধারণত এমন জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করেন না: তাঁরা সাধারণত সহজ সমাধানেরই এক একটা দৃশ্যমান রূপ উপস্থাপন করেন। তাঁদের সরাসরি সমাধানই দর্শক হিসাবে আমরা গ্রহণ করে থাকি। ধন্দ নিয়ে কারবার শিল্পীরই।[১০] একই দৃশ্যে অভিজ্ঞতার বহুসম্ভাবনাকে ইঙ্গিতে সংকেতে যিনি আভাসিত করেন তিনি শিল্পী। ইলাস্ট্রেশন, কার্টুন, ক্যারিকেচার তিনি যাই করুন না কেন, তিনি শিল্পীই।

ফ্রান্সিসকো গোইয়ার ছবির কথা যদি মনে নাও রাখি, শুধু যদি তাঁর কার্টুন আর ক্যারিকেচার-এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি তা হলে দেখব, নেপলিয়নীয় যুদ্ধের পটভূমি শুধু পটভূমিই। মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের পাশবিক ক্রূরতা ভীরু বশ্যতা ইত্যাদিই তাঁর ডার্ক ম্যাকাবর হিউমর-এর লক্ষ্য। ওঁরে দ্যমিয়ে ফরাসী দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা নিয়ে যখন তাঁর-ব্যঙ্গাত্মক ছবি এঁকেছেন তখন বিচারালয়, বাদী, ফরিয়াদী, উকিল মোক্তার, বিচারপতিকে ছাপিয়ে উঠেছে তঞ্চকতা, শঠতা, প্রবঞ্চকতা, দম্ভ, গর্ব ও মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণ বিষয়ে তাঁর তীর্যক শ্লেষ। তবে, সুকুমার রায় প্রসঙ্গে গোইয়া বা দ্যমিয়ে ঠিক প্রাসঙ্গিক নয়। তাঁর ছবিতে সময়ে অসময়ে কিঞ্চিদধিক শ্লেষ থাকলেও, ব্যঙ্গ ঠিক তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নয়। তিনি ঠিক সমাজসমালোচকও নন। তাঁর ছবিতে সমালোচ্য ব্যক্তিবর্গের সামাজিক পরিচয় শনাক্ত করা যায় না। সমালোচ্য ব্যক্তিকে দেখাযায় মাত্র; তাও সুস্পষ্টভাবে নয়। তাঁর সমালোচ্য কিছু কাজকর্ম, কিছু চিন্তাভাবনা, কিছু ব্যবহার। এ-ব্যাপারে তাঁর পূর্বসূরী লুইস ক্যারেল ও এডওয়ার্ড লিয়র। আগেই দেখেছি ভারতীয় শিল্পকলায় হাস্য-রস সৃষ্টির কোন ঐতিহ্য ছিল না। উনবিংশ শতক থেকে যে ব্যঙ্গ-প্রধান হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে তাতে বিস্বর রূপের ভূমিকা প্রায় কিছুই ছিল না। গগনেন্দ্রনাথ যখন যথাযথ বিম্ব-রূপ নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন তখন তাঁকে ফিরতে হয়েছে গোইয়া আর দ্যমিয়ের দিকে। তাঁর অভীষ্ট ছিল ব্যঙ্গ সৃষ্টি। সুকুমার রায় তো সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন কৌতুক। কৌতুক হাসাই তাঁর লক্ষ্য। লুইস ক্যারলের এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড কিংবা থ্রু দি লুকিং গ্লাস তাঁকে প্রভাবিত করতে পারত। সেখানেও অপাপবিদ্ধ সরল দর্শক অপারবিস্ময়ে নিয়মহারা অসংগতিপূর্ণ জগতে বিচরণ করে যে আনন্দ লাভ করে, নিয়মবদ্ধ যুক্তিসিদ্ধ জগতে সে আনন্দ দুর্লভ। কিন্তু সুকুমার যায় তো বিষাদ-সন্ধানী। অপাপবিদ্ধ সরলকে তো কঠিন ক্রূর একুশে আইনের জগৎ নিয়মহারা বাঁধনহীন জগতে অবাধে বিচরণ করতে দিতে নারাজ। অতএব, বিষাদই অপাপদ-বিদ্ধের ভবিতব্য। হরিষে-বিষাদের অনবদ্য এক শিল্পভাষা সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন, লিমেরিকের স্রষ্টা এডওয়ার্ড লিয়র তাঁর ইলাস্ট্রেশনে।[১১] উত্তরসূরী সুকুমার রায়ের মতনই, লিয়রের বিচরণ কৌতুক থেকে কিম্ভূতের মধ্যে। তার পূর্বসূরী এবং উত্তরসূরীর মধ্যে তফাত খানিকটা আছে। লিয়র ছিলেন সুদক্ষ পেশাদারী চিত্রকর। সুকুমার রায় তা নন। লিয়রের কৌতুক অনেক সময়েই বেশ ক্রূর। সুকুমার রায়ের কৌতুক প্রায় কখনই ক্রূর নয়।

কথা হল, ছবি আঁকিয়ে সুকুমার রায় কি শুধুই লেখক সুকুমার রায়কে অনুসরণ করে গেছেন? না, তাঁর ছবি নিজ গুণে আকর্ষক। এটা অনস্বীকার্য যে সুকুমার রায় ছবি এঁকেছেন লেখা পড়ার সঙ্গে ছবি দেখার জন্য। তাঁর ঘটনা বর্ণনামূলক অনেক ছবির সম্পূর্ণ রস লেখার সঙ্গে ছাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যেখানে খেয়ালী কল্পনা তাঁর বিম্ব নির্মাণ করেছে, যেখানে তিনি আজগুবি রূপকল্প

সৃষ্টি করেছেন সেখানে তাঁর ছবি লেখার সহায়ক মাত্র নয়; নিজ গুণে ছবি। সে ছবি লেখাকে নতুন মাত্রা দেয়। আনুষ্ঠানিক ছবি যেমন অতিরিক্ত বিবরণমূলক হলে ইলাস্ট্রেশনে পরিণত হয়, তেমনই আবার ইলাস্ট্রেশন বিবরণী-বিশদহীন হয়ে কল্পনার যাদুস্পর্শে ছবি হয়ে ওঠে। ইলাস্ট্রেটর সুকুমার রায়ের খেয়ালরসসিক্ত উদ্ভটকল্পনার রূপকল্প তার নিদর্শন। বুদ্ধদেব বসু আমাদের দেখিয়েছেন কি করে সুকুমার রায় শব্দের যাদু দিয়ে হাসির ছড়ায় কল্পনার সঞ্চার করে, ছড়াকে কবিতায় পরিণত করেন।[১১] ঠিক সে ভাবেই ইলাস্ট্রেটর সুকুমার রায় উদ্ভট রূপ-কল্পের সংকেতে হাসির ছদ্মবেশে বিষাদকে স্পর্শ করেন। তিনি যদি শিল্পী না হন, তবে কে শিল্পী?

টীকা, নির্দেশ ও গ্রন্থপঞ্জী

* এই প্রবন্ধ রচনায় শ্রীযুক্তা নলিনী দাশ ও শ্রীসত্যজিৎ রায়-এর সাহায্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

১। হাঙ্গেরীয় দার্শনিক গেয়র্গ লুকাচ তাঁর ১৯৩৬-এ লেখা প্রবন্ধ 'ন্যারেট অর ডেসক্রাইব'-এ (লুকাচ, রাইটার এণ্ড ক্রিটিক, মার্লিন, লণ্ডন, ১৯৭০), বর্ণনা এবং বিবরণ এই দুই ভাগের মধ্যেই জগৎ জীবন, ভাবনার সব মানুষ-সৃষ্ট প্রতিফলনকে ধরতে চেয়েছিলেন। প্রায় এক ধরনের দু'-ভাগে বিভাজন কাঠামো দাঁড় করিয়েছিলেন ভামহ (কাব্যালঙ্কার ১, ২৬), দণ্ডী (কাব্যাদর্শ ১, ২, ৫), বাণভট্ট (হর্ষচরিত, কাদম্বরী) ও অমরসিংহ (অমরকোষ ১)। এঁদের মতে কাব্যে, নাট্যে প্রবন্ধে ঘটনার প্রতিফলন ঘটে হয় কথা, না হয় আখ্যান এর মধ্য দিয়ে। কিন্তু এই দ্বি-শ্রেণীক বিভাজন রীতি যথেষ্ট বলে মনে হয় না।

২। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম পঞ্চভূতের যে-কোন একটির অথবা যে-কোন দুই বা ততোধিকের সমাহারে গঠিত কোন বস্তু অথবা অবস্থার—মানুষ-সৃষ্ট রূপ অর্থে হিন্দীতে বিম্ব শব্দটি বহুল প্রচলিত। শব্দটি তৎসম হবার কারণে বাংলায়ও চলতে পারে। ইংরেজিতে 'ইমেজ' শব্দটির অভিধার্থ যা, 'বিম্ব'-র মানেও তাই। ইংরিজি 'ইমেজ' শব্দের দ্বিতীয় একটি অভিধার্থ আছে, যাতে ইমেজ-এর অর্থ দাঁড়ায় 'আইকন' বা প্রতিমা। সে অর্থ আমাদের লক্ষ্য নয়। আবার, 'ইমেজ'-এর একটি ব্যঞ্জনার্থ আছে। এজরা পাউণ্ড প্রমুখ ইমেজিস্ট কবিরা এই ব্যঞ্জনার্থে ইমেজ কথাটি ব্যবহার করতেন। এ-বিশেষ অর্থে মানুষের সৃষ্ট ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপ কোন জাগতিক বস্তুর প্রতিরূপ মাত্র নয়। বস্তুর রূপকে অবলম্বন করে নির্বস্তুক ধ্যান-ধারণা ভাবনা-কল্পনা যে সৃষ্ট রূপে প্রকাশ পায় তা-ই 'ইমেজ'। ব্যঞ্জনার্থে প্রযোজ্য ইমেজ শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে তৎসম যৌগিক শব্দ রূপকল্প বেশ লাগসই।

৩। বরোদা থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত বৃশ্চিক পত্রিকার দি সোস্যাল কনটেক্সট অফ আর্ট শিরোনামের গীতা কাপুর সম্পাদিত বিশেষ সংখ্যায়

(১৯৭৩) 'দ্য সিস্টেম অফ কমোডিটি প্রোডাকশন' নামে মৎপ্রণীত প্রবন্ধে এটা বলার চেষ্টা হয়েছিল যে, শিল্পবস্তু গ্রহীতার তিন ধরনের প্রয়োজন মেটায়। তিনটি আলাদা আলাদা কারণে শিল্পবস্তুর চাহিদা তৈরী হয়ঃ (ক) আধিভৌতিক ক্রিয়া-কর্মের যন্ত্র হিসাবে এবং/বা পূজ্যবস্তু হিসাবে, (খ) সংযোগক্ষম মাধ্যম হিসাবে এবং/বা (গ) অলংকার হিসাবে গুণগুলি অল্পবিস্তর মিশে থাকে। প্রবন্ধ প্রকাশের বেশ কিছুকাল পরে, অকাল-প্রয়াত জর্মন সমালোচক হলটের বেনজামিন-এর কিছু লেখার একটি ইংরিজি সঙ্কলন, ইলিউমিনেশনস, কেপ, লণ্ডন, ১৯৭০-এ 'দা ওয়াক' অফ আর্ট' ইন দি এজ অফ মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকসনস' নামে একটি প্রবন্ধ চোখে পড়ে। সেখানে বেঞ্জামিন বলেছেন, দু' জাতের শিল্পবস্তু দু' ভাবে দর্শকের চাহিদা মেটায়ঃ পূজ্য বস্তু হিসেবে এবং দর্শনীয় বা দর্শনেন্দ্রিয় তৃপ্তকর বস্তু হিসাবে। বেঞ্জামিনের প্রথম জাতটি ঠিক আছে! দ্বিতীয় জাতটি বর্ণসংকর।

৪। গ্রন্থচিত্রণ, চিত্রিত পুঁথি চিত্র মুদ্রণের ইতিহাস ও কলাকৌশল নিয়ে ইংরেজি ভাষায় লেখা অনূদিত বহু প্রামাণ্য বই পাওয়া যায়। ডেভিড ব্ল্যাণ্ড, এ হিস্ট্রি অফ বুক ইলাস্ট্রেশন, লণ্ডন, ১৯৫৮—তার মধ্যে এমনই একটি বই যা বিশেষজ্ঞদের জন্য নয়, কিন্তু সব সাধারণস্বীকৃত তথ্য-প্রমাণাদি বইটিতে সুন্দরভাবে সাজানো আছে। এই সচিত্র বইটি নয়নসুখকরও বটে। প্রতিবেশী দেশ সহ ভারতবর্ষে গ্রন্থচিত্রণ, চিত্রিত পুঁথি ও চিত্র মুদ্রণের প্রামান্য ইতিহাস-এর জন্য জেরেমিয়া পি লসটি, দি আর্ট অফ বুক ইন ইনডিয়া, ব্রিটিশ লাইব্রেরী, লণ্ডন, ১৯৮২ (ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত ভারত-মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত) দ্রষ্টব্য।

৫। সুকুমার রায়ের জীবনী সংক্রান্ত তথ্যাদির জন্য, সুকুমার রায়ঃ সমগ্র শিশু সাহিত্য, আনন্দ, কলকাতা ১৩৮৩-র অন্তর্ভুক্ত সত্যজিত রায়ের 'ভূমিকা' ও সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭৬ দ্রষ্টব্য।

৬। হাসির কারণ বহুবিধ। কৌতুকবোধ তার অন্যতম। শিল্পসাহিত্যে হাস্যরসের উৎস প্রধানত কৌতুক। কৌতুকের উপকরণ, উপাদান কি? এবং কৌতুক কেন হাস্যোদ্রেককর তার ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের 'কৌতুকহাস্য' এবং 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' নামে দুটি সরস রচনা যেমন পাওয়া যায়, তেমনটি আর কোথাও পাওয়া যায় না। প্রবন্ধদ্বয়ের জন্য পঞ্চভূত (১৩০৪), রবীন্দ্ররচনাবলী (বিশ্বভারতী সংস্করণ), দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৭। ঊনিশ শতকের ফরাসী কবি শার্ল ব্যোদলেয়ার ১৮৫৫-লেখা একটি প্রবন্ধে হাসির উৎস ও কারণ এবং শিল্প-সাহিত্যে হাস্যরস বিচার বিবেচনা করেছিলেন। সেই প্রবন্ধেই এবম্বিধ অভিমত পাওয়া যায়। পিটার ক্যুয়েনেল (সম্পাদিত), শার্ল ব্যোদলেয়ার—এসেন্স অফ লাফটার, মেরিডিয়ান, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৬।

৮। 'বাংলা শিশুসাহিত্য' নামে ১৯৫২-তে লেখা তাঁর অসাধারণ প্রবন্ধটিতে

বুদ্ধদেব বসু, সুকুমার রায়ের লেখার এদিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু, প্রবন্ধ সংকলন, দে'জ কলকাতা, ১৯৮২।

৯। 'গ্রোটেস্ক' বা কিম্ভূত কিংবা উদ্ভট যে 'হিউমার' বা কৌতুকের চেয়ে উঁচু দরের শিল্প এ-বিষয়ে শার্ল ব্যোদলেয়ারের কোন সন্দেহ ছিল না। ব্যোদলোয়ার, তদেব।

১০। কবি, সমালোচক উইলিয়ম এম্‌প্‌সনের মতে এমবিগুইটি বা ধন্দ শিল্পের প্রাণ। উইলিয়ম এম্‌পসনের সেভেন টাইপ্‌স্‌ অফ এমবিগুইটি, ফনটানা পেপারব্যাক, লণ্ডন ১৯৬৭, দ্রষ্টব্য।

১১। এডওয়ার্ড লিয়র-এর লিমেরিকের অধিকাংশ ভাল সংস্করণেই তাঁর নিজকৃত সচিত্রণী-চিত্র স্থান পায়। লিয়র সম্পর্কে আলোচনা হয়েছেও বিস্তর। তবে, জন লেহম্যান এডওয়ার্ড লিয়র এণ্ড হিজ ওয়ার্ল্ড, টেমস্‌ এণ্ড হাডসন, নরউইচ, ১৯৭৭, নামে বইটি অনবদ্য। বইটির ছবি দেখলে বোঝা যায় সুকুমার রায় লিয়রের কাছে কতটা ঋণী।

১২। বুদ্ধদেব বসু—তদেব।



রবীন্দ্রনাথের তরুণ বন্ধু

পার্থ বসু

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ময়মনসিংহের মসুয়া শহর থেকে এসেছিলেন কলকাতার কলেজে পড়তে। পূর্বপরিচিত গগনচন্দ্র হোমের প্রেরণায় উপেন্দ্রকিশোর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সাংগীতিক প্রতিভাধর, সাহিত্যসেবী এবং শিল্পী হিসেবে শুধু নয়, বিচিত্র সাংস্কৃতিক কর্মে উদ্যোগী উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে সহজেই বন্ধুত্ব হয়েছিল কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কবি রবীন্দ্রনাথের। বয়সে ছিল দু' বছরের পার্থক্য। উপেন্দ্রকিশোর যেহেতু রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক, অতএব তাঁকে 'ভক্ত' বলা যায় না; বলা যেতে পারে, অনুরাগী বান্ধব। রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠে গানের সঙ্গে তিনি যন্ত্রে সংগত করতেন জানা যায়। কবির গানের প্রথম 'স্টাফ নোটেশন' উপেন্দ্রকিশোর-কৃত। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে চিত্রাংকনও করেছেন। একটি স্বচ্ছ এবং নিরাবেগ মৈত্রীর সম্পর্ক ছিল ধীরস্বভাব কর্মোদ্যোগী উপেন্দ্রকিশোর এবং ভাবপ্রবণ স্বপ্নদর্শী রবীন্দ্রনাথের মধ্যে; উপেন্দ্রকিশোর তাঁর প্রথম সন্তান, কন্যা সুখলতার নাম রেখেছিলেন 'হাসি' এবং প্রথম পুত্রসন্তান সুকুমারের নাম রেখেছিলেন 'তাতা'; বলা বাহুল্য, দুটি নামই রবীন্দ্রনাথের রচনা 'রাজর্ষি' থেকে আহৃত।

উপেন্দ্রকিশোরের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ আসতেন। শৈশব থেকে সেই সুবাদে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুকুমারের পরিচয়। সাহিত্য-শিল্প-সংগীতের পরিমণ্ডলে সুকুমার বড় হয়ে উঠেছেন। স্বভাবতই তাঁর বন্ধু-নির্বাচনেও সেই দৃষ্টি কাজ করেছে, কিংবা

সুকুমার রায়ের সুখ্যাত ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাঁর সঙ্গীরাও সংস্কৃতির আলোক পেয়েছেন এমনও বলা চলে। তাঁদের মধ্যে একাধিকজন ছিলেন রবীন্দ্রনাথেরও ঘনিষ্ঠ তরুণ বন্ধু। ব্রাহ্মসমাজের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সুকুমার রায় যখন অবিসংবাদী নেতা তখন তাঁর সামনে প্রত্যক্ষ এবং প্রোজ্জ্বল ছিলেন অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। দেশের শিক্ষা এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে, সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে তো বটেই, রবীন্দ্রনাথ তখন প্রবলভাবে জড়িত। ওদিকে ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি 'নেতিবাচক' অনুজ্ঞার প্রতি সুকুমার রায়ের ভীষণ অনীহা প্রকাশ পেত; তিনি চেয়েছিলেন সদর্থক কিছু সংগঠনের পরিকল্পনা। নিকটতম প্রতিভা, পিতৃবন্ধু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া সুকুমার রায় আর কাকে জ্যোতিষ্ক বলে মান্য করতে পারতেন? রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুকুমারের ছিল অনুজপ্রতিম পরিচ্ছন্ন এক শ্রদ্ধা যা কখনও অন্ধ ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়নি।

এইকালেই ব্রাহ্ম যুব সমিতির সব সদস্যদের সুকুমার রায় মাসে একদিন এদিক ওদিক নিয়ে যেতেন। সেই উপলক্ষে একবার তিনি সদলে উপস্থিত হয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্টোর রোডের বাড়িতে। এর কাছাকাছি সময়ে সুকুমার রায় 'আলোক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথের 'আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো' মুদ্রিত হল। পত্রিকাটির আবির্ভাবের ঘোষণারূপেই গানটি সেখানে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

ছাত্রজীবন থেকেই রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত বোলপুর ব্রাহ্মচর্যাশ্রমে সুকুমার রায়ের যাতায়াত ছিল। সে সময়ে তাঁর পরিচয় হয় কালিদাস নাগের সঙ্গে। ডঃ নাগের স্মৃতিকথায় জানা যায়, 'রবীন্দ্রনাথের যখন ৫০ বছর বয়স তখন একবার থার্ড ক্লাসের টিকিট করে শান্তিনিকেতন যাই। পথে পরিচয় হয় সুকুমার রায়ের সঙ্গে। তিনি বিলেত যাবেন।' এর পরে ডঃ কালিদাস নাগ সবিস্ময়ে লক্ষ করেছেন সুকুমার রায়ের স্বভাবটি: 'রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে তখন পয়সার টানাটানি। শালপাতায় নুন রেখে কাঁকরভরা চাল ডাল খেতে হত। তখন সুকুমার রায়ের হাসির হর্‌রা শোনা গিয়েছিল। খাচ্ছেন আর মুখে মুখে গান রচনা করছেন···রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে, 'এই তো ভাল লেগেছিল আলুর নাচন হাতায় হাতায়'। প্রতিদিন একই তরকারি আলু-খাওয়ার প্রতিক্রিয়া।

১৯১১য় রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশতম জন্মোৎসব শান্তিনিকেতনে সমারোহের সঙ্গে হয়েছিল; সেবার 'রাজা' নাটকও হল। আর ছিল সুকুমার রায়ের পাঠ। সীতা দেবী তাঁর 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থে লিখছেন, "ইহারই ভিতর একদিন সুকুমার রায় তাঁহার 'অদ্ভুত রামায়ণ' গান করিয়া শুনাইয়াছিলেন। উহা ২৪শে কি ২৬শে বৈশাখ হইয়া থাকিবে। এই রামায়ণ গানটি সকলেই খুব উপভোগ করিয়াছিলেন। 'অদ্ভুত রামায়ণে' একটি গান আছে, 'ওরে ভাই, তোরে তাই কানে কানে কই রে, ঐ আসে, ঐ আসে, ঐ ঐ ঐ রে'। আশ্রমের ছোট ছেলেরা ঐ গানটি শোনার পর সুকুমারবাবুরই নামকরণ করিয়া বসিল, 'ঐ আসে'। একটি ছোট ছেলে মাঠের ভিতর গর্তে পড়িয়া গিয়া আর উঠিতে পারিতেছিল না। সুকুমারবাবুকে সেইখান

দিয়া যাইতে দেখিয়া সে চিৎকার করিয়া বলিল, 'ও ঐ আসে, আমাকে একটু তুলে দিয়ে যাও তো'।"

১৯১১ সালে গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি পেয়ে সুকুমার বিলেত যাত্রা করেন। তার কয়েক মাস পরেই ১৯১২র জুন মাসে রবীন্দ্রনাথ পুত্র ও পুত্রবধূ সহ লণ্ডনে পৌঁছন। বিদেশে কবির সংস্পর্শে এসে সুকুমার রায় যে বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলেন, সেখান থেকে আত্মীয়জনকে লেখা চিঠিতে তার প্রকাশ রয়েছে। যেমন পিতৃদেব উপেন্দ্রকিশোরকে সুকুমার লিখেছেন: 'সকালে রবিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম··· রবিবাবুরা যেখানে আছেন সে জায়গাটা ভারি সুন্দর।'

বা,

'আজ রাত্রে রবিবাবুদের ওখানে নেমতন্ন আছে। Mr Rothenstein প্রভৃতি অনেকে আসবেন। রবিবাবু এখন খুব কাছেই থাকেন—Cromwell Road-এর এখান থেকে ১ মিনিটের রাস্তা।'

মাকে লিখছেন একটি চিঠিতে:

'গত শনিবার ব্রাহ্মসমাজে রবিবাবু "কর্ম্মযোগ" বিষয়ে চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অনেক লোক হয়েছিল—তাঁরা সকলেই খুব খুসী হলেন বলে বোধ হল।'

সেখানে অন্য অনেক কথার মধ্যে চকিতে এসে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের কথা, তাঁর সস্নেহ সান্নিধ্য যে সুকুমার উপভোগ করছেন সেকথা সহজেই বোঝা যায়। যেমন, মাকে জানাচ্ছেন,

'বিকালে আবার রবিঠাকুরের ওখানে নেমন্তন্ন'···সুবিনয় রায়কে লিখছেন,

'রবিবাবু খুব কাছেই থাকেন। প্রায়ই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হয়।'

পুণ্যলতা চক্রবর্তীকে জানালেন,

'এই রবিবার রবিবাবু মন্দিরে উপাসনা করবেন।

এর মধ্যে অনেকবার রবিবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে।'

আর এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের প্রবাস-জীবনের বহু উপকরণ প্রকীর্ণ হয়ে রয়েছে সুকুমার রায়ের তৎকালে লেখা চিঠিগুলিতে। আমাদের মনে পড়ে যায়, পরবর্তীকালে সুকুমার রায়ের এক বন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ যখনই রবীন্দ্রনাথের বিদেশ-ভ্রমণের সহচর হয়েছেন তাঁর লেখা পত্রাদিতেও রবীন্দ্র-জীবনীর এ ধরনের অজস্র উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে। সুকুমারের চিঠিগুলিতেও সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে বিচিত্র ধরনের, যেমন:

'মঙ্গলবার Rothenstein-এর ওখানে রবিবাবু "রাজা"র translation পড়লেন—খুব চমৎকার হয়েছিল। ৬০/৭০ জন লোক হয়েছিল।' এই 'রাজা' নাটকটির অনুবাদক সম্ভবত তৎকালে ইংলণ্ডপ্রবাসী ছাত্র ক্ষিতীশচন্দ্র সেন।

মাকে লিখছেন,

'রবিবাবুর সঙ্গে এর মধ্যে ২/৩ বার দেখা হয়েছে, আসছে রবিবার তাঁর

সমাজে উপাসনা করবার কথা। তিনি বোধহয় শীঘ্রই আমেরিকায় যাবেন।' আবার ১৯১৩'র ১০ এপ্রিল মা-কেই লিখছেন, 'মে মাসে রবিবাবু আমেরিকা থেকে আসবেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য শুনলুম লণ্ডনে খুব বড়-রকমের আয়োজন হচ্ছে।' বা পুণ্যলতাকে খবর দিচ্ছেন, 'বিলেতে রবিবাবুর খুবই নাম হয়েছে। এখানকার বড় বড় poetরা রবিবাবুর নাম করতে পাগল।' শুধু তো স্বদেশবাসী বলে নয়, কবির একান্ত স্নেহার্থী সুকুমারের গর্ববোধও যেন প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে এসব চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথেরও নিশ্চয় প্রীত মনে হয়েছিল সুকুমার রায়ের সঙ্গ। মাকে লিখছেন সুকুমার এক চিঠিতে, 'রবিবাবুর আজ নাহয় কাল জার্মানি ফ্রান্স প্রভৃতি জায়গায় বেড়াতে বেরোবেন—দ্বিজেনবাবু [দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র] তাঁদের সঙ্গে যাচ্ছেন। আমাকেও যাবার জন্য রবিবাবু বিশেষ করে বলছেন—কাজেই আমিও রাজি হয়েছি। বিশেষত এরকম সুবিধামত দল করে দেখা আর হবে না।' রবীন্দ্রনাথ সে সময় অনেক পরিচিতজনকেই পেয়েছিলেন সেই সুদূর ইংলণ্ডে; কিন্তু, মনে হয়, সুকুমারের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা বিশেষভাবে ঘটেছিল। প্রমথলাল সেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল থেকে শুরু করে অরবিন্দমোহন বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকের সঙ্গেই কবির দেখাসাক্ষাৎ নিয়মিত হত। কিন্তু, সুকুমার রায় যেন নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আর প্রেরণাতেই রবীন্দ্রনাথের পরিচায়কের ভূমিকা নিলেন। আসলে সুকুমার রায়ের মনীষা এবং সাহস সর্বাধিক দীপ্তোজ্জ্বল ছিল; তিনিই বিদেশী এক কবিকে পরিচিত করলেন সর্বপ্রথম ইওরোপে। অধ্যাপক উইলিয়ম পিয়ার্সন তখন লণ্ডনে, তাঁর দৌত্যে ঘটনার সূচনা হয়েছিল। পুণ্যলতাকে লেখা ১৯১২-র ২১ জুন সুকুমার রায় এক চিঠিতে সেকথা লিখছেন। তার চারদিন আগে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে পৌঁছেছেন।

'পরশুদিন [১৯ জুন ১৯১২] Mr Pearson…তাঁর বাড়িতে আমাকে Bengali Literature সম্বন্ধে একটা Paper পড়বার নেমন্তন্ন করেছিলেন।… সেখানে গিয়ে দেখি Mr. & Mrs Arnold, Mr & Mrs Rothenstine, Dr P. C. Ray, Mr. Sarbadhikary প্রভৃতি অনেকে, তাছাড়া কয়েকজন অচেনা সাহেব মেম উপস্থিত। শুধু তাই নয়, ঘরে ঢুকে দেখি রবিবাবু বসে রয়েছেন। বুঝতেই পারছিস আমার অবস্থা! যা হোক, চোখকান বুজে পড়ে দিলাম। India Office Library থেকে বইটই এনে mterial জোগাড় করতে হয়েছিল। তাছাড়া রবিবাবুর কয়েকটি কবিতা—সুদূরে, পরশপাথর, সন্ধ্যা, কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ ইত্যাদি অনুবাদ করেছিলাম।…Mr Cranmer Bying, Northbrooke [Society]-র Secretary, আর Wisdom of the East Series-এর Editor খুব খুশী।…আমাকে ধরেছেন অনুবাদ করতে, তিনি publish করবেন।' এই হল সূচনা। এর পর সম্ভবত রোটেনস্টাইন, পিয়ার্সনের অনুরোধে সুকুমার রায় শুধু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য নিয়ে একটি লিখিত ভাষণ দিলেন।

মনে করা সংগত, রবীন্দ্রনাথেরও সে-বিষয়ে সম্মতি বা প্রশ্রয় ছিল। বাবাকে লিখছেন সুকুমার, 'এই সোমবার East & West Society বলে একটা clubএ একটা প্রবন্ধ পড়তে হবে সেইটা নিয়ে সপ্তাহখানেক ধরে খুব ব্যস্ত আছি। Paperটার বিষয় রবিবাবুকে উপলক্ষ করে আমাদের নানারকম movements., ব্রাহ্মসমাজ ইত্যাদির কথা বলা।'

সেই সভার সংবাদ পাঠাচ্ছেন পরে, পুণ্যলতাকে : 'গত সোমবার এখানের একটা ক্লাবে "The Spirit of Rabindranath" বলে একটা paper পড়লাম। লোক মন্দ হয়নি। "Quest" কাগজের editor Mr Mead (যিনি এখানে রবিবাবুর lecture সব arrange করেছিলেন), তাঁর প্রবন্ধটা খুব পছন্দ হয়েছে। তিনি "Quest" কাগজে ছাপাচ্ছেন। রবিবাবু দু সপ্তাহ Nursing Homeএ ছিলেন। কয়েকদিন হল সেখান থেকে এসেছেন।'

প্রবন্ধ পাঠের দিন অর্থাৎ ২১ জুলাই তখনও নার্সিং হোমে। ঐ চিঠিতেই খবর আছে যে, দুদিন আগে সুকুমার রায় সেখানে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। রচনাটির খসড়া বা পরিকল্পনাও কি লেখক সেখানে কবিকে জানিয়ে এসেছিলেন!

এই 'কোয়েস্ট' পত্রিকার সম্পাদক রেভারেন্ড জে আর এস মিডের উদ্যোগে মে, ১৯২৩ থেকে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণগুলো দিয়েছিলেন সেগুলি পরে 'সাধনা' গ্রন্থে সমাহৃত হয়েছে।

আলোচ্য প্রবন্ধটি পরে সুকুমার রায়ের 'বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে যুক্ত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা সুকুমার রায়ের অনুবাদে প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট আছে। কিছু মূলানুগ নিশ্চয় সেই অনুবাদকর্ম, কিন্তু কাব্যের প্রসাদগুণ প্রবলভাবেই রয়েছে। এমনকি রবীন্দ্রনাথের যেসব পদ্য তিনি অনুবাদ করেছেন যেগুলি আজ আধুনিক পাঠকের কাছে অনেকাংশেই তার মূল্য হারিয়েছে। স্বয়ং কবি যেসব রচনার ঐতিহাসিক ভূমিকা ছাড়া আর কোন মর্যাদা দিতে রাজি ছিলেন না। এখন মনে হয়, সুকুমার রায়ের ইংরেজি অনুবাদে সেই রচনার দুর্বলতা বা মালিন্য স্খলিত হয়ে এক নতুন ঔজ্জ্বল্য দেখা দিয়েছে। যথা, 'প্রভাতসংগীত' কাব্যগ্রন্থের

হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
দিশে দিশে নাহিকো কিনারা,
তারি মাঝে হনু পথহারা।
সে বন আঁধারে ঢাকা,
গাছের জটিল শাখা
সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।

'পুনর্মিলন'

সুকুমার রায়ের অনুবাদে,

There is a forest called the heart ;
Endless, it extends on all sides.
Within it mazes I lost my way,
Where the tree with branched entwined
Nurse the darkness in its bosom.

'সন্ধ্যাসংগীত' গ্রন্থের 'হৃদয়ের গীতিধ্বনি' থেকে বেশ কিছু পংক্তি সুকুমার রায় উদ্ধার করেছেন।

মাথায় পড়িছে পাতা, পড়িছে শুকনো ফুল,
পড়িছে শিশিরকণা, পড়িছে রবির কর—
পড়িছে বরষা-জল ঝরঝর ঝরঝর···
বসিয়া বসিয়া সেথা, বিশীর্ণ মলিন প্রাণ
গাহিতেছে একই গান, একই গান, একই গান।

অনুবাদে :

Round thee fall the faded leaves and
flowers shed their petals.
The dewdrops sparkle on the grass and
vanish, the sunlight plays with shadows,
The rain patter on leaves.
And there in the midst of all, thy wasted
weary soul
sings the same, the same, the same
unchanging tune.

একই পদ্যের আরেকটি অংশে :

তবে থাম—থাম ওরে প্রাণ,
পারিনে শুনিতে আর—একই গান—একই গান।

সুকুমার রায়ের অনুবাদে ঃ

Then cease, cease my heart !
I am weary of the same, the same
unchanging cry.

তাছাড়া 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', সেই সুদীর্ঘ কবিতার মৌল অংশটুকু সন্ধান এবং নির্বাচনও কবিদৃষ্টির পরিচায়ক। আর রয়েছে সম্পূর্ণ 'সুন্দর' কবিতাটির অনুবাদ যার ভাষ্যব্যবহার দেখলেই ধরা পড়ে অনুবাদক সুকুমার রায়ের কবিতাটি সম্বন্ধে মমতা। মূল রচনাটি গানের কল্যাণে যথেষ্ট জনপরিচিত, আমরা শুধু এখানে সুকুমার রায়ের ভাষান্তরের একটি স্তবক পরিবেশন করি ঃ

I am distraught.
O Beyond, I am forlorn.
In the languid sunlit hours
In the murmur of Leaves, in the dancing shadows.
What vision unfolds before my eyes
Of thee—in the wide blue sky ?
O Beyond ! Vast Beyond !
How passionate comes thy clarion call.
I forget, alas ! That my hapless self
Lives in a house whose gates are closed.

পরে স্বয়ং কবি 'সুদূর' কাব্যের অনুবাদ করেছিলেন; তার প্রাসঙ্গিক স্তবকটি এখানে উদ্ধার করা যায়ঃ

I am listless, I am wanderer in my heart.
In the sunny haze of the languid hours, what vast vision of thine takes shape in the blue sky !
O farthest end, O the keen call of thy flute !
I forget, I ever forget, that the gates are shut everywhere in the house where I dwell alone !

হয়ত সুকুমার রায়ের প্রায়-আক্ষরিক অনুবাদ, তবু সচেতন পাঠক অনুবাদেও সেই অনাহত ধ্বনিটি শুনতে পাবেন! কবি-কৃত দুটি অনুবাদও আছে, একটি হল 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' অপরটি, 'মরণ যেদিন দিনের শেষে'ঃ দুটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম এবং সদ্যপ্রকাশিত অনুবাদ-গ্রন্থ 'গীতাঞ্জলি' থেকে আহৃত। আর সবশেষে 'উৎসর্গ' কাব্যের একটি কবিতা বক্তা-কর্তৃক অনূদিত। সেটি হল, 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে'। 'দ্য স্পিরিট অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর' রচনাটিতে যেমন প্রকীর্ণ হয়ে রয়েছে এক সন্ধানী পাঠকের আবেগতপ্ত বিশ্লেষণ, কবির রচনার ভাষান্তরেও তার উজ্জ্বল উপস্থিতি। এই ভাষণ এবং অনুবাদ শুনে শ্রোতারা তৃপ্ত হয়েছিলেন। স্বয়ং কবিরও আনন্দের খবর পাওয়া যাচ্ছে বাবাকে লেখা সুকুমার রায়ের একটি চিঠিতেঃ

মঙ্গলবার রবিবাবুর ওখানে রাত্রে খাবার নেমন্তন্ন ছিল। Rothenstein ও সেখানে এসেছিলেন—দুজনেই বল্লেন, আমরা রবিবাবুর কয়েকটা poetry-র যা translation করেছি তা তাঁদের খুব ভালো লেগেছে—সেইগুলো এবং আরো কয়েকটা translate করে publish করবার জন্য বিশেষ করে বললেন। রবিবাবু এখানে আসায় অনেকেই খুব interested হয়েছেন···Mr Rothenstein বল্লেন, এখানকার কয়েকজন-ভাল ভাল লেখক বলেছেন রবিবাবুর translation যদি কেউ করে তাঁরা সেটা দেখে দিতে রাজি আছেন। এখন অবসর আছে—কাজেই অনেক-

গুলো poetry translation করেছি। যদি সুবিধা হয় publish করব। দু-তিন জন publisher এখনি নিতে রাজি আছে।'

সেসব অনুবাদকর্মের সন্ধান নেই। তবু মনে করতে ভাল লাগে, কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথের যে রথযাত্রার শুরু হয়েছিল ইয়োরোপ ভূখণ্ডে, তার নকীব ছিলেন তরুণ সুকুমার রায়! বিদেশে মুদ্রণবিদ্যা সম্বন্ধে পড়তে গিয়ে এই সাহিত্যচর্চার সুযোগপ্রাপ্তির জন্য নিশ্চয় সুকুমারের বিদেশী বন্ধু পিয়ার্সনের উৎসাহ ও আগ্রহ যথেষ্ট কাজ করেছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, সুকুমার রায় ও উইলিয়ম পিয়ার্সনের অকালমৃত্যু ঘটেছিল কয়েকমাসের ব্যবধানে।

১৯১৩র আগস্টে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে ফেরার প্রস্তুতি নিলেন। সুকুমার রায় ১৯১৩র ২৯ আগস্ট তারিখে পিতা উপেন্দ্রকিশোরকে লিখছেন 'রবিবাবুরা বলছিলেন তাঁদের সঙ্গে যেতে—তাঁরা নাকি ইচ্ছা করলে একটা berth আমার জন্য জোগাড় করে দিতে পারবেন। কিন্তু তাঁরা এত শিগগির যাচ্ছেন যে আমার তার মধ্যে কোনকিছু দেখা হবে না—' কিন্তু সুকুমার রায়কেও ফিরতে হল। মনে হয়, সময় বা অর্থের অভাবে নয়, বরং যেহেতু কবির পুত্র ও পুত্রবধূ সেদেশেই সে সময়ে থেকে গেলেন, অতএব সুকুমার রায়ই কবির সহযাত্রী হলেন। আরেকজন ছিলেন সেই ভ্রমণের সাথী, তিনি হলেন কালীমোহন ঘোষ। তবে তিনিও তখন খুব সুস্থ ছিলেন না। সুকুমার রায় ও কালীমোহন ঘোষসহ রবীন্দ্রনাথ ভারতে এসে পেঁছিলেন সেপ্টেম্বর, ১৯১৩।

১৯১৩র ডিসেম্বরে সুকুমার রায়ের বিবাহ হয়। তার কিছুদিন আগেই রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি ঘোষিত হয়েছে। কবিকে তদুপলক্ষে সংবর্ধনা জানাবার জন্য শহরের বিখ্যাত এবং অখ্যাত নাগরিকবৃন্দ স্পেশাল ট্রেনে বোলপুর গিয়েছিলেন। সেখানে সুকুমার রায়ের উল্লেখ পাওয়া যায় না। শান্তিনিকেতনে তাঁর যাতায়াত ছিল যথেষ্ট, তৎসত্ত্বেও এই ঘটনাই স্বাভাবিক। কারণ, আকস্মিক উত্তেজনার মোহ থেকে সুকুমার রায় চিরকাল নিজেকে মুক্ত রেখেছেন।

কবি তারপর কলকাতা এসে শিলাইদহে গিয়েছিলেন। সেখানে সুকুমার রায়ের বিবাহের আমন্ত্রণ গেল। রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে উপেন্দ্রকিশোরকে জানাচ্ছেন যে, পুরস্কার-প্রাপ্তি উপলক্ষে যে অভ্যর্থনার প্লাবন দেখা দিয়েছে তার উত্তেজনা কবিকে ক্লান্ত করেছে। সুতরাং শহরের সেই আবিল আবহাওয়ায় ফেরার বাসনা তাঁর নেই। তিনি দূর থেকেই সুকুমার এবং নববধূকে আশীর্বাদ পাঠাচ্ছেন।

পরবর্তী ঘটনার সাক্ষী ছিলেন সীতা দেবী ঃ

১৯১৩র ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি বোধহয় সুকুমার রায়ের বিবাহ হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে ছিলেন শুনিয়াছিলাম। বিবাহ প্রায় আরম্ভ হইতে যাইতেছে এমন সময় গেটের কাছে করতালিধ্বনি শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইয়া গেলাম। পরক্ষণেই দেখিলাম কবি আসিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। পরে শুনিয়াছিলাম,

এই বিবাহে উপস্থিত থাকিবার জনাই তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সুকুমারবাবুকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।'

সুকুমার রায়ের সহধর্মিণী সুপ্রভা রায় এসেছিলেন কালীনারায়ণ গুপ্তের পরিবার থেকে; সেই বিশাল পরিবারে গানের কণ্ঠ এবং চর্চা ছিল দেশখ্যাত। সুপ্রভা রায়ের গানের গলাও ছিল তারই ঐতিহ্যবাহী, তদুপরি বলিষ্ঠ এবং সুমিষ্ট। বিচিত্র শিল্পকর্মেও সুপ্রভার নৈপুণ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন সুপ্রভা; তাঁর সঙ্গে বহু অনুষ্ঠানে সুপ্রভা রায়ের একক কণ্ঠ যুক্ত হয়েছে বহুকাল।

১৩২১-এর আশ্বিন সংখ্যার 'প্রবাসী' পত্রে সুকুমার রায়ের 'ভাবুকদাদা' প্রকাশিত হল। বিদেশ থেকে ফেরার পরই মনে হয় নাটকটি রচিত হয়েছিল। সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পর এক স্মৃতিকথায় তাঁর সম্পর্কীয় ভগিনী পারুলবালা রায়চৌধুরীর সাক্ষ্যমতে, 'কলকাতায় পৌঁছেই কয়েকদিন পর আমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য গিরিডি গেলে, আমরা দেখলাম তোমার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। তোমার গিরিডি যাওয়ার কয়েকদিন পরেই পূর্ণিমাসম্মিলন এলো। সকলেই ধরলেন, তোমাকে একটা কিছু অভিনয় করতে হবে। তুমি নিজের রচিত লক্ষ্মণের শক্তিশেল ও 'ভাবুকদাদা' প্লে করলে।'

এই নাটকটি সম্বন্ধে এত কথা বলার একটাই কারণ যে, সুকুমার রায়ের বন্ধুজনের মধ্যে এমন মত প্রচলিত ছিল যে, নাটকটির লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ। এমনকি, রবীন্দ্রনাথও নাকি সুকুমারকে জিগ্যেস করেছিলেন যে, 'সুকুমার তুমি যে লিখেছ, 'ভাব এক্কে ভাব, ভাব দুগুণে ধোঁয়া/তিন ভাবে ডিসপেপ্সিয়া ঢেকুর উঠবে চোঁয়া'— আমাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছ কি?' এই স্মৃতি-কথক বিমলাংশুপ্রকাশ রায় অবশ্য সুকুমারের উত্তরটি জানাননি। মনে হয় আমাদের, রবীন্দ্রনাথ নয়, তবে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন অন্ধ অনুগামীদের নিয়েই সুকুমারের 'ভাবুকসভা' নাটকটি রচিত হয়েছে। সাধারণত, সুকুমার রায় তাঁর পরিপার্শ্ব এবং পরিচিতজনেদের নিয়ে কাব্য, বিশেষ করে নাট্য রচনায় দক্ষ ছিলেন। এখানেও তিনি তাঁর বন্ধুজনদের দুর্বলতা নিয়েই ব্যঙ্গ করেছেন অবশ্য, যাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। 'প্রবাসী' পত্রে সমসাময়িককালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একাধিক প্রবন্ধে এমনকি, অনূদিত রচনায় ভাবের প্রতি অত্যধিক পক্ষপাত দেখিয়েছিলেন। সুকুমার রায়ও ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু এবং ভক্ত কিন্তু সেই ভক্তির সঙ্গে থাকত না উচ্ছ্বাস, বরং ছিল বিচার এবং বিশ্লেষণজাত কিঞ্চিৎ সংশয়।

যে-কারণে সত্যেন্দ্রনাথকে নিয়ে পরিহাস করতে পারতেন সুকুমার ঐ একই কারণে প্রমথ চৌধুরীও তাঁর কলমের বিদ্রূপে একবার ছিন্ন হয়েছেন। সেইসঙ্গে এই প্রসঙ্গেও আমাদের মনে রাখতে হয় যে, সুকুমার রায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুজনেরা ছিলেন রবীন্দ্রনাথেরও সহচর। কিন্তু, সেখানে একটি সূক্ষ্ম রেখার ভাগ দেখিয়ে দেয় যে, অজিত কুমার চক্রবর্তী, কালিদাস নাগ, সুশোভন সরকার বা হিরণকুমার সান্যাল কখনোই

রবীন্দ্রনাথকে সমস্ত প্রশ্ন ও সংশয়ের অতীত ভেবে বন্দনা করেননি। তাঁরাই ছিলেন সুকুমার রায়ের সঙ্গী।

পরবর্তী আরেকটি নাটক সম্বন্ধেও একই প্রশ্ন উঠেছিল। সেটি হল 'চলচিত্তচঞ্চরি'।

ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন দল এবং উপদলের মধ্যে আদর্শগত এবং মতবাদগত সংঘাত মনে হয়, এই নাট্যের উপকরণ। সেখানে শ্রীখণ্ডবাবুর আশ্রম এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমকে এক করে দেখতে চেয়েছিলেন কিছু বিদগ্ধ পাঠক। রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ব্রাহ্মসমাজের আওতা থেকে ক্রমশ মুক্ত হয়েছিল। এই পরি-বর্তন অনেকেরই অসন্তোষের কারণ হয়েছিল। তাঁদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন ঠাকুরবাড়িরই এক শরিকের সন্তান, আদি ব্রাহ্মসমাজের ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর; সেই সনাতনী ব্রাহ্ম আমৃত্যু শুধু ধর্মীয় কারণেই রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতনের বিরোধিতা করে গেছেন। 'চলচিত্তচঞ্চরী' নাট্যেও সেই ধরনের ঘটনা রয়েছে। সেখানে আশ্রম, আশ্রমের ছাত্রবৃন্দ, নব্য বিজ্ঞানশিক্ষার আয়োজন, নবীন শিক্ষক এবং সেই আশ্রমের বিরোধিতার 'সাম্যাসিদ্ধান্ত সভা'র জেহাদ, সবই রয়েছে। তবু মনে হয় না যে, শ্রীখণ্ডবাবুর আশ্রমের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সম্পর্ক নিবিড়। অথচ, সুশোভন সরকারের কাছ থেকেই শুনতে পাই, 'শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রম হয়ত শান্তিনিকেতনের গুরুভজা আশ্রমের প্যারডি। শুনেছি রবীন্দ্রনাথ এই নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন।'

শান্তিনিকেতনের উৎসব-অনুষ্ঠানে সুকুমার রায় শুধু নিয়মিত যেতেন না, প্রায় প্রতিবার সবান্ধব কিছু অনুষ্ঠানও উপস্থিত করেছেন। ১৯১৫য় শান্তি-নিকেতন থেকে বোলপুরে ট্রেন ধরবার জন্য, হিরণকুমার সান্যালের অভিজ্ঞতায় জানা যায়, সুকুমার রায়ের নেতৃত্বে তাঁর বন্ধুরা মালপত্র ঘাড়ে নিয়ে মার্চ করতে করতে সারাটা পথ হেঁটে গিয়েছিলেন। এমন সহজ আনন্দময় যুবাকেই তখন শান্তি-নিকেতনে মানাত।

১৯১৭র এপ্রিলে সমাজপাড়ার মেরী কার্পেন্টার হলে রবীন্দ্রনাথ একটি সভায় আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে হাজির ছিলেন। গান, পাঠের পর তিনি অনুরোধ করাতে সুকুমার রায় তাঁহার স্বরচিত 'স্বরবর্ণ ও ব্যাঞ্জনবর্ণ'— নামক একটি মজার কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। রবীন্দ্রনাথ অতঃপর একটি গান গাহিলেন।'

সেই বছরেই শান্তিনিকেতনে কবির জন্মোৎসবে সুকুমার রায় সস্ত্রীক গিয়েছিলেন। সেই দিনটির কথা লিখছেন কালিদাস নাগ, '২৩ বৈশাখ রবিবার সুকুমার প্রভৃতির সঙ্গে বোলপুরে রওনা হওয়া গেল—বহুকাল পরে। প্রায় দুই বছর আগে 'ফাল্গুনী' দেখতে গিছলাম—তারপর এই অচলায়তন দেখতে যাওয়া। বিকালে পৌছে দেখি কবি দিনুবাবুর ঘরে বসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন—সকলকে খুব খাওয়ালেন। তারপর সন্ধ্যায় আশ্রমের ছেলেরা এক বাঙ্গালসভা করলে—নানা প্রদেশের চলতি ভাষায় ঠাট্টা বিদ্রুপ গান চলল—চমৎকার হল—সুকুমার

মৈমনসিংহের বাঙ্গাল, সভাপতি হলেন।' সীতা দেবীর স্মৃতিকথায় আরও বিস্তৃত বিবরণ মেলে, "একটি ছোট ছেলে আসিয়া খবর দিল যে, 'বাঙাল সভা' হইবে। বাঙাল সভার নাম ইতিপূর্বে শুনিয়াছিলাম, তবে কোনো অধিবেশনে কখনও উপস্থিত থাকি নাই।...

খোলা মাঠেই সভা হইতেছিল। মেয়েরা ও মান্যগণ্য অতিথিবর্গ তক্তপোষে বসিলেন, ছেলের দল বসিল মাটিতে শতরঞ্চি বিছাইয়া। সর্বসম্মতিক্রমে সুকুমারবাবু সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করিলেন যে সুকুমারবাবুর পত্নী শ্রীমতী সুপ্রভাকেই সভানেত্রী করা হোক, কারণ আজন্ম কলিকাতায় বাস করিয়া সুকুমারবাবুর বাঙালত্ব খানিকটা লোপ পাইয়াছে। কিন্তু সুপ্রভা রাজী না হওয়াতে সুকুমারবাবুই সভাপতির পদে বহাল রহিলেন। সভার কার্যতালিকা বেশি বড় ছিল না। একটি গল্প, একটি বিজ্ঞাপন ও একটি রিপোর্ট পড়া হইল, সবই বাঙাল ভাষায়। দুইটি গান হইল, একটি বাঙাল ভাষায়, অন্যটি সাধারণ বাংলা ভাষায়। সভার কার্য যথাসম্ভব বাঙাল ভাষাতেই হইতেছিল।...বক্তাদিগের ভিতর নাম মনে পড়ে দুইজনের, শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি।... রবীন্দ্রনাথকেও সভাপতি অনুরোধ করিলেন তাঁহার মামার বাড়ির ভাষায় কিছু বলিতে। রবীন্দ্রনাথ অসম্মতি জানাইয়া বলিলেন, খুলনার ভাষার মাত্র দুইটি কথা তিনি জানেন, তাহাতে বক্তৃতা দেওয়া চলে না। সে-কথা দুটি হইতেছে, 'কুলির অম্বল ও মুগির ডাল'। অতঃপর সভাপতি তাঁহার অভিভাষণ দিলেন অতি কষ্টে। বেশ পুরাপুরি বাঙাল ভাষা হইল না।'

তারপর, সভা-অন্তে 'শ্রীমতী সুপ্রভা সুগায়িকা, কবি তাঁহাকে নূতন গান শুনাইবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।' তারও পরে, কালিদাস নাগের রোজনামচায় দেখা যাচ্ছে, বেণুকুঞ্জে ফিরে এসে প্রায় রাত ১২টা পর্যন্ত সকলে জ্যোৎস্নায় পড়ে ২ হল্লা করা—সারারাত আধা ঘুম আধা জাগরণে কেটে গেল।'

সেবারই চব্বিশে বৈশাখ শান্তিনিকেতনে 'বেণীসংহার' নাটকের একটি অঙ্ক অভিনীত হল।

তারপরে, সভাস্থ সকলের অনুরোধে সুকুমার রায় তাঁর 'শব্দকল্পদ্রুম' নাট্যটি সংগীত-সহযোগে পাঠ করলেন ; গানগুলি করেছিলেন সুকুমার রায়ের সহচরেরা।

শুধু শান্তিনিকেতনে নয়, কলকাতায়ও কবির সঙ্গে সুকুমার রায়ের নিয়মিত যোগাযোগ হত। মে মাসের মাঝামাঝি সুকুমার রায় সদলে অর্থাৎ শিশিরকুমার দত্ত, অমল হোম, কালিদাস নাগ সহ জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলেন, শুনলেন তাঁর মুখে প্রবন্ধ 'হোয়াট ইজ আর্ট' এবং তারপরেও রাত প্রায় সাড়ে নটা পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সদ্যরচিত লেখাও সবান্ধবে পড়তে ভালবাসতেন সুকুমার : 'কলেজের পর প্রশান্তর ঘরে এসে সুকুমার আমি ও প্রশান্ত তিনজনে মিলে অচলায়তন পড়া গেল।'—কালিদাস নাগ (১৭ আগস্ট ১৯১৭)।

সেবার কলকাতার জোড়াসাঁকোয় 'বিচিত্রা'র বৈঠকে কবির 'বৈকুণ্ঠের খাতা'

মঞ্চস্থ হল। প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, অভিনেতাদের অনেকের সংলাপ কণ্ঠস্থ ছিল না কিন্তু তাৎক্ষণিক স্বরচিত সংলাপ-যোগে অভিনেতাদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার ভাব দেখা গিয়েছিল। কেদারের ভূমিকায় ছিলেন সুকুমার রায়, বৈকণ্ঠ হয়েছিলেন গগনেন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথ হলেন তিনকড়ি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'স্টেজ-ম্যানেজার'। সীতা দেবীর কথায়, 'কেদারের ভূমিকায় সুকুমারবাবুর নিকট মুখভঙ্গি এখনও যেন চোখের সম্মুখে দেখিতে পাই।' পরের বছরও সুকুমার রায় সবান্ধব শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন; অনুষ্ঠান উপলক্ষে নয়, তবে উৎসবে। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস' কাটাতে গিয়েছিলেন। উৎসবের পরিকল্পনাটি ছিল অভিনব।

তার পরেও সুকুমার রায়রা তিন-চার দিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। 'এ চারদিনই গান গল্প কবিতাপাঠ প্রভৃতি একটানা চলিত। দিন দুই "শারাড নাটাও" হইল। যাত্রার দিন বার তিন-চার ইচ্ছা বা অনিচ্ছাপূর্বক ট্রেন ফেল করিয়া, শেষে সত্য সত্যই তাঁহারা চলিয়া গেলেন।' আবার পৌষ-উৎসবে আশ্রমিকদের সঙ্গে মিলে সুকুমার রায় 'অদ্ভুত রামায়ণ' গান করলেন।

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সুকুমারের এমনতর স-প্রীত সম্পর্ক এইখানেই সমাপ্ত হয়নি, তাঁর মৃত্যুর পরও পারিবারিকক্ষেত্রে সেই সম্বন্ধ বলবৎ ছিল।

শান্তিনিকেতনে নূতন 'প্রেস' বসানোর পর একজন আশ্রমিককে রবীন্দ্রনাথ সুকুমার রায়ের কাছে মুদ্রণ-সংক্রান্ত কাজ কিছু শেখার জন্য পাঠিয়েছিলেন। একটি তারিখ বিহীন চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন:

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এই আনাড়ি আশ্রমের জন্যে প্রেস তদন্ত করতে যাচ্ছে। তুমি যদি কর্ণধারের কাজ কর তাহলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকি। আজকাল যে রকম বিষম টানাটানি তাতে ঠকবার মত মার্জিন কিছুই হাতে নেই—বরঞ্চ ঠকাতে পারলে কাজে লাগে। তোমরা ৭ই পৌষে আসচ ত?

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯২০তে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সদস্য করার প্রস্তাব আনা হল। নবীন ও প্রবীণে প্রবল বিরোধ বাধল। এমনকি মাঘোৎসবের সময় যে কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন হওয়ার কথা, সেটি জানুয়ারি মাস থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত প্রলম্বিত হল। সুশোভন সরকার স্মৃতিচারণে বলছেন, 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আবার ভাঙে আর কী। তখন বয়স্কদের আর তরুণদের দুটো গোষ্ঠী হয়ে গিয়েছিল। তরুণদের পক্ষ থেকে সাধারণত প্রস্তাব উত্থাপন করতেন তাতাদা, আর তাঁকে সমর্থন করতেন প্রশান্তচন্দ্র।...শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা একটা deadlock এ পৌঁছে গেল। split প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াল। ১৯২১-এর জানুয়ারীতে

তাতাদার নেতৃত্বে তরুণদল স্থির করেন যে, সমাজের মাঘোৎসবে তাঁরা যোগ দেবেন না, আলাদা উৎসব শুরু হয়েছিল।'

সুকুমার রায়ের একরোখা, সংগঠক এবং যোদ্ধৃ মনোভাব সে সময়ে দেখা গিয়েছিল। তার প্রেক্ষিতে অন্যতর একাধিক কারণ থাকতে পারে, কিন্তু সংঘর্ষের কেন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ-বিষয়ে অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস আলোচনা করেছেন, অতএব তার বিস্তৃত বিবরণ দান এখানে বাহুল্য হবে।

তথাচ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি সীতা দেবীর মন্তব্য কারণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এই ঘটনা এক দীর্ঘ দগ্ধ রেখা চিহ্নিত করে দিয়ে গেছে : রবীন্দ্রনাথ সম্মানিত সভ্য হইলেন অধিকাংশ সভ্যের ভোটে। প্রবীণরা অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। বিশ্বের বরণীয় মহাপুরুষকে একটা সাধারণ সম্মান দেখাইতে ইহাদের কেন যে এত আপত্তি ছিল, তাহা তখনও বুঝিতে পারি নাই, এখনও পারি না। ইহা লইয়া সমাজে ও অনেকের পারিবারিক জীবনেও কত যে ঝগড়াঝাঁটি হইয়া গেল তাহার ঠিকানা নাই।'

প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথকে লেখা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের ১৯২১-এর ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখের এক সুদীর্ঘ চিঠির স্বল্পাংশ উদ্ধার করি :'·· আপনার মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে ব্রাহ্মসমাজ আপনার বিরুদ্ধে। আপনার কাছে শুনে আমাদের নিজেদের মনেও মাঝে মাঝে সন্দেহ হত। কিন্তু এবার ভাল করেই বুঝলাম যে এই ধারণা কিরকম ভুল।···70%-এর-উপর ভোট স্বপক্ষে এসেছিল—এত বিরোধ সত্ত্বেও।

নেতৃস্থানীয় জনকয়েক লোকে যদি এরকম একটা কাণ্ড না বাধিয়ে দিতেন তবে 95%vote যে স্বপক্ষে হত তাতে আমাদের সন্দেহ নেই।' প্রশান্তচন্দ্র এই উপলক্ষে প্রকাশ করেন এক পুস্তিকা, 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই'। সেখানেই দেখা যাচ্ছে যে, পত্ররচনা করেছেন যুগ্মভাবে সুকুমার রায় এবং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এবং বর্ণনাপত্রের দায়িত্বও দুজনে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছেন।

এর কিছুকাল পরে সুকুমার রায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দীর্ঘকাল তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন তখনও 'সন্দেশ' সম্পাদনা করছেন, কবিতা লিখছেন, ছবি আঁকছেন। কিন্তু তাঁর পরম শান্তি আর সান্ত্বনার আকর ছিল রবীন্দ্রনাথের গান। মাঝেমধ্যে রবীন্দ্রনাথ রুগ্ন তরুণ বন্ধুকে দেখতে আসতেন। ১৬ মার্চ (১৯২২) অনেক রাতেও এসেছেন। হিতেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর একটি অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় জানা যাচ্ছে, 'একদিন সন্ধ্যাবেলা গিয়ে দেখি রবিবাবু দাদাকে গান শোনাচ্ছেন। গানগুলি দাদাই বেছে নিয়ে ওঁকে গাইতে বলেছেন। সেসব গান রবিবাবুর নিজেরই রচনা। কবি গাইছিলেন—

"সকল দুখের প্রদীপ জেলে দিবস গেলে করব নিবেদন আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন"। মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও শেষবার কবি এলেন সুকুমার রায়কে দেখতে। খুল্লতাত-ভগিনী মাধুরীলতা রায়েরও অপ্রকাশিত লেখায় দেখা যাচ্ছে,

[১৯২৩] "২৯ শে আগস্ট অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল। সেদিন রবিবাবু দাদাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। দাদা তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং পরে তাঁহার গান শুনিতে চাইলেন। রবিবাবু দাদার পার্শ্বে বসিয়া দাদা যে সকল গান শুনিতে চাহিলেন, সেই সকল গান গাহিতে লাগিলেন। গানের পর গান চলিল সকলে তন্ময় হইয়া গান শুনিতে লাগিল। তখন দাদার প্রশান্ত মুখখানি দেখিয়া মনে হইতেছিল যে তিনি পরম শান্তি লাভ করিয়াছেন। একটি বিশেষ গান সকলকে অত্যন্ত বিস্মিত করিয়াছিল সেটি এই—"দুঃখ এ নয় সুখ নহে গো গভীর শান্তি এ যে।"

সেইদিনের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথও জানিয়েছেন, ১০ সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতন মন্দিরে আচার্যের ভাষণে। সেই উপাসনার উপলক্ষ ছিল সুকুমার রায়ের প্রয়াণে তাঁকে শ্রদ্ধায় স্মরণ।

রবীন্দ্রনাথ, তাঁর বহুধাবিচিত্র ব্যক্তিত্ব, তাঁর সৃষ্টি, বিশেষ করে তাঁর গান এবং নাটকের প্রভাব ছিল সুকুমার রায়ের উপর। কিন্তু সেই প্রভাব কখনই সুকুমার রায়ের সর্বগ্রাসী হয়নি বা তাঁর কাছে সংশয়াতীত ছিল না, তার কারণ সুকুমার রায়ের আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনীষা। রবীন্দ্রনাথ সহজেই ধরতে পেরেছিলেন যে, সুকুমার রায় তাঁর বন্ধু; নির্বিবাদী ভক্ত হতে পারেন না। সুকুমারের নাট্যরচনার উপকরণ যে তাঁর পরিচিত জগৎ থেকেই আহৃত হত সেকথাও তিনি জানতেন আর হয়ত সে-কারণে 'ভাবুকসভা' বা 'চলচিত্তচঞ্চরী' নিয়ে কবিরও কৌতুহল ছিল। ১৩২৪ সালের ৬ কার্তিক, সুপ্রভা রায়কে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য সংবাদ জানাবার পর প্রশ্ন করছেন, 'সুকুমার ওদিকে আসর জমিয়েছে কেমন? নতুন পালার সৃষ্টি হচ্ছে কি?' নিশ্চয় এই প্রশ্ন সরলচিত্তের কৌতূহল মাত্র!

সুকুমার রায়ের কিছু রচনায় রবীন্দ্রনাথের কৌতুক নাট্যের যে ছায়া তার মধ্যে আমাদের মনে হয়, 'আর্য ও অনার্য'র সংলাপের মতই কি চকিতে কথা বলে ওঠে না হ য ব র ল-র হিজিবিজ্‌বিজ্! কিংবা 'সূক্ষ্মবিচার' থেকেই কি আহৃত হয়েছে 'অবাক জলপানে'র কোনো সংলাপ। 'গন্ধবিচার'-এর পূর্বসূরী কি 'হিং টিং ছট্'। এ-সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় আলোচনা আছে শঙ্খ ঘোষের 'অসম্ভবের ছন্দ' রচনায়।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের প্রতি নিবেদিতচিত্ত ছিলেন না সুকুমার রায়, এমন কি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কবির সদস্যপদভুক্তির জন্য সুকুমার রায়ের আন্দোলন ছিল উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য সমাজের সংস্কার আর সেখানে গতিশীল স্বভাবের সঞ্চার করা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি সুকুমার রায়ের মমত্ববোধ ছিল নিঃসংশয়িত। সেই বিদেশে যখন ছিলেন, ১৯১২-র ১ মে ম্যাঞ্চেস্টার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক ভোজসভায় সুকুমার রায় যখন গান করলেন তখন তাঁর নির্বাচন ছিল রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত, 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে'। একটি চিঠিতে সেই খবর দিয়ে জানাচ্ছেন, 'এর আগেও আমাদের এক Social এ গান করেছিলাম। এতেই গাইয়ে বলে আমার ভয়ানক নাম হয়ে গিয়েছে।'

ব্রাহ্মসমাজের ঊষাকীর্তনে যখন যোগ দিতেন, তখন সকলের আগে থাকতেন সুকুমার রায়, আর তাঁরই নির্বাচন ছিল রবীন্দ্রনাথের গান, 'আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে'।

রবীন্দ্রনাথের গান-শিক্ষার দলে একদা ছিলেন সুকুমার, শিখেছিলেন 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী'। রবীন্দ্রনাথের গানের সর্বতোশায়ী প্রভাব পড়েছিল সুকুমার রায়ের স্বভাবে এবং সৃষ্টিতেও। 'মনডে ক্লাব'-এর আমন্ত্রণপত্রে দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের গানের প্যারডি, 'মেঘ বলেছে যাব যাব' গানটির অনুকরণেই রচিত ঃ

কেউ বলেছে খাবো খাবো
কেউ বলেছে খাই,
সবাই মিলে গোল তুলেছে—
আমি তো আর নাই।
ছোটকু বলে 'রইনু চুপে
কমাস ধরে কাহিল রূপে,'
জংলি বলে 'রামছাগলের
মাংস খেতে চাই।'
যতই বলি 'সবুর কর', কেউ
শোনে না কালা।
জীবন বলে কোমর বেঁধে
'কোথায় লুচির থালা?'
খোদন বলে রেগেমেগে
চলে যেতে চাই।

চলচ্চিত্তচঞ্চরী-র সমাপ্তি সংগীতও নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের 'বাজে বাজে রম্য বীণা বাজের' অনুযায়ী

সংসার কটাহ তলে জ্বলে রে জ্বলে!
জ্বলে মহাকালানল জ্বলে জ্বল জ্বল,
সজল কাজল জ্বলে রে জ্বলে।
অলক তিলক জ্বলে ললাটে,
সোনালী লিখন জ্বলে মলাটে,
খেলে কাঁচা কচু জ্বলে চুলকানি
জ্বলে রে জ্বলে!

তবে নিছক 'প্যারডি' হিসেবে সবচেয়ে স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ববীনারবে বিশ্বজন মোহিছে' গানের অনুকরণে সুকুমার রায়ের রচনাটি ঃ

বৃষ্টি বেগভরে রাস্তা গেল ডুবিয়ে
ছাতা কাঁধে জুতা হাতে নোংরা

ঘোলা কালো
হাঁটুজল ঠেলি চলে যত লোক।
রাস্তাতে চলা দুষ্কর মুস্কিল বড়
অতি পিচ্ছিল অতি পিচ্ছিল
অতি পিচ্ছিল
বিচ্ছিরি রাস্তা।
ধরণী মহাদুর্দম কর্দমগ্রস্তা
যাওয়া দুষ্কর মুশকিল রে ইস্কুলে
সর্দি জবুথুব বড় নিত্যি লোকে বদ্যি ডাকে
তিক্ত বড়ি খায়।

কিন্তু 'প্যারডি' নয়, স্বচ্ছন্দ সশ্রদ্ধ অনুসরণের স্বাক্ষর রয়ে গেছে ১৯১৮-য় সুকুমার রায় রচিত দুটি ব্রহ্মসংগীতে। একটি হল, 'প্রেমের মন্দিরে তাঁর আরতি বাজে': ভৈরবীতে নিবদ্ধ গানে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'ছিল যে পরানের অন্ধকারে'। দ্বিতীয়টি ''নিখিলের আনন্দগান এই প্রেমেরি যুগলবন্দনায়' গানটির বন্দেশ সম্পূর্ণভাবে' শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে' গানে প্রভাবিত। সেইসঙ্গে একটি ঘটনাও উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৫ সালে শান্তিনিকেতনে হৈ হৈ সংঘের বার্ষিক উৎসবের প্রয়োজনে চুয়াত্তর বছরের রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় সুর দিয়েছিলেন; কবিতাটি হল সুকুমার রায়ের লেখা 'গানের গুঁতো'।

সুকুমার রায়ের প্রয়াণের পর রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ এবং সতর্ক দৃষ্টি ছিল তাঁর বিধবা সহধর্মিণী সুপ্রভা রায়ের প্রতি। বারবার স্বসন্তান সেই প্রতিভাময়ী রমণীকে কাছে আনতে চেয়েছেন, কখনও-বা শান্তিনিকেতনে ধরে রেখেছেন তাঁকে, অজস্র গান লিখে লিখে তাঁকে শিখিয়েছেন। বৃদ্ধ কবির অনুজ্ঞাক্রমে সুপ্রভা রায় তাঁর একতম সন্ততিকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়েছেন।

বহুকাল পরে, সুকুমার রায়ের কিছু গল্প সংগ্রহ করে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হল, তার নাম হল 'পাগলা দাশু'। সুপ্রভা রায়ের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ সেই বইটির ভূমিকা লিখে দিলেন: সুকুমারের লেখনী থেকে যে অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎসধারা বাংলা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে তা অতুলনীয়। তাঁর সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দ গতি, তাঁর ভাব সমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা পদে পদে চমৎকৃতি আনে। তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল সেইজন্যেই তিনি তার বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরেছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে ব্যঙ্গ রসিকতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আরো কয়েকটি দেখা গিয়েছে কিন্তু সুকুমারের অজস্র হাস্যোচ্ছাসের বিশেষত্ব তাঁর প্রতিভার যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে তার ঠিক সমশ্রেণীর রচনা দেখা যায় না। তাঁর এই বিশুদ্ধ হাসির দানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অকাল মৃত্যুর সকরুণতা পাঠকদের মনে চিরকালের জন্য জড়িত হয়ে রইল।

একথা সুকুমার রায় ছাড়া আর কোনো কবি সম্বন্ধে কথিত হতে পারে না।

এবং রবীন্দ্রনাথই হয়ত একমাত্র পারেন বিশ্লেষণনৈপুণ্যে সুকুমার রায়ের প্রতিভার স্বভাবটি আবিষ্কার করতে। কিন্তু সমস্ত রচনাটিই সেই সঙ্গে আমাদের বিস্মিত এবং কিছু বেদনাহত করে এই কারণে যে, লেখাটি নিরেটভাবেই 'ভূমিকা' মাত্র, বড় নৈর্ব্যক্তিক, কোথাও যেন দুই কবির একদা-ঘ নষ্ঠ সংযোগসূত্রের রেখাটিও দেখা যায় না। অগ্রজ সাহিত্যিকের এই পত্র যেন এক উত্তরসাধকের পরিচিতি-পত্র মাত্র।

অবশ্য রবীন্দ্রজীবন-পাঠক মাত্রেই একথা জেনে থাকতে পারেন যে, নেহাৎ ভক্তদেরও ঘনিষ্ঠতা কবি অধিক দিন সহ্য করতে পারতেন না।

সমালোচনা বা প্রশ্ন সম্বন্ধেও তিনি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিলেন। তাছাড়া দীর্ঘ অদর্শনও রবীন্দ্রনাথের মনে কিছু বিস্মৃতি আনত। অজিতকুমার চক্রবর্তীর প্রশ্ন এবং বিশ্লেষণ অপেক্ষা অনেক বেশি অনুরাগী ছিলেন সতীশচন্দ্র রায়ের আবেগতপ্ত ভক্তির। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এটাই সম্ভব যে পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্র-নাথ দত্তকে একাধিকবার স্মরণ করলেও সুকুমার রায়ের নামোল্লেখ করেননি। অথচ 'ছড়া' বিশেষত 'খাপছাড়া'র অনেক লেখাতেই সুকুমার রায়ের অনুষঙ্গ মনে পড়ে যায়। সেখানেই সুকুমার রায়ের আ.রক কীর্তি: কবির অন্তিমবয়সের সৃষ্টিতে নিজের প্রচ্ছন্ন অথচ গভীর এক প্রভাবের স্বাক্ষর রেখে দিতে পেরেছেন।



বিজ্ঞান-কর্মী সুকুমার

সিদ্ধার্থ ঘোষ

॥ ১ ॥

খেলার ছলে ষষ্ঠীচরণ যখন তখন হাতি লুফতেন। তার চেয়েও ভারী ও গম্ভীর চিন্তা-ভাবনা নিয়ে লোফালুফি করেছেন সুকুমার। অবলীলায়। তাঁর খেয়াল-খুশি-খাপছাড়ার সৃষ্টিলোকে গুরুভার বাস্তবের অসংগতিগুলোও নেহাতই হালকা আর ঠুনকো। সুকুমারের ননসেন্স জগৎটা যেমন হাসায় তেমনি হাসার পরে ভাবায়, হাসির কথা নয় বুঝেও হাসছি কেন? সুকুমার রায়ের অনন্য সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অন্তর্গত এই প্যারাডক্সের ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল সেই জন্যেই তিনি তার বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরেছিলেন।' (ভূমিকা, পাগলা দাশু, ১৯৪০)।

'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি সিরিয়াস প্রবন্ধে ও 'সন্দেশ'-এর কিশোরোপযোগী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু রচনায় সুকুমার স্পষ্ট কথার মানুষ। এ-সব লেখাও অতি সরস, কিন্তু খেয়াল রসের ঠাঁই নেই এখানে। লেখাগুলি পড়লে বোঝা যায় বিজ্ঞান-সম্মত শক্তপোক্ত এক জোড়া ডানা ছিল বলেই তিনি অবাধে কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করেছেন—সৃষ্টির ও লৌকিক জগতের নিয়মকানুন জানতেন বলেই সৃষ্টিছাড়াদের তিনি বাধ্য করেছেন উল্টো নিয়মের বশ্যতা স্বীকার করতে। সুকুমারের ভাষাতেই বলি, 'অবাস্তবকে কতকগুলি জ্ঞানত বাস্তবের রূপান্তর বা নূতন রকমের সমাবেশ রূপেই ("ইন্ টার্ম'স অফ নোন্

রিয়ালিটিজ'') আমরা কল্পনা করিয়া থাকি। সুতরাং "অলৌকিক রসের অবতারণা" করিতে হইলে লৌকিক জ্ঞানটা একটু বিশেষ মাত্রায়ই আবশ্যক।' (ভারতীয় চিত্রশিল্প)।

লৌকিকের জ্ঞানটা সত্যই বিশেষ মাত্রায় ছিল তাঁর। দুটি বিষয়ে অনার্স নিয়ে বি এস সি পাস করার বা গুরুপ্রসন্ন ঘোষ স্কলারশিপ অর্জন সূত্রে লণ্ডনে ও ম্যাঞ্চেস্টারে মুদ্রণশিল্পে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার প্রসঙ্গ আপাতত বিবেচনার বাইরে রেখে মাত্র পারিবারিক পরিবেশের কথা আলোচনা করলেও সুকুমারের মনোজগতের বৈজ্ঞানিক গঠনের কিছু খবর পাওয়া সম্ভব।

পিতা উপেন্দ্রকিশোর যদি ছোটদের জন্য একটি অক্ষর না লিখতেন, ছবি না আঁকতেন, সংগীত-চর্চায় ব্রতী না হতেন, তবু শুধু যন্ত্রকুশলী ও বিজ্ঞানী হিসাবেও তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হত। প্রসেস ক্যামেরার কাজে অর্থাৎ প্রচলিত ভাষায় হাফটোন ছবি ছাপা সংক্রান্ত ক্যামেরার কাজে উপেন্দ্রকিশোরের মৌলিক গবেষণা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। আশৈশব সুকুমার দেখে আসছেন বাড়িতে হাফটোন ব্লক নির্মাণের কর্মকাণ্ড। বড় বড় প্রসেস ক্যামেরা, কাচের ছাতওলা ডার্করুম, সাদা সাদা চৌকো ডিশ আর হরেক শিশিবোতল যন্ত্রপাতির রাজ্যে যেখানে লাল কাচ গলে আলোরা জুড়ে দিত আবছায়ার খেলা। তাঁর দিদিমা কাদম্বিনী গাঙ্গুলি নাম-করা ডাক্তার। দিদিমার তালা-বন্ধ ঘরের মধ্যে অন্ধকারে দোল খেত আস্ত একটা মানুষের কঙ্কাল। পিসেমশাই হেমেন্দ্রমোহন বসু তো কলকব্জা অন্ত প্রাণ। তাঁর ল্যাবরেটরিতে তৈরি হত কুন্তলীন তেল, দেলখোস সেন্ট ইত্যাদি আর ৪১ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটের 'মার্বেল হাউস'-এর শো-কেসে সাজানো ছিল ধুতরো ফুলের মতো চোঙওলা গ্রামোফোনের পূর্বপুরুষ ফোনোগ্রাফের নানা মডেল। রুটি বেলার বেলুনের আকারের মোম-মাখানো লোহার সিলিণ্ডার ছিল এই যন্ত্রের রেকর্ড। তাদের গায়ে পাকে পাকে এবড়ো খেবড়ো সূক্ষ্ম রেখা কেটে বন্দী হত হাসি কথা গান। বাইসাইকেল আর মোটরগাড়ি নিয়েও কারবার ফেঁদেছিলেন হেমেন্দ্রমোহন।

উপেন্দ্রকিশোরের হাত থেকেই টেলিস্কোপ গ্রহণ করে সুকুমারের দৃষ্টি বালক বয়সেই গ্রহ উপগ্রহ পেরিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী কালে সুকুমারের লেখা 'গ্যালিলিও'র জীবনীতে পড়ি, 'চাঁদের উপর দূরবীণ কষিয়া দেখা গেল, তার সর্বাঙ্গে ফোস্কা!' আবার 'চলচিত্তচঞ্চরী'তে ভবদুলাল বলছে, 'ওঁদের আশ্রমে একটা দূরবীন আছে—তার এমন তেজ যে চাঁদের দিকে তাকালে চাঁদের গায়ে সব ফোস্কা ফোস্কা মতন পড়ে যায়। বোধহয় থাউজ্যাণ্ড হর্স-পাওয়ার কি তার চাইতেও বেশি হবে।'

চাঁদের গায়ে 'ফোস্কা' দেখেছিলেন সুকুমার তাঁর লৌকিক চোখ দিয়ে তারপর কার্যকারণ সম্পর্কটা উল্টে দিতেই তেজী (powerful) একটা দূরবীন তাক্ করার জন্যই যেন ঘটে গেল অনর্থ, চাঁদের পিঠে সেই কারণেই পড়ল

ফোস্কা। ভাষা-বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী সুকুমারের সঙ্গে আবোল-তাবোলের রূপকারের অভিন্নতাও লক্ষণীয়। অর্থ-অনর্থ নিয়ে তাঁর চেতনার মধ্যে ছায়া পড়েছে ভাষার উৎপত্তি, প্রয়োগ ও ব্যবহারবিধিজনিত বৈজ্ঞানিক মননের। 'ভাষার অত্যাচার' ও 'ভারতীয় চিত্রশিল্প' প্রবন্ধে সুকুমারের রচনায় আধুনিক 'সেমিওলজি' (Science of Signs) বিদ্যার পূর্বাভাষ রয়েছে। তিনি লিখেছেন, ভাষা 'নির্দিষ্ট শব্দ বা তৎসূচক চিহ্নাদি দ্বারা ভাব বিনিময়ের সাঙ্কেতিক উপায় মাত্র।...' 'বস্তু বা ভাব বা তৎসূচক ভাষাগত সঙ্কেতের মধ্যে কোন সম্পর্ক বা সৌসাদৃশ্য দেখা যায় না।' বর্ণ ও ধ্বনি যোগে ভাষা সৃষ্টি হয়েছিল কিছু ব্যবহারিক তাগিদ থেকে। উদ্দেশ্যের কথা ভুলে, উপলক্ষ্য স্বরূপ বিমূর্ত বস্তুকে অভ্যাস-বশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে স্বয়ংসিদ্ধ করে তোলার পরে কি বিপত্তি বাধে সুকুমার তার রাশি রাশি উদাহরণ রেখেছেন তাঁর খেয়ালরসের জগতে। উদ্দেশ্য ভুলে উপলক্ষ্য-সর্বস্বতা। কি সমাজজীবনে, কি বিজ্ঞানজগতে, সুকুমারের কৌতুক ও পরিহাস তাকে বিদ্ধ করেছে আর তাঁর সিরিয়াস প্রবন্ধ পেশ করেছে তার ব্যাখ্যা। এই মননশীল প্রবন্ধগুলি রচনার কাল থেকেই 'আবোল তাবোল'-এর অবিস্মরণীয় সৃষ্টির শুরু হয়েছিল।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধিৎসা তাঁর পরিহাসপ্রিয় মনটাকে কিছু রসদ যুগিয়েছিল। বাংলা ভাষায় এক-একটি ক্রিয়াপদ কত ভিন্ন ভিন্ন ফরমাস খাটে তার পরিচয়জ্ঞাপক দুটি সুকুমার ছত্র ঃ

ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম দেখে লাগে খট্‌কা—
ফুল ফোটে ? তাই বল ! আমি ভাবি পট্‌কা।

ফুল ফোটাকে শুধু শব্দে জব্দ করেন নি, লাজুক ফুলটি যে কাজ অলক্ষ্যে সাঙ্গ করে, তা তিনি নিমেষে সেরেছিলেন। সুকুমার কিন্তু সত্যিই চটপট ফুল ফুটতে দেখেছিলেন। 'বায়োস্কোপ' নিবন্ধে তিনি লিখছেন, 'বায়োস্কোপে যদি তার [ফুল ফোটার] ছবি তোল, এক-এক দিনে দশ বারোটা বা পঁচিশ ত্রিশটা করে আর দেখবার সময় চট্‌পট্ দেখিয়ে যাও—তাহলে দেখবে যেন চোখের সামনেই দেখতে দেখতে গাছ গজিয়ে বেড়ে উঠছে আর ফুল ফুটছে।'

'বায়োস্কোপ' নিবন্ধটি সন্দেশ-এ ১৩২৭ সালের ভাদ্র সংখ্যায় আর উদ্ধৃত কবিতাটি তার পরের মাসে প্রকাশিত হয়েছিল।

লাল গানে নীল সুর দিয়েছিলেন সুকুমার। হাসি হাসি গন্ধের কথা বাদ দিলে এই দুরন্ত কল্পনার পিছনে বিজ্ঞানের ইঙ্গিত অস্বীকার করা যায় না। শব্দকে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গে রূপান্তরিত করা যায়। আর আলো তো প্রকৃতই বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ, নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে যে তরঙ্গের দৈর্ঘভেদে লাল, নীল ইত্যাদি রামধনুর সাতটি রঙকে আমরা স্বতন্ত্রভাবে অনুভব করি। উপেন্দ্র-কিশোরও সংগীত ও বর্ণের তুলনা করে লিখেছিলেন, 'ভাবিয়া দেখিলে সংগীত ও

চিত্রবিদ্যার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।···দুই বিষয়ের দুইটি মূল— শব্দ ও বর্ণ (আলোক), তরঙ্গের রাজ্যে ইহারা প্রতিবেশী। এই তরঙ্গমূলকত্বই ইহাদের ঘনিষ্ঠতার কারণ বলিয়া বোধ হয়।···সাত সুর; সাত রঙ।'

সুকুমারের খেয়ালরসের জগৎ আর তাঁর বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সংস্কৃতির মধ্যে কোন সরলরেখা টেনে সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা অভিপ্রেত নয়। 'আবোল তাবোল' বা 'হ য ব র ল' উপভোগ করতে কোন ভূমিকার প্রয়োজন নেই বলব না, বলব তা অবশ্য বর্জনীয়।

ননসেন্স-স্রষ্টা সুকুমারের বিচিত্র মনোজগতের, তাঁর সৃজনশীলতার বিস্ময়কর রহস্যের আকর্ষণেই আমরা নানা ব্যাখ্যা জুড়ি নিজেদেরই তাগিদে। ব্যক্তি মানুষটিকে নিয়ে, তাঁর শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, মতামত ইত্যাদি অবলম্বনে এই প্রয়াস কিন্তু শেষ বিচারে আরোপিত মন্তব্য। যা সৃষ্ট সাহিত্যবিচার থেকে উৎসারিত নয়। কার্য-কারণের সম্পর্কটিকে যান্ত্রিকভাবে অতি-সরলীকৃত করে হয়ত কোন প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করা সহজ হয় কিন্তু এ বিষয়েও স্বয়ং সুকুমার আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পরাকাষ্ঠা অনেক ক্ষেত্রে স্বয়ং বিজ্ঞানকেও দৈববাদের বাঁধনে জড়িয়ে ফেলতে পারে: 'বৈজ্ঞানিক ও অদৃষ্টবাদী কার্যকারণের সকল সম্বন্ধকে অঙ্কের হিসাবে মিলাইয়া দেখায় যে, প্রত্যেক কার্য, প্রকারে ও পরিমাণে উপযুক্ত কারণ হইতে প্রসূত। প্রত্যেক কারণ নির্দিষ্ট পরিমাণ ও নির্দিষ্ট প্রকারের কার্যফল প্রসব করে। প্রত্যেক নির্দিষ্ট "কজ" হইতে নির্দিষ্ট "এফেক্ট" উৎপন্ন হয়, কোথাও তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। এই মুহূর্তে ইহলোকে যেখানে যাহা ঘটিতেছে তাহা পূর্ব মুহূর্তে অকাট্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল।' (দৈবেন দেয়ম্)।

সন্দেশ-সম্পাদক হিসাবে রচিত শিক্ষামূলক নিবন্ধগুলি থেকে বরং বিজ্ঞানী কারিগর সুকুমারকে সহজে চিনতে পারা যায়। এই নিবন্ধগুলিতে তিনি বিজ্ঞান ও কারিগরি জগতের ইতিহাস ও নিত্যনতুন দিগ্বিজয়ের সংবাদ ও নেপথ্যকাহিনী পরিবেশন করেছেন। কিশোর মনকে আকৃষ্ট করা, তাদের কৌতূহলী করে তোলাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সাদামাটা এই রচনাগুলি কয়েকটি কারণে আজও বিশিষ্ট এবং মাত্র গবেষকদের গণ্ডীর মধ্যেই তার আদর ফুরোয় না।

বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের ইতিহাসে কারিগরি বিষয়ে, যন্ত্রবিজ্ঞান কিঞ্চিৎ উপেক্ষিত। মানব কল্যাণে নিযুক্ত বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকগুলির, প্রযুক্তির অবদানের প্রসঙ্গ সুকুমারকে কিন্তু আকৃষ্ট করেছিল। সুকুমারের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, সাবলীল ভাষা, বক্তব্য পরিবেশনের মৌলিক সরস ভঙ্গি ও মজলিশী ঢঙ। লেটার-প্রেস, মেসিনের কাজের বর্ণনা দিই তাঁর লেখা থেকে, 'হাঁ-করা প্রেসটার মধ্যে' কাগজ বসিয়ে দিলে প্রেসটা সেই কাগজের ওপর অক্ষরের 'টাইপ দিয়ে এক কামড় বসিয়ে দেয়··

প্রাসঙ্গিকতা ও সমকালীনতা সুকুমার-রচিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিবন্ধগুলির

অন্যতম গুণ। টেলিফোন, রেডিও, রেডিও-ফোটো, এরোপ্লেন, ম্যাথমেটিকেল ক্যালকুলেটর, আন্ডার-ওয়াটার টেলিগ্রাফ লাইন, স্কাইস্ক্রেপার ও প্রি-ক্যাব বিল্ডিং, ইলেকট্রিক লিফ্ট, নিউমেটিক ট্র্যান্সপোর্টেশন, সিনেমা ইত্যাদি বিবিধ যন্ত্র ও কৌশলের কথা লিখেছেন তিনি।

আমেরিকান বিজ্ঞানী গডার্ড আধুনিক রকেট নির্মাতাদের অন্যতম। গডার্ডের প্রথম রকেট ছোঁড়ার সাফল্যের খবর পেয়েই ১৩২৭-এর আষাঢ় সংখ্যা 'সন্দেশ'-এ সুকুমার 'চাঁদমারি' নিবন্ধে ক্ষুদে পাঠকদের বলেছিলেন, 'হয়তো তোমরা বুড়ো হবার আগেই শুনতে পাবে যে তাঁদের দেশের প্রথম যাত্রীরা চাঁদে যাবার জন্য রওনা হয়েছে।' বছর ষাটের বয়সে যাঁরা ১৯৬৯-এর ২০ জুলাই আর্মস্ট্রঙের চাঁদের মাটিতে পা ফেলার খবর শুনেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয় তো দশ-এগারো বছরের শিশু-পাঠক হিসাবে সুকুমারের লেখাটি পড়েছিলেন। ১৯২৩-এ 'দা ইণ্ডিয়ান স্টেটস্ অ্যাণ্ড ইস্টার্ন এজেন্সি' নামে একটি বেসরকারী সংস্থা ভারতে প্রথম বেতারবার্তা প্রেরক যন্ত্র স্থাপন করে কলকাতায়। নিয়মিত বেতার প্রচার শুরু হতে আরো বছর চারেক লেগেছিল। এই প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে দেখতে হবে ১৩২৯-এর (১৯২২) ভাদ্র সংখ্যায় 'সন্দেশ'-প্রকাশিত সুকুমারের 'আকাশবাণীর কল'। অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র আকাশবাণী নামকরণের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সুকুমারই প্রথম রেডিও তরঙ্গের প্রতিশব্দ অর্থে 'আকাশবাণী' ব্যবহার করেন। সুকুমারের আরেকটি রচনা আজও আধুনিক। কলকাতায় প্রথম টিউব রেল বসানোর কথা চিন্তা করা হয় ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে। মিস্টার লাইডেল নামে এক ইঞ্জিনিয়ার এসেছিলেন হুগলী নদীর তলা দিয়ে শিয়ালদহ ও হাওড়া সংযোগকারী টিউব রেল স্থাপনের প্রকল্প রচনার জন্য। প্রকল্পটি গৃহীত না হলেও সুকুমারের 'ভুঁইফোঁড়' নিবন্ধে তার উল্লেখ রয়েছে।

সুকুমারের বিজ্ঞানী ও মুক্ত মন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সজাগ ছিল। ধূমকেতুর আগমন উপলক্ষে পৃথিবীতে প্রলয় ঘটবে, এই অলীক ধারণা এবারেও হ্যালির ধূমকেতু দর্শনের সময়ে প্রকাশ পেয়েছিল। সুকুমার এই ধারণাকে আঘাত করে রচনা করেছিলেন 'প্রলয়ের ভয়'। 'আষাঢ়ে জ্যোতিষ' নিবন্ধটির ও 'আবোল তাবোল'-এর অন্তর্ভুক্ত 'হাত দেখানো'-র মূল প্রতিপাদ্য অভিন্ন—'মানুষের বিদ্যায় যেখানে কুলোয় না কল্পনা সেখানে অভাব পূরাইয়া লয়' এবং বিপত্তি বাধায়। এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল লেখা দুটি।

ধাঁধা, হেঁয়ালি ও মজার খেলার রচয়িতা সুকুমারের মধ্যেও তাঁর বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির পরিচয়। 'লজিক গেমস' 'ক্রিপ্টোগ্রাম' ও 'ওয়ার্ড ট্রান্সফর্মেশন' ইত্যাদি বিষয়ে লেখা থেকে তাঁর সঙ্গে অ্যালিস-স্রষ্টা ও গণিতের অধ্যাপক ক্যারলের মনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ইলাসট্রেটর সুকুমারের মধ্যেও কারিগরি বিচার-বোধের অদ্ভুত কিছু নমুনা আছে যার মেজাজের সঙ্গে একমাত্র তুলনা চলে হিথ রবিনসনের সৃষ্টির। 'সভা' গল্পের ছবিতে দেখি বিটকেল প্রোফেসরের

কামানটি হাপরের সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ 'কম্প্রেশড এয়ার'-চালিত। চণ্ডীদাসের খুড়োর আজব কলটিও বিচিত্র যন্ত্রকৌশল-সিদ্ধ। প্রোফেসর হেঁশোরামের দেখা সৃষ্টিছাড়া জীবজন্তুর অ্যানাটমি বিশ্লেষণ করে শিল্প-সমালোচকরা সম্ভবত টেকনিকাল ত্রুটি পাবেন না।

পুণ্যলতা চক্রবর্তীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় ছেলেবেলা থেকেই ফোটোগ্রাফি চর্চা করতেন সুকুমার। 'বয়েজ ওন', 'চামস' ইত্যাদি বিলেতের কাগজে নাকি তাঁর তোলা ছবি ছাপাও হয়েছিল। বিলেত থেকে লেখা তাঁর বহু চিঠিতেও তাঁর ফোটোগ্রাফিতে আসক্তির কথা জানা যায়। ১৯১২-র নভেম্বরে তিনি রয়েল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটির সদস্য হয়েছিলেন। তারপর ১৯২২-এ নির্বাচিত হন fellow। তাঁর আগে প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরই একমাত্র ভারতীয় যিনি এই সম্মান লাভ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে ১৯০৬ নাগাদ তোলা রবীন্দ্রনাথের দৃপ্ত ভঙ্গির অতি পরিচিত আলোকচিত্রটি সুকুমারের ফোটোগ্রাফিতে দক্ষতার উজ্জ্বল নিদর্শন। বাংলা হরফ সংস্কার সংক্রান্ত তাঁর কিছু চিন্তা-ভাবনার কথা জানা যায় মৃত্যুর মাত্র দিন কয়েক আগে তাঁর নিজের হাতে লেখা খসড়া থেকে। মাত্র দুটি পাতা। কিন্তু তারই এলোমেলো লিপির মধ্যে বাংলা টাইপোগ্রাফি বিষয়ে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ পায়। সংযুক্ত বর্ণগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার ও 'কার্ন' (kern) টাইপগুলিকে বর্জন করার কথা বাংলাদেশে তিনিই প্রথম চিন্তা করেন। 'কার্ন' টাইপ বলতে ু, ৃ, ি, ী ইত্যাদি হরফ বোঝায়, যাদের অংশবিশেষ হরফের দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকে না, হরফ-দেহের অবলম্বন ছাড়াই শূন্যে ঝুলে থাকে। বিভিন্ন হরফে বিভিন্ন রূপ নিয়ে যুক্ত হয় উ-কার। যেমন—হু, গু, পু, শু ইত্যাদি। সুকুমারের খসড়ায় এ ক্ষেত্রে সর্বত্রই উ-কারকে র-সংযুক্ত ভঙ্গিতে [রু] ব্যবহার করতে দেখা যায়। 'ন' ও 'গ' অথবা 'হ' ও 'ন' দ্বারা গঠিত যুক্তাক্ষরগুলি তিনি এমনভাবে লিখেছিলেন যাতে যুক্তাক্ষরের দু'টি অক্ষরের কোনোটিই তার স্বাতন্ত্র না হারায়—এক নজরেই যাতে অক্ষর দুটি চেনা যায় (যাকে অক্ষরের transparency বা স্বচ্ছতা রক্ষা বলা হয়)। 'ম' ও 'ভ' যুক্ত করার সময়ে তিনি 'ভ'-কে 'ম'-এর নিচে না বসিয়ে পাশে বসিয়েছিলেন। কার এবং তার সংযোগে উৎপন্ন যুক্তাক্ষর দুটিও তিনি transparency দিতে চেয়েছিলেন। এ-কারের স্থানে তিনি ধ্বনিতত্ত্বের বিচারে পরিবর্তনের কথা ভেবেছিলেন। 'কার্ন' টাইপ হিসাবে 'ন'-কে বর্জন করার জন্য 'ন'-কে নিচুতে স্থাপন করার প্রস্তাবটিও আকর্ষণীয়।

॥ ২ ॥

মুদ্রণ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা—ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য সুকুমার ১৯১১-য় বিলেতে পৌঁছলেন। বিলেতে গিয়ে কারিগরি শিক্ষা ও গবেষণার অতিরিক্ত কিছু দায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন। সে-কথা বলতে হলে তার আগে ১৯১১ নাগাদ উপেন্দ্রকিশোর ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইউ রায় অ্যান্ড সন্সের কাজকর্ম সম্বন্ধে কিছু তথ্য পেশ করা দরকার।

১০০ গড়পার রোডের ডেফ অ্যান্ড ডাম স্কুলের অঙ্গন-সংলগ্ন ঐতিহাসিক বাড়িটির একতলা ও দোতলার, মাঝখানে চোখ রাখলে এখনো পড়া যায়ঃ

FOUNDED—GRAPHIC ARTS & PHOTO PROCESSES—1895

১৮৯৫-তে উপেন্দ্র কিশোর তাঁর হাফটোন ব্লক তৈরির ব্যবসা শুরু করলেও তখন সংস্থাটি U. Ray, Artist নামেই পরিচালিত হত। ১৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে এই কারবারের পত্তন। তারপরে তা বছর খানেকের মধ্যে উঠে আসে ৩৮/১ শিবনারায়ণ দাস লেনে। ১৯০১ থেকে ২২ সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে কাজ চলতে থাকে। প্রথম থেকেই বসত বাড়িতে, ভাড়া বাড়িতে, গবেষণা তথা কারবার চালিয়েছেন উপেন্দ্রকিশোর। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম U. Ray & Sons নামে ব্যবসার কাজ শুরু হয়। তা ছাড়া এ বছরেই বই বেরলো U. Ray & Sons থেকে—'টুনটুনির বই'। তখনো এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ছাপাখানা ছিল না। অন্য প্রেস থেকে বই ছাপানো হয়েছিল। ১৯১০-১১ থেকেই গড়পারে নিজস্ব বাড়ি তৈরির ও সেখানে ছাপাখানা সমেত ব্লক তৈরির কারখানা স্থাপনের শুরু। ঠিক এই সময়ে সুকুমারের বিলেতে আগমন উপেন্দ্রকিশোরের এবং ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স-এর প্রতিনিধি রূপেও। নতুন ছাপাখানার জন্য উপযুক্ত মেশিনারি নির্বাচন, নব উদ্ভাবিত বা সদ্য প্রবর্তিত বিবিধ মুদ্রণ কৌশল নিয়ে তুলনামূলক অধ্যয়ন ও ভারতীয় পরিস্থিতির কথা মনে রেখে নিজেদের কাজে তার মধ্যে কোন্ কোন্‌টি উপযুক্ত স্থির করা ইত্যাদি দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর।

১৩২০-র বৈশাখে 'সন্দেশ'-এর প্রথম সংখ্যা যখন প্রকাশিত হয়, সুকুমার তখন বিদেশে।

'সন্দেশ'-এর বহু আলোচিত কীতিত্বের পুনরুক্তি না করে নতুন কথা একটি এখানে বলা চলে।

'সন্দেশ' ছিল এক অর্থে ইউ রায় অ্যান্ড সন্স-এর হাউস জার্নাল। এর পাতায় পাতায় যত ছবি তা কোম্পানীর ব্লক নির্মাণের দক্ষতারও তো পরিচায়ক। তা ছাড়া ১০০ গড়পার রোডের ছাপাখানাতেই তার জন্ম। অবশ্য ছাপাখানা পুরোপুরি স্থিতি লাভ করতে আরো মাস চার পাঁচ লেগেছিল।

সুকুমারের বিলেতে যাওয়ার আগেই হাফটোন প্রতিচ্ছবি মুদ্রণের তত্ত্ব ও কর্ম বিষয়ে উপেন্দ্রকিশোরের আটটি মৌলিক গবেষণাপত্র ছাপা হয়েছিল পেনরোজেস পিকটোরিয়াল অ্যানুয়াল-এ, মুদ্রণ জগতে এই বার্ষিক সংকলন গ্রন্থ ছিল 'বাইবেল' স্বরূপ। ফোটোগ্রাফির সাহায্য নিয়ে বহুসংখ্যক প্রতিচ্ছবি ছাপার কাজকেই 'প্রসেস ওয়ার্ক' বা প্রসেস শিল্প বলা হয়। (প্রসেস এনগ্রেভিং, ফোটো-প্রসেস বা গ্রাফিক প্রসেস—সবই একই অর্থ বহন করে)। এই প্রসেস শিল্পে উপেন্দ্রকিশোরই প্রথম ও শেষ ভারতীয় যাঁর আন্তর্জাতিক মানের স্বীকৃত মৌলিক অবদান আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক রচনা হিসাবে উপেন্দ্রকিশোরে আর্টিকলগুলি যতই আদৃত হোক বিলেতের অভিজ্ঞ মহলও কিন্তু উপেন্দ্রকিশোরের কিছু কিছু

প্রস্তাবের ব্যবহারিক উপযোগিতা সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। সুকুমার যখন বিলেতে, পেনরোজ অ্যানুয়ালে (১৯১১-১২) উপেন্দ্রকিশোরের নবম ও শেষ রচনা 'মাল্টিপ্‌ল্‌ স্টপস' (Multiple Stops) প্রকাশিত হয়। সুকুমার হাতে কাজ করে, ডেমন্‌স্ট্রেট করে, লণ্ডন ও ম্যাঞ্চেস্টারের মুদ্রণ-শিল্প বিশেষজ্ঞদের দেখিয়ে দেন মাল্টিপ্‌ল্‌ স্টপ ব্যবহারের সুফল।

বিলেতে থাকার সময়ে সুকুমারের শিক্ষা ও গবেষণার কথা প্রধানত জানা যায় পিতাকে লেখা তাঁর চিঠিগুলি থেকে। (দ্রঃ এক্ষণ, 'বিলেতের চিঠি' শারদীয়, ১৩৮৯ ও 'বিলেতের আরো চিঠি' গ্রীষ্ম-১৩৯১)। এই চিঠিগুলি শুধু পিতা-পুত্রের আলাপ নয়, গবেষক ও তাঁর ছাত্র, রিসার্চ স্কলারের মধ্যে মত বিনিময়। সুকুমারের পত্রাবলীতে আলোচিত কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক বহু প্রসঙ্গ শুধু সাধারণ পাঠক নয়, মুদ্রণ প্রসেস শিল্প সম্বন্ধে মোটামুটি ওয়াকিবহালদের কাছেও দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে। প্রেরক ও গ্রাহকের বিশিষ্টতাই তার কারণ। সুকুমারের কারিগরি চর্চার গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে চাইলে প্রথমেই দরকার তিনি যে-সব বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন বা গবেষণা করেছিলেন সেগুলির রূপরেখা জেনে নেওয়া। এই প্রবন্ধের পরিসরে তা পেশ করা সম্ভব নয়। (উৎসাহী পাঠককে এ-ব্যাপারে এক্ষণ এ-প্রকাশিত 'বিলেতের আরো চিঠি'-র তথ্যপঞ্জিভুক্ত মুদ্রণ বিষয়ক জ্ঞাতব্য তথ্যাদিও 'উপেন্দ্রকিশোর ঃ শিল্পী ও কারিগর' নিবন্ধটি সাহায্য করতে পারে।)।

লণ্ডনের কাউণ্টি স্কুল অফ ফোটোএন্‌গ্রেভিং অ্যাণ্ড লিথোগ্রাফিতে (L C.C.) এবং ম্যাঞ্চেস্টারের মিউনিসিপ্যাল স্কুল অফ টেক্‌নলজিতে 'কলোটাইপ', 'ফোটো-লিথোগ্রাফি', 'অফসেট' ইত্যাদি বিবিধ মুদ্রণ পদ্ধতি ও নানা ধরনের মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে সুকুমার শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হয়েছিল বিলেতের মুদ্রণ বিশেষজ্ঞদেরও। 'হাফটোন' চর্চা, বিশেষ ক'রে হাফটোন সংক্রান্ত ক্যামেরার কাজে উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র তথা ছাত্র সুকুমারের নতুনকিছু শেখার ছিল না। সুকুমারের বহু চিঠিতেই সে কথা ব্যক্ত।

বিলেতে পৌঁছেই কয়েকদিনের মধ্যে তিনি লিখছেন, 'আজ এখানে [L. C. C] Halftone negative করা দেখলাম—বড্ড unsystematic······'। (১৬ অক্টোবর, ১৯১১)।

আরেকটি চিঠিতে জানাচ্ছেন, 'Halftone বা Printing এখানে [L. C. C.] শিখ্‌বার কিছুই নেই।'

এই বছরেরই ১০ নভেম্বর চিঠিতে পড়ি, 'হাফটোন আর three colour এরা যা করে সে কিছুই নয়। দু তিনটা three colour এর প্রুফ তুলল একটাও রঙ ঠিক হয়নি। সেইগুলিকেই touch করে ব্লক করতে লাগল—আমাকে বলল প্রথম প্রুফে এর চেয়ে ভাল রং হয় না। আমি বললাম নেগেটিভ ঠিক হলে প্রায় ছবির মত প্রুফ হওয়া উচিত।'

সবচেয়ে বিস্ময়কর সুকুমার উপরিউক্ত চিঠিটি লিখেছিলেন তাঁর মা-কে!

উপেন্দ্রকিশোর উদ্ভাবিত 'মাল্টিপ্‌ল্ স্টপ্‌স্'-এর প্রবর্তনের জন্যও সুকুমারের প্রয়াসের কথা বিভিন্ন চিঠির মধ্যে ছড়িয়ে আছে ঃ

'সোমবার L. C. C: স্কুলে Multiple diaphragm দেখাব—Mr. Newton আর অন্যান্য teachers থাকবেন।' (১ ডিসেম্বর, ১৯১১)

'L. C. C তে Multiple Stops এর কাজ আরম্ভ হয়েছে।…কিন্তু এখানকার লোকদের এ বিষয়ে ভয়ানক গোঁড়ামি।…আমার সন্দেহ Mr. Bullও বোধহয় এই সব Stop সম্বন্ধে একটু prejudiced—তাই তাকে কাল জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি একটু আমতা আমতা করে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন—কিন্তু আরেকটু চেপে ধরতেই বললেন, "আমার মতে Round Stop-ই সবচেয়ে ভাল।" আমি বললাম, "বেশ ত! Multiple Stop-এ ত round holes ব্যবহার করতে বাধা নেই।" তখন থতমত খেয়ে গেলেন, বললেন, "Yes! Yes! I really haven't given much thought to it." (বিলেতের আরো চিঠি, সংখ্যা ১৮।)

'Multiple Stops সম্বন্ধে Mr. Lishenden এর prejudice এখন ভেঙ্গে আসছে। সেদিন কয়েকটা wet plate negative করেছিলাম। দেখে খুব খুশি হলেন—"Beautiful dots" বললেন।' (৭ নভেম্বর, ১৯১২, ম্যাঞ্চেস্টার)। সুকুমার যখন বিলেতে যান অফসেট বা ফোটোলিথোগ্রাফির তখন শৈশব বলা চলে। সূক্ষ্ম হাফটোন প্রতিচ্ছবি ছাপার কাজে লিথোগ্রাফিক পদ্ধতিতে খুব সুবিধা হবে না বুঝেছিলেন সুকুমার। কিন্তু বই ছাপার জন্য এই পদ্ধতিটিকে নিজেদের প্রেসে প্রবর্তন করার কথা তিনি চিন্তা করেছিলেন, "ছেলেদের রামায়ণ" ইত্যাদি বই যদি compose করে তা থেকে transfer করে পাৎলা zinc বা aluminium এর উপর litho ক'রে রাখা যায় আর type থেকে না ছেপে সেই litho plate থেকে ছাপা যায় তা হ'লে প্রত্যেক edition এ compose করার খরচ বাঁচে, type এর wear & tear বাঁচে, অথচ stereotype এর চেয়ে অনেক simple, portable, আর illustration ঢোকান যতদূর cheap আর সহজ হ'তে হয়। Zinc এর উপর ছবি এঁকে বা কাগজে এঁকে transfer ক'রে দিলেই হ'ল। ছেলেদের বই, label, poster ইত্যাদি মোটা কাজে lithography থেকে খুবই সাহায্য পাওয়া যাবে। সেই জন্য আমি Lithographic Printing ইত্যাদি বিষয়েই এখন বিশেষ ক'রে ঝোঁক দিয়েছি।' (বিলেতের আরো চিঠি, সংখ্যা ৪০);

U. Ray & Sons থেকে লিথোগ্রাফিক পদ্ধতিতে বই ছেপে বেরিয়েছিল কি না জানা নেই। তবে উপরিউক্ত চিঠি লেখার প্রায় ৭২ বছর পরে সুকুমারের আদরের 'সন্দেশ' অফসেটে ছেপে বেরোতে শুরু হয়েছে।

বিলেতে থাকায় সময় কিছু মৌলিক গবেষণাতেও হাত দিয়েছিলেন সুকুমার। যেমন ১৯১২-র ২০ সেপ্টেম্বরের চিঠি থেকে জানা যায়, 'মনে করছি নানা রকম dot এর দরুণ ছবির gradation আর etching characteristics এর যে তফাৎ হয় সেটা quantitatively দেখাতে পারলে মন্দ হয় না।—Halftone ব্লক থেকে

Woodbury type এর মত করে ছাপবার একটা process কতকটা work out করেছি।…Collotype প্রভৃতি process এ এরা কেউ খুব fine Halftone dot ঢোকাবার চেষ্টা করে না—অথচ তা করলেই process একেবারে সোজা হয়ে যায়।'

বিলেতে পড়ার সময়ে সুকুমার দুটি পেপার লিখেছিলেন পেনরোজেস পিকটোরিয়াল অ্যানুয়েল-এর জন্য। যথাক্রমে ১৯১২ ১৯১৩-১৪ বার্ষিক সংকলনে সে দুটি প্রকাশিত হয়। 'Halftone Facts Summarized' নামে প্রথম প্রবন্ধটি সম্পর্কে সুকুমার জানিয়েছিলেন, 'সাধারণতঃ halftone theory সম্বন্ধে এখানে যে সব অদ্ভুত কথা শুনতে পাই সেইটে লক্ষ্য করেই article টা লিখেছি।' (১১ অক্টোবর, ১৯১১)। আর দ্বিতীয়টির বিষয়ে তিনি জানিয়েছেন, "Standardizing the Original" বলে একটা article লিখছি। Original এর exposure value আর range চট্ ক'রে বার করবার একটা method Manchester থাকতে work out করেছিলাম…।' (৯ মে, ১৯১৩)। এ ছাড়াও, The British Journal of Photography-তে (জুলাই, ১৯১৩), 'Pin-hole theory নিয়ে আমার সঙ্গে একটু লেখালিখি হয়েছে।' (১৮ জুলাই, ১৯১৩)।

প্রসেস ওয়ার্কে ক্যামেরার কাজের খুব সহায়ক একটি স্লাইডিং ক্যালকুলেটর উদ্ভাবন করেছিলেন সুকুমার। 'Stop aperture টা camera extension এর against-এ set করলেই screen mark এর কাছে distance টা read off করা যাবে। একটা rough calculator বানিয়ে স্কুলে দেখিয়ে এসেছি—'। পরের চিঠিতেই জানা যায়,

Penrose-এর Factoryতে ওটা manufacture হবে—তাই ওদের একটা model scale বানিয়ে দিয়েছি।' এই ক্যালকুলেটরের একটা rough drawingও সুকুমার চিঠির সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। পেনরোজ কোম্পানি এই ক্যালকুলেটর বিক্রির কোন লভ্যাংশ সুকুমারকে দিত কি না জানা যায় না। সে-বিষয়ে খুব আশাবাদী হবারও কারণ নেই। ইতিপূর্বে উপেন্দ্রকিশোর ১৯০১ নাগাদ উদ্ভাবন করেন 'স্ক্রিন অ্যাডজাস্টমেণ্ট ইণ্ডিকেটর' নামে একটি যন্ত্র কিন্তু তার পেটেণ্ট নিয়েছিল পেনরোজ অ্যাণ্ড কোম্পানি। পেনরোজ কোম্পানির তৈরী প্রসেস ক্যামেরায় এই যন্ত্রটি লাগানো থাকত অ্যাকসেসরি হিসাবে। পেনরোজ কোম্পানির মুখপত্র পেনরোজেস অ্যানুয়ালেই প্রকাশিত হয়েছিল উপেন্দ্রকিশোরের লেখা যন্ত্রটির বিবরণ। কোম্পানির সঙ্গে পরবর্তী কালেও উপেন্দ্রকিশোরের যে রকম সুসম্পর্ক ছিল তাতে এরা উপেন্দ্রকিশোরকে প্রতারিত করেছিল বলাটা হয়তো সঙ্গত নয়। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর যে একবার অন্তত প্রতারিত হয়েছিলেন তারও বিবরণ আছে পেনরোজ-এর সংকলনেই।

উপেন্দ্রকিশোর হাফটোন ক্যামেরার কাজে ব্যবহারের জন্য 60° Screen নামে একটি জিনিসের তত্ত্ব পেশ করেন। সেই আইডিয়া আত্মসাৎ করে পেটেণ্ট গহণ

করে শুলৎজে নামে একজন। শুলৎজের লেখা পেনরোজ-এ প্রকাশিত হবার পর উপেন্দ্রকিশোর একটি rejoinder পাঠিয়েছিলেন। 60° Screen এর পেটেন্ট নিল শুলৎজে কিন্তু তার পরেও উপেন্দ্রকিশোরকেই ব্যাখ্যা করে দিতে হল জিনিসটির প্রকৃত ব্যবহারবিধি ও বৈশিষ্ট্য। শুলৎজের অনৈতিক আচরণের জন্যশুধু মৃদু একটি প্রতিবাদ করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর আর তার পরেই তাঁর বৈজ্ঞানিক সত্তা এক চরম ব্যবসায়িক অনাসক্তি প্রকাশ করে জানিয়েছিল : *TO THE CRAFT IT MATTERS LITTLE WHO GETS THE CREDIT FOR A PARTICULAR INVENTION WHAT DIRECTLY CONCERNS THEM IS THE ADDITION OF A VALUABLE RESOURCE TO THEIR EQUIPMENT.* পিতা-পুত্রের এই ব্যবসায়িক মনোভাবের অভাব বা তার প্রতি অনীহা সুকুমারের অকাল মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যে ইউ-রায় অ্যান্ড সন্স উঠে যাবার প্রধান কারণ বলে আমি মনে করি। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার নিজেদের আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন—ভারতে আধুনিক ধারায় প্রসেস শিল্পের গোড়াপত্তন করে গেছেন তাঁরা। ইউ রায় অ্যান্ড সন্স উঠে গেল কিন্তু এই কোম্পানিতে পিতা-পুত্রের হাতে কাজ শিখেছিলেন যাঁরা প্রায় সকলেই স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। প্রত্যেকেই ব্লক নির্মাতা বা মুদ্রক হিসাবে অর্জন করলেন খ্যাতি। চেন রিঅ্যাকশন জাতীয় যে-প্রক্রিয়ায় হাফটোন ব্লক নির্মাণ আজ কলকাতার ঘরে ঘরে কুটীর শিল্পের রূপ ধারণ করেছে তার সূত্রপাত ঘটেছিল ইউ রায় অ্যান্ড সন্স এর যজ্ঞশালায়।



সুকুমার রায়ঃ তাঁর শিল্পচিন্তা, তাঁর ছবি

মৃণাল ঘোষ

এক

'হযবরল'-র মাথাভরা টাক, পা পর্যন্ত সবুজ রঙের দাড়ি, দেড় হাত লম্বা সেই বুড়ো অবাক হয়েছিল মানুষের বয়স কেবলই বেড়ে চলে শুনে। বয়স কি কেবলই বেড়ে চলবে? তাহলে ত বাড়তে বাড়তে ষাট সত্তর আশি পার হয়ে শেষটায় বুড়ো হয়ে মরে যেতে হবে মানুষকে। এ ছিল তার কাছে এক প্রশ্নদীর্ণ বিস্ময়। নিজের জীবনে সে এর এক সমাধান আবিষ্কার করেছিল। "চল্লিশ বছর হলেই আমরা বয়স ঘুরিয়ে দিই। তখন আর একচল্লিশ বেয়াল্লিশ হয় না—উনচল্লিশ, আটত্রিশ, সাঁইত্রিশ করে বয়স নামতে থাকে। এমনি করে যখন দশ পর্যন্ত নামে তখন আবার বয়স বাড়তে দেওয়া হয়।" সময়ের গতিকে এভাবে একমুখো না থাকতে দিয়ে তার অভিমুখ পাল্টে নেওয়ার যে দর্শন শোনা গিয়েছিল সেই বুড়োর মুখে, তার গভীরতর যৌক্তিকতাই যেন শুনেছিলাম আমরা গল্পের শেষে নায়ক সেই ঘুমিয়ে পড়া কিশোরের কাছে—"মানুষের বয়স হলে এমন হোঁতকা হয়ে যায়, কিছুতেই কোনো কথা বিশ্বাস করতে চায় না।" বিস্ময় হারানো মানুষের গভীর গভীরতর অসুখের প্রতি কটাক্ষই অন্তঃসলিলা হয়ে আছে সুকুমার রায়ের 'হযবরল' -তে।

সময়ের ও বাস্তবতার উপরিতলকে ভেঙে ফেলেই 'হযবরল'র 'আমি' পৌঁছতে পারে নিয়মহারা সেই আপাত-উদ্ভটের জগতে। স্বপ্নের একটা আবরণ আছে 'হয়বরল'তে। 'আমি' অভিধার সেই কিশোর বা শিশু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের স্রোত বেয়ে পৌঁছেছিল যেখানে, সেখানে তার পরিচিত রুমালটা সহসা

রূপান্তরিত হয়ে গেল বেড়ালে। তা দেখে বিস্মিত 'আমি'কে বোঝচ্ছে বেড়াল. "মুশকিল আবার কি? ছিল একটা ডিম, হয়ে গেল দিব্যি একটা প্যাঁকপেঁকে হাঁস। হামেশাই হচ্ছে।" তাহলে কী হবে তার সত্যিকারের পরিচয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বেড়াল বলে, "রুমালও বলতে পার, চন্দ্রবিন্দুও বলতে পার।" চন্দ্রবিন্দু কেন? এর উত্তর—"হ্যা এ ত বোঝাই যাচ্ছে—চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ, রুমালের 'মা'—হল চশমা। কেমন হল ত?'

সেই স্বপ্নের জগতের তরলায়িত বিস্বায়ন আরও ভিত্তি পায় কাহিনীর শেষে যখন দেখি ছাগলের মুখ সুপারইমপোজড হয়ে যায় মেজোমামার মুখে, যে মেজোমামা কান টেনে ধরে বলছেন, "ব্যাকরণ শিখবার নাম করে বুঝি পড়ে পড়ে ঘুমোন হচ্ছে?"

ঘুম আর জাগরণের সন্ধিস্থলে বাস্তব কেমন করে স্বপ্নে রূপান্তরিত হয়ে যায় তার পরিচয় হযবরল ছাড়াও ছড়ান আছে সুকুমার রায়ের অন্যান্য রচনায়। যেমন দেখেছি ভাদ্র ১৩২৭-এর 'সন্দেশ'-এ 'হিংসুটি' নাটিকাটিতে।

স্বপ্নের আবরণের মধ্য দিয়ে বাস্তবতার এই যে রূপান্তর কখনো কিম্ভূতের দিকে, কখনো অতিশয়তার দিকে, বাস্তবের উপরিতলের আপাত যুক্তিশৃঙ্খলা যেখানে আর কাজ করে না, তা আমাদের শিল্পসাহিত্যের বিশেষ একটি আন্দোলনের কথা মনে পড়াতেও পারে। আন্দোলন হিসেবে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুররিয়ালিজমের শুরু অবশ্য ১৯২৪-এর ফ্রান্সে। ১৯২৪-এই প্রকাশিত হয়েছিল আঁন্দ্রে ব্রেত'র বিখ্যাত সুররিয়ালিজমের ম্যানিফেস্টো। সেখানে সুররিয়ালিজমের সংজ্ঞা নির্দেশের চেষ্টা হয়েছিল এভাবে যে সুররিয়ালিজম হচ্ছে এক ধরনের 'সাইকিক অটোমেটিজম' যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে চেতনার এক স্বপ্নতাড়িত অবস্থার। কিন্তু কতটুকু পর্যন্ত সেই স্বপ্নের সীমা আজ আর তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। ব্রেতঁ সুররিয়ালিজম প্রসঙ্গে মানুষের শৈশব চেতনাকে এবং শৈশবের সমস্ত প্রভাবমুক্ত নির্ভার ও সরল প্রকাশকে সৎ ও শুদ্ধ প্রকাশের মূল্য দিয়েছিলেন।

একদিকে স্বপ্নের জগৎ, শৈশবের অপাপবিদ্ধ সরলতা, অন্যদিকে সময়ের চিরাচরিত সুপরিচিত অভিমুখ ভেঙ্গে ফেলা এই তিনটি সূত্রের মধ্যে সুকুমার রায়ের সাহিত্যের নন্দনে সুররিয়ালিজমের ঘনিষ্ঠ ছায়া অনুভব করা যায়। সময়ের গতিকে যদি পাল্টে নেওয়া যায়, একাভিমুখী চলনের স্থাবরতা থেকে যদি মুক্ত করা যায় তাকে, তাহলে গলে যেতে থাকে বাস্তবতার পরিচিত স্থির-নির্দিষ্ট অবয়বও। সময়কে গলিয়ে নিতে পেরে বাস্তবতারও যে রূপান্তর ঘটাতে পেরেছিলেন সুকুমার রায়, সেই রূপান্তরণের জন্যই শুধু শিশুপাঠ্য লেখক ও কবি হিসেবেই নয়, তার চেয়েও অনেক গভীরতর অর্থে আজ স্বীকৃত হয় তাঁর প্রতিভা।

তবু ১৯২৪ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যে সুররিয়ালিজমের শুরু তার আওতায় কেমন করে আনা যায় সুকুমার রায়কে, তার অন্তত একবছর আগে মাত্র ছত্রিশ

বছর বয়সে যিনি লোকান্তরিত হয়েছিলেন? একটু তলিয়েভাবলে স্যুরিয়ালিজমের শুরু হিসেবে ১৯২৪ সালটিকে ততটা আক্ষরিক অর্থে না ধরলেও হয়ত চলে। ব্রেত' তাঁর জীবনের শেষ দিকে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, "স্যুরিয়ালিজমের অস্তিত্ব ছিল আমার আগেও, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার পরেও থেকে যাবে এর অস্তিত্ব।" আবহমানের শিল্পের ঐতিহ্য থেকেই প্রেরণা নিয়েছিলেন স্যুরিয়ালিস্টরা। যেখানেই আত্মিক অসন্তোষ থেকে বাস্তবতার অনড় অবয়বকে ভেঙে নতুন সত্যের জন্য আর্তি ধ্বনিত হয়েছে, তাকেই অনুধাবনের যোগ্য ভেবেছেন তাঁরা। প্রাণিত হয়েছেন তা থেকে। তাই আফ্রিকার আদিম শিল্প ততটা অনুপ্রাণিত করে নি স্যুরিয়ালিস্টদের, যতটা করেছে ওসেনীয় আদিম শিল্প। প্রথমটিতে বাস্তবতার অনড় সংযোগ রয়েছে আর দ্বিতীয়টিতে রয়েছে বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার আত্মিক আকূতি—এরকমই মনে করেন তাঁরা। এখানে লক্ষনীয় ইম্প্রেশনিজমের পরে পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্টদের গাঠনিক বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে কিউবিজমের দিকে যেতে আফ্রিকার আদিম শিল্পই হয়েছিল প্রধানতম এক প্রেরণা। আবার কিউবিজম ছাড়িয়ে স্যুরিয়ালিজমের দিকে যেতে সেই ভূমিকা থেকে চ্যুত হল আফ্রিকার শিল্প। প্রধান প্রেরণার স্থান নিল তখন ওসেনীর আদিম শিল্প। এই আত্মিক অসন্তোষই কি হেনরি মুরকে আকৃষ্ট করেছিল মেক্সিকোর আদিম ভাস্কর্যের দিকে যে হেনরি মুর পরবর্তী কালে স্যুরিয়ালিজম দ্বারা গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন? স্যুরিয়ালিস্টরা তাই তাঁদের পূর্বসূরী বলে মনে করেন ভ্যুরায়ের কোনো কোনো কাজকে, হিরনিমাস বচ বা গোইয়ার মতো শিল্পীকে।

আবার ১৯২৪-এর আনুষ্ঠানিক শুরুর আগের স্যুরিয়ালিজমের পদপাত অনুভব করা যাচ্ছিল। প্রচলিত নন্দনকে ছাড়িয়ে প্রেরণাকে সম্পূর্ণ স্বরাট করে দেওয়ার যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল প্যারিসে, তার সূত্রপাত বলা যায় ১৯১১ এই, যখন তিন তরুণ কবি আঁদ্রে ব্রেত, লুই আরাঁগ ও ফিলিপ স্যুপলত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তথাকথিত সাহিত্যিকতা বিরোধী এক পত্রিকা 'লিটারেচার'। এই তিন কবি একসঙ্গে মিলেছিলেন অন্য আর একজন কবির প্রেরণায়। তিনি হলেন গিয়ম অ্যাপোলোনিয়র। ঠিক আগের বছর মারা গেছেন অ্যাপোলোনিয়র। তাঁরই স্মৃতি প্রাণিত করেছিল এই তিন কবিকে। এই অ্যাপোলোনিয়রই প্রথম ব্যবহার করেছিলেন 'স্যুরিয়ালিজম' শব্দটি আরও একটু আগে। ১৯১৭-র ১৮ই মে তাঁর নিজের রচিত একটি নাটক প্রসঙ্গে ছাপার অক্ষরে তিনি প্রথম ব্যবহার করেন এই শব্দটি। তারও কয়েকদিন পরে ২৪শে জুন তাঁর Mamelles de Tirésias নাটক প্রসঙ্গেও আবার ব্যবহৃত হয় স্যুরিয়ালিজম শব্দটি।

সুকুমার রায় এসব তথ্য জানতেন কিনা বা স্যুরিয়ালিস্ট কোনো কবির, যেমন লুই ক্যারল বা এডওয়ার্ড লিয়রের রচনা থেকে প্রত্যক্ষভাবে কোনো প্রেরণা পেয়েছিলেন কিনা সে সমস্ত তথ্য এখনও তেমন স্পষ্ট নয়। কিন্তু

সুকুমার রায়ের শেষ জীবনের, বিশেষত শেষ দু তিন বছরের সাহিত্যে, যা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল, সুররিয়ালিস্টধর্মিতা যে একটি মাত্রা যোগ করেছিল এ কথা মিথ্যে নয়। তাঁর গ্রন্থচিত্রনের ছবি প্রসঙ্গেও এই কথাটি আমাদের মনে রাখতে হয়।

বাস্তবতার অনড় মাত্রাকে ভেঙে দিয়ে এই যে উদ্ভটের জগতে সঞ্চারণ তাঁর কবিতায় ও গদ্যে, সনাতন ভারতীয় ন'টি রসের আওতায় না আনতে পেরে যার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'খেয়াল রস', সেই 'খেয়াল রস' বাস্তবতা নিরপেক্ষ ছিল না তাঁর কাছে। বরং ক্রমান্বয়েই এই সত্য বেশি করে প্রস্ফুটিত হচ্ছে যে বাস্তবতার এক গভীর বিশ্লেষণ থেকেই আসছিল তার 'খেয়াল রস'।

'হিজিবিজি খাতা' নামে তাঁর একটি খাতা আছে সত্যজিৎ রায়ের সংগ্রহে, তাতে রয়েছে নানা সময়ে লেখা কবিতার খসরা, ছবি স্কেচ ইত্যাদি। তারই এক পাতায় দেখা যায় গোঁফওয়ালা একটি মানুষের মুখের স্কেচ। লোকটির মুখে তির্যক হাসি। উপরে কাটাকাটিতে একটি অসম্পূর্ণ ছড়ার কয়েকটি লাইন এরকম ঃ

"রসের মাঝে মজবি যদি মন
বাস্তবের এই বস্তুলীলা ; তত্ত্ব কথা শোন
জড় জগতের বাস্তুভিটায় বস্তু করেন বাসা
নিংড়ে দেখ রসের মধু মৌচাকে তার ঠাসা"

এই লাইনগুলি সম্পর্কে লীলা মজুমদার বলেছেন, "এই চিন্তাটাই ছিল এই অসাধারণ মানুষটির মনের মূলে।"

বাস্তবতার অনড় জটিলতাকেই খেয়াল রসে রূপান্তরিত করেছিলেন সুকুমার রায় অসামান্য শৈল্পিক বৈদগ্ধে। করতে যে পেরেছিলেন, সেই সফলতার মূলে ছিল, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, "তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য।"

বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবতাকে দেখে তার বিশ্লেষণ এবং বাস্তবতার আপাত স্বরূপকে ভেঙে দিয়ে তার যে রূপান্তরণ, সুকুমার রায়ের সৃষ্টি প্রতিভার এই মূলগত কথাটি মনে রাখতে হয় তাঁর সাহিত্যের বিচারে যেমন, তাঁর ছবির ক্ষেত্রেও।

দুই

বাস্তবচেতনা ও সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক চেতনার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর নন্দন চেতনা। শিল্পের ক্ষেত্রে এই সমন্বয়ের স্বরূপ কী তা বুঝতে হলে শিল্প আলোচনামূলক তাঁর তিনটি লেখা আমাদের ঘনিষ্ঠভাবে দেখে নিতে হয়। শিল্পকলা বিষয়ে মাত্র এই তিনটি ছোট লেখাই এখন পর্যন্ত আমাদের হাতে এসেছে। সম্প্রতি 'অনুষ্টুপ প্রকাশনী' থেকে শোভন সোম ও অনিল আচার্য

সম্পাদিত 'বাংলা শিল্প সমালোচনার ধারা' বইটিতে লেখা তিনটি সংকলিত হয়েছে। এই মূল্যবান কাজটি করে 'অনুষ্টুপ' ও সম্পাদকদ্বয় আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

'ভারতীয় চিত্রশিল্প' ও 'ভারতীয় চিত্রকলা' নামে সুকুমার রায়ের প্রথম দুটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসী পত্রিকায় ১৩১৭ বঙ্গাব্দ (১৯১০) যাথাক্রমে শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। অবনীন্দ্রনাথের একটি ছবি নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের দুটি আলোচনার উত্তরে লেখা হয়েছিল রচনা দুটি। সুকুমার রায়ের বয়স তখন মাত্র তেইশ বছর। 'শিল্পে অত্যুক্তি' নামে তৃতীয় প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল প্রবাসীতে ১৩২১ বঙ্গাব্দের (১৯১৪) আশ্বিন মাসে। তাঁর বয়স তখন ২৭।

এই তিনটি প্রকাশিত লেখা ছাড়া আরও কয়েকটি শিল্প বিষয়ক আলোচনার কথা জানা যায়। এগুলি মানডে ক্লাব বা মণ্ডা ক্লাবের বিভিন্ন সভায় প্রবন্ধ হিসেবে তিনি পাঠ করেন বা বক্তৃতা দেন। যেমন, ৬ ডিসেম্বর ১৯১০ ২৫নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে অনুষ্ঠিত সভায় তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ইস্থেটিক সুপার-স্টিশান'। ৩ এপ্রিল ১৯১৬ নরেন্দ্রকুমার চৌধুরী সেকেণ্ড লেনের সভায় তিনি ভাষণ দেন—'ফাংশানস অফ আর্ট' নামে। ২৬ মার্চ ১৯১৭-তে তাঁর ভাষণের বিষয় ছিল 'রাসকিনস মডার্ন পেইন্টার্স'। ২১ মে ১৯১৭-তে তিনি আলোচনা করেন 'ক্রিটিসিজম ট্রু অ্যাণ্ড ফলস'—এই বিষয়ে। মণ্ডা ক্লাবে আরও অনেক বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠ হয়েছে। সুকুমার রায়ও অনেক বার অংশগ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর বিষয় ছিল শিল্প ও নন্দন-তত্ত্ব। এছাড়া ১৯১৪ সালে তিনি অবনীন্দ্রনাথের 'ভারত শিল্পে মূর্তি' বইটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। 'সাম নোটস অন ইণ্ডিয়ান আর্টিস্টিক অ্যানাটমি' নামে সেটি প্রকাশিত হয় ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট থেকে।

শিল্পকলা বিষয়ে তাঁর একান্ত আগ্রহের আরও কিছু পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর জীবন-পঞ্জী থেকে। ১৯১১-তে তিনি বিলেত গিয়েছিলেন মুদ্রণ বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য। সেই সময়ের কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তিনি লণ্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারি দেখেন। ১৫ ও ২২শে ডিসেম্বর দেখেন আর্ট গ্যালারি ও মিউজিয়াম। ১৯৬২-র ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে টেট গ্যালারি পরিদর্শন করেন। ৩১শে মে রটেনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। রটেনস্টাইনের কাছে বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ চেয়েছেন কিভাবে লাইফ ক্লাসে বা অন্যভাবে ভাল ড্রয়িং শেখা যায়। ১৯১২-তেই লণ্ডনে তিনি ফরাসী পোষ্ট-ইম্প্রেশনিস্টদের দ্বিতীয় প্রদর্শনীটি দেখেছিলেন।

এরকম নানা বিচ্ছিন্ন তথ্য থেকে শিল্পকলা ও নন্দন চিন্তায় তাঁর ঔৎসুক্য ও আগ্রহের কথা অনুমান করা যায়। পূর্বোক্ত মুদ্রিত তিনটি লেখা ছাড়া

শিল্প বিষয়ক আলোচনার জন্য কোনো নিদর্শন আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত পৌঁছয় নি। কিন্তু প্রবাসীতে প্রকাশিত ঐ তিনটি লেখায় শিল্প ভাবনায় তাঁর নিজস্বতার অসামান্য পরিচয় ধরা রয়েছে। বাস্তববোধ, বিজ্ঞানচেতনা ও উপযুক্ত ভাব বা আদর্শ এই তিনের সমন্বয় যে সফল শিল্পের প্রাণস্বরূপ, শিল্প যে কেবলমাত্র ভাব নয়, কেবলমাত্র বাস্তবতা বা শুধুমাত্র আঙ্গিক চেতনা নয়, তাঁর এই উপলব্ধি ছড়িয়ে আছে এই তিনটি প্রবন্ধে। ১৯১০ সালে বা ১৯১৪ সালেও আমাদের দেশের শিল্পের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই চিন্তা ছিল প্রায় বৈপ্লবিক। তাঁর আগে ভারত-শিল্প সম্বন্ধে এত নির্মোহ স্বচ্ছ দৃষ্টি খুব কম লোকই দেখাতে পেরেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের আগে আমাদের আধুনিক শিল্পকলার ইতিহাসে এক গভীর শূন্যতা বিরাজ করছিল। ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক ছবির অনুকরণে এক চিত্র রীতি তখন দেখা দিচ্ছিল। ত্রিমাত্রিকতায় তা প্রকৃতির অনুরূপতা আনতে চেষ্টা করত। তার বিষয় ছিল মূলত পৌরাণিক ও ধর্মীয়। কিন্তু তাতে বাস্তবতা, ঐতিহ্য বা সমকালের কোনো স্পর্শ ছিল না। এই বিচ্ছিন্নতার জন্য এক ধরনের নান্দনিক শূন্যতা সেখানে প্রগাঢ় হয়ে উঠত। অবনীন্দ্রনাথই প্রথম শিল্পী যিনি ঐতিহ্য ও সমকাল সম্পৃক্ত এক আধুনিকতার শিল্প ভাষা গড়ে তুলতে পারলেন। ১৮৯৫-তে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক চিত্রমালায় সেই নিজস্ব রীতির সূচনা করতে পেরেছিলেন। সেই নিজস্বতা নানাভাবে বিবর্তিত হয়ে সম্পূর্ণতা পেয়েছে তাঁর সারা জীবনের কাজের মধ্য দিয়ে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম দিকের কাজে, বিশেষত ১৮৯৫-র রাধাকৃষ্ণ সিরিজে মুঘল অনুচিত্র ও ইউরোপীয় একটি বিশেষ ধারার অনুচিত্রের সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন। এর পর তাঁর ছবিতে ক্রমান্বয়ে তিনি জাপানী ও অন্যান্য প্রাচ্য চিত্ররীতির এবং কিছু কিছু ভারতীয় ধ্রুপদী রীতির সারাৎসারও আত্মস্থ করেছেন। কিন্তু শিল্পী হিশেবে যেখানে তাঁর সফলতা তা হল, যতই তিনি পরিণতির দিকে এগিয়েছেন ততই তিনি লোকায়ত শিল্প থেকে তার আঙ্গিকগত নির্যাসকে মেলাতে চেষ্টা করেছেন তাঁর কাজের মধ্যে। এ ছাড়া সমস্ত আঙ্গিকনিরপেক্ষভাবেও ছবিতে এক লাবণ্য বা ভাবের সংযোজন হত, যার ফলে অদ্ভুত শৈল্পিক সংহতি পেত তাঁর যে কোনো ছবি। ফলে তাঁর চর্চা থেকে যে নব্য-ভারতীয় আধুনিকতা জন্ম নিল তৎকালীন জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার পরিপ্রেক্ষিতে তা আদর্শ ভারতীয় চিত্ররীতি হিসেবে সর্বভারতীয় বিস্তার পেয়ে গেল। ১৯০৭ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টস। সোসাইটির প্রদর্শনীর মাধ্যমে ও অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে এই চিত্ররীতি প্রায় সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল।

আমাদের নব জাগরণের মধ্যে যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ছিল, ঔপনিবেশিকতার কারণেই মধ্যে কিছু ভ্রান্তিও ছিল প্রথম থেকেই। ঔপনিবেশিকতা প্রভাবিত আমাদের তৎকালীন যে ইতিহাস চর্চা, এবং সেই ইতিহাস চর্চা থেকে

জাত যে ঐতিহ্য চেতনা তা এক অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত ভারতীয়তার দিকে নিয়ে গিয়েছিল আমাদের। নব্য ভারতীয় চিত্ররীতি সেই ভ্রান্তইতিহাস বোধ ও ভ্রান্ত ঐতিহ্যচেতনায় ভারাক্রান্ত হয়ে বাস্তবতা বিবর্জিত এক আদর্শায়িত শূন্যোচারিতায় পরিণত হয়েছিল। নিজস্ব শৈল্পিক সংহতি ও সমন্বয় চেতনায় অবনীন্দ্রনাথ যে আধুনিকতার উদ্ভাবন করেছিলেন, তার শিষ্য পরম্পরার হাতে তা এক পেলব ভাবালুতায় পর্যবসিত হল। এর অন্যতম এক কারণ হিশেবে রয়েছে শিল্পের তৎকালীন তত্ত্বগত ব্যাখ্যা। তখনকার শিল্পবেত্তা পণ্ডিত যাঁরা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনার সেই ভ্রান্ত নিরিখকেই তাঁরা আদর্শ হিসেবে নিয়েছিলেন। হ্যাভেল সাহেব ভারতের বিশেষ দুএকটি শিল্পরীতিকেই সত্য ভারতীয়তা বলে বুঝিয়ে গেলেন। আর তারপর কুমারস্বামী, নিবেদিতা, স্টেলা ক্রামরিশ, অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী প্রমুখ শিল্প তাত্ত্বিকগণ নিজের নিজের মতো করে একটি বিশেষ কোনো আদর্শকেই ভারতীয়তার স্বরূপ বলে প্রচার করলেন। বাস্তববর্জিত ভাববাদী অবৈজ্ঞানিক এই খণ্ডিত নন্দনচেতনাই বেঙ্গল স্কুলের সফলতার পাপাপাশি তার গভীরতর সংকটেরও কারণ হয়ে উঠল।

'ভারতীয় চিত্রশিল্প' ও 'ভারতীয় চিত্রকলা' নামে সুকুমার রায়ের লেখাদুটি সেই খণ্ডিত নন্দনচেতনার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ। সম্ভবত সুকুমার রায়ই প্রথম যিনি স্পষ্টভাবে এই অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রান্ত ভারতীয়তার বিরুদ্ধে কথা বলতে পেরেছিলেন। যখন আমরা জানি যে এ কথাগুলো তিনি বলেছিলেন মাত্র তেইশ বছর বয়সে, তখন সহজেই তাঁর প্রতিভার গভীরতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী ভারতীয় শিল্পদর্শনের নির্যাসকে বোঝাতে চান এভাবে যে "ভারতীয় শিল্পের সৌন্দর্য বাহিরে নয় ভিতরে"। সুকুমার রায় এই মূলগত ক্ষেত্র থেকেই আপত্তি তোলেন। প্রকৃতির মূল 'বৈশিষ্ট্যগুলি অর্থাৎ 'facts of nature-'-এর কি কোনো মূল্য নেই ভারতীয় শিল্পীর কাছে ? তাই তাঁর প্রশ্ন, "তবে কি আমরা ইহাই বুঝিয়া লইব যে ভারতীয় চিত্রশিল্পে চিত্রবিজ্ঞানের কোনও স্থান নাই ?" "জড় জগতে কি ঘটে না ঘটে, কোনটা সম্ভব কোনটা অসম্ভব এসকল আদৌ ভারতশিল্পের আলোচ্য বিষয়" নয় কি ? প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে বা প্রকৃতিকে অস্বীকার করে যে শিল্প, তা ত বিচ্ছিন্নতার শিল্প। প্রাকৃতিক বাস্তবতা থেকে এই বিচ্ছিন্নতাতেই ভারতশিল্পের সংকট। সুকুমার রায় স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "জগতে নিরবচ্ছিন্ন কল্পনার কোনো অস্তিত্ব নাই। বাস্তবজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই Nature কে অবলম্বন করিয়াই কল্পনার উৎপত্তি। যাহাকে কল্পনায় ঘর বলিয়া কল্পনা করি তাহার ইট সুরকি মালমশলা সবই Nature হইতে চুরি। এরূপ না হইলে এক জনের কল্পনা অপরের বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর হইত না।"

কাব্য ও চিত্রের অন্তর্লীন পার্থক্যকে তিনি এভাবে বোঝেন যে কাব্য ভাব বিনিময় করে কতগুলো শব্দ বা প্রতীক চিহ্নের ব্যবহারে। কবির মানস প্রতিমা শব্দের সংকেতে ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। আবার সেই ধ্বনি থেকে পাঠক বা শ্রোতা

উদ্ঘাটন করে নেন তাঁর নিজস্ব মানস প্রতিমা। কাব্যের ভাষা তাই বিমূর্ত, অনেকটাই সাংকেতিক। কিন্তু চিত্রের ভাষা অনেক প্রত্যক্ষ। কোনো কৃত্রিমতা নেই তাতে। শিল্পীকে তাঁর মানস প্রতিমার স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ রূপ উদ্ভাবন করতে হয়। তাই "কবির পরোক্ষচিত্রে যে অতিশয়োক্তি দূষনীয় বোধ হয় না, শিল্পে তাহা অক্ষরে অক্ষরে অনূদিত হইয়া প্রত্যক্ষমূর্তি পরিগ্রহ করিলে তাহাকে উদ্ভট ছাড়া আর কি বলা যায় ?" আমাদের মনে পড়তে পারে রবীন্দ্রনাথ এরও প্রায় ত্রিশ বছর পরে যামিনী রায়কে লেখা এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন ছবির প্রায় এরকমই এক সংজ্ঞা যে ছবি হচ্ছে এক "প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষী।"

'ভারতীয় চিত্রকলা' নামের প্রবন্ধে সুকুমার রায় চেষ্টা করেছিলেন শিল্পে বাস্তববাদ ও আদর্শবাদের মধ্যে এক সমন্বয় স্থাপনের।"Realism ও Idealism বাস্তব শিল্প ও ভাবপ্রধান শিল্প শিল্পের দুই দিক মাত্র। উভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকা দূরে থাকুক, একটার সহায়তা ব্যতীত আর একটা কখনও সম্যক সার্থকতা লাভ করিতে পারে না, Realism শিল্পের মূল ভিত্তি, Idealism তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ, এবং উভয়ের সমন্বয়ে তাহার পূর্ণ সফলতা।" কাজেই ভাবকে প্রকাশ করতে হলে বাস্তবের মধ্য দিয়েই হবে তার প্রকাশ। ভাব, বাস্তবতা ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ই আধুনিক শিল্পনন্দনে সুকুমার রায়ের অন্যতম এক অবদান।

বাস্তবতার সঙ্গে শিল্পের এই বিরোধের বিরুদ্ধে একসময় সোচ্চার হতে হয়েছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে। ১৯১৬তে কলকতায় 'বিচিত্র সভা' স্থাপনের মধ্য দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন তৎকালীন তথাকথিত ভারতীয়তার শিল্পনন্দনের এক বিস্তার। সেই পেলব ভারতীয়তার বিরুদ্ধে এর পরেও অনেকবার তাঁকে কলম ধরতে হয়েছিল। নানা সময়ে তাঁর অতৃপ্তির কথা জানিয়েছেন মীরা দেবী, রথীন্দ্রনাথ বা অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে। ১৯২৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আর্ট অ্যান্ড ট্রাডিশন' বক্তৃতায় স্পষ্টভাষায় জানিয়েছিলেন কোথায় নিহিত সেই শিল্পনন্দনের দুর্বলতা, কীই বা হতে পারে তার মুক্তির পথ। যে রবীন্দ্রনাথ মীরা দেবীকে লেখা চিঠিতে একদিন আক্ষেপ করেছিলেন যে চিত্ররচনা তাঁর নিজস্ব পথ নয়, যদি তা হত' তাহলে তিনি দেখাতে পারতেন কেমন হতে পারে তার আধুনিকতার স্বরূপ, সেই রবীন্দ্রনাথই সে কথা বলার প্রায় একদশক পরে সত্যিসত্যিই নিজে ছবি এঁকে উন্মোচন করেছিলেন আধুনিকতার নতুন পথ।

বেঙ্গল স্কুলের নন্দন সম্পর্কে তৎকালীন প্রায় সার্বিক আত্মতুষ্টির মধ্যেও বিরোধিতা জাগে নি একেবারে, তা নয়। ১৯২১-এর এপ্রিলে 'মর্ডান রিভিউ-'তে ফনীন্দ্রনাথ বসুর ভাস্কর্যের আলোচনায় সন্ত নিহাল সিং-এর একটি লেখাকে কেন্দ্র করে মর্ডান রিভিউ, রূপম, বিজলি পত্রিকা জুড়ে গড়ে উঠেছিল এক বিতর্ক; তাতে যোগ দিয়েছিলেন অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলি, বিনয় কুমার সরকার, স্টেলা ক্রামরিশ, প্রমথ চৌধুরী, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর মতো মানুষেরা। কিন্তু

মূল বিতর্কটা হয়েছিল অর্ধেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী ও বিনয় কুমার সরকারের মধ্যে। অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলীর তথাকথিত ভারতীয়তার নন্দনের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন প্যারিস থেকে বিনয় কুমার সরকার 'রূপম' পত্রিকায় (জানুয়ারি, ১৯২২) 'ইস্হেটিকস অব ইয়ং ইণ্ডিয়া' নামে এক বড় প্রবন্ধে।

এই যে সমস্ত অতৃপ্তি তত্ত্বের স্তরে বা চিন্তার স্তরে ছিল, চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে বিশের দশকের শেষ দিক বা তিরিশের দশকের গোড়ার দিক থেকেই, ভারতীয়তার নতুন আত্মপরিচয় নির্মাণে তার প্রকাশ দেখা দিতে থাকে যামিনী রায়ের বা রবীন্দ্রনাথের ছবিতে। আর এই অতৃপ্তিই চল্লিশের দশকের তরুণ শিল্পীদের মধ্যে বিদ্রোহের ইন্ধন জুগিয়েছিল।

এই অতৃপ্তিকেই প্রথম এক তাত্ত্বিক রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন সুকুমার রায়। সুকুমার রায় গ্রন্থচিত্রণের বাইরে চিত্রচর্চা করেন নি কখনো। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাঁর প্রতিভার দ্যুতি, সমস্ত কিছুকে বাস্তবতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার ও বিচার করার ক্ষমতা ও শিল্পনন্দন বিষয়ে তাঁর তীব্র-অন্তর্দৃষ্টি আমাদের কল্পনা করতে উদ্বুদ্ধ করে যে যদি চিত্রকর হিসেবেই তাঁর আবির্ভাব হত, তাহলে রবীন্দ্রনাথ বা যামিনী রায়ের আগে তিনিই হয়ত বেঙ্গল স্কুলের গতানুগতিকতা থেকে বেরিয়ে আসার নতুন পথের নির্দেশ দিতেন। আমরা পরে দেখব তাঁর গ্রন্থচিত্রণের ছবির মধ্যেই এরকম প্রতিশ্রুতির আভাস আছে।

একদিকে ভারতীয়তার উদ্বায়ু ভাবালুতাকে যেমন তিনি আঘাত করেছিলেন, তেমনি অন্য দিকে পাশ্চাত্য চিত্রকলার অতিরিক্ত আঙ্গিকসর্বস্বতা ও ভাববর্জিত বিজ্ঞান নির্ভরতাকে তিনি সমালোচনা করেছিলেন।

'শিল্পে অত্যুক্তি' নামে তাঁর তৃতীয় প্রবন্ধটিতে তিনি প্রথমেই বিজ্ঞানের এই প্রাথমিক সত্যটির উল্লেখ করেছেন যে "আমাদের চোখ যাহা দেখে আর মন যাহা দেখে এই দুইটার মধ্যে অনেক প্রভেদ।" প্রকৃতি ও বাস্তবতা থেকে প্রত্যক্ষভাবে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় শিল্পী সেই অভিজ্ঞতাকেই শিল্পে ব্যবহার করেন। কিন্তু সরাসরি নয়। অনেক গ্রহণবর্জনের মধ্য দিয়ে। সব শিল্পীই জানেন চোখে তিনি যেমনটি দেখেন ঠিক তেমন আঁকলেই তাঁর মনের ভাবটি সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় না। তাই শিল্পীকে সব সময়ই যথাযথতা থেকে দূরে সরতে হয়। তিনি যে আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তুলতে চান রূপ সে অনুযায়ী ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাকে পরিশ্রুত করে নিতে হয়। সুকুমার রায় বলছেন, "এইখানেই শিল্পঘটিত সকল প্রকার সত্য ও মিথ্যা অত্যুক্তির মূল বলা যাইতে পারে।" এই হিসেবে অত্যুক্তিবা ডিস্টরশন যে কোনো শিল্পেরই প্রাথমিক কথা।

কিন্তু কেমন এই অত্যুক্তির স্বরূপ? কতটা পর্যন্ত গ্রাহ্য হতে পারে প্রকৃতির স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার? এ সম্পর্কে সুকুমার রায়ের ধারণার কিছুটা আভাস পাই হিরণ কুমার সান্যালের এক স্মৃতিচারণায়।

"একদিন 'আর্ট" সংক্রান্ত একটি কথা তাতাদা (সুকুমার রায়) বলেছিলেন, সেটা অনেকদিন মনে দাগ কেটে রেখেছিল। বলেছিলেন যে, চিত্রকর আঁকছে নিসর্গ দৃশ্য, আমরা মনে করি সে প্রকৃতিকে অনুসরণ করছে। এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন রাস্কিনের কথা। রাস্কিন একদিন কনস্টেবলের ছবি আঁকা দেখছেন পেছনে দাঁড়িয়ে। তিনি আঁকছেন ঘরবাড়ি গাছপালা—কিন্তু এগুলো নিয়ে ওরকম মোচড় দিচ্ছেন কেন? একটা গাছ ওখানে ছিল সে একটু পিছিয়ে গেল, রাস্তাটা স'রে গেল আর-একটু ডান থেকে বাঁ দিকে। যে লোক দেখবে সে দেখবে তাঁর চেনা জায়গারই ছবি; কিন্তু একটু নজর করলে বুঝবে যে সেই চেনা জায়গাগুলোই ডান দিক থেকে বাঁ দিকে নাড়িয়ে দিয়েছেন। সে ভাববে, বাঃ, এ আর্টিস্ট ত বেশ মজা করেছেন। ঘরের আসবাবপত্র সেরকমই থাকল কিন্তু সামান্য ডান দিক থেকে বাঁ দিকে সরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরটাকে একটু অন্যরকম করে সাজানো। তাই বললেন যে; এই যে মনে করা যাচ্ছে যে, আর্টিস্ট প্রকৃতির হুবহু নকল করছে, ঠিক তাঁরা তা করে না।"

কিন্তু প্রকৃতির অন্তর্নিহিত নিয়মকে বুঝতে গিয়ে শিল্পী যখন বৈজ্ঞানিক সত্যকে খণ্ডিত করে দেখেন, নিয়মের একটি অংশকে সম্পূর্ণ বা স্বরাট বলে ভুল করেন, তখনই খণ্ডচেতনার নানা বিপর্যয় দেখা দেয় শিল্পে। এই বিপর্যয়ের দৃষ্টান্ত দেখেছিলেন সুকুমার রায় পাশ্চাত্য আধুনিকতার কোনো কোনো ধারায়।

ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের কাছে প্রকৃতি তার স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হয়ে কেবল আলোকবিন্যাসের নানা মাত্রায় পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল। রঙ ও আলোর বিজ্ঞানকে এত বড় করে দেখলেন ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা যে সেই আদর্শ অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক সত্যকে সার্বিক করে দেখতে গিয়ে প্রকারন্তরে বিজ্ঞান থেকেই বিচ্যুত হলেন তাঁরা। এই বিচ্যুতির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত 'পয়েন্টালিজম' বা 'বিন্দুবাদ'। বিজ্ঞান বলে "চোখের মধ্যে কয়েকটা মৌলিক বর্ণের পাশাপাশি সমাবেশকেই" আমরা আলো হিসেবে দেখি। সেই সত্যকে আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করতে গিয়ে বিন্দুবাদীরা পটের উপর বিভিন্ন মৌল বর্ণের ফুটকির সমন্বয়ে প্রকৃতির প্রতিরূপ গড়তে চাইলেন। ফলে বিজ্ঞানের সত্য ও শিল্পের সত্য উভয় থেকেই বিচ্যুত হলেন তাঁরা। এভাবেই গতির বিজ্ঞানকে হুবহু চিত্রের সত্যে পরিণত করতে চেয়ে কিছু উদ্ভটের সৃষ্টি করেছিলেন কিউবিস্ট শিল্পীরা।

বাস্তবসম্মত আকারের প্রকট উপস্থিতির বিরোধিতা করতে গিয়ে আকারকে সম্পূর্ণভাবে রঙে দ্রবীভূত করে ফেলেছিলেন ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা। আকার বা আয়তনের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আবার তন্নিষ্ঠ সাধনা করতে হয়েছিল সেজানের মতো শিল্পীকে। কিউবিস্ট শিল্পীরা আবার প্রকৃতিকে বুঝতে চাইলেন কতগুলো মৌল আকারের সমন্বয় রূপে। সুকুমার রায় লিখছেন, "অসঙ্গত ঋজুতার টানে সকল ছন্দকে এবং রেখা ও গঠনের সৌন্দর্যজাত সকল সংস্কারকে একেবারে নির্মূল করিতে না পারিলে কিউবিস্ট নিশ্চিন্ত হন না।"

এখানে একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হয়। পয়েন্টালিজম বা ফিউচারিজম সম্বন্ধে যে আঙ্গিক সর্বস্বতায় নান্দনিক বিচ্যুতির অভিযোগ এনেছিলেন সুকুমার রায়, আজকে তাঁর সে কথা ইতিহাসের গতিতেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ইম্প্রেশনিজম বা কিউবিজম সম্বন্ধেও তিনি এনেছিলেন একই ফর্মালিজমের অভিযোগ। কিউবিজমের এই ফর্মালিজমের দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর প্রবন্ধের সঙ্গে তিনি ছেপেছিলেন ব্রাঁকুসির 'শ্রীমতী পোজানি' নামে ভাস্কর্য বা পিকাসোর 'বেহালাবাদক কুবেলিকের প্রতিকৃতি' নামে ছবি। আজ এতদিন বাদে এই কাজদুটিকে অন্তত ফর্মালিজমের দায়ে অভিযুক্ত করে নাকচ করতে পারি না। আমরা জানি ইম্প্রেশনিজম বা কিউবিজমের মধ্যে এক পরিবর্তিত পৃথিবীর সৌন্দর্য চেতনার নিরিখ তৈরি হয়েছে। একে অস্বীকার করে শিল্পের পরবর্তী প্রগতির কথা ভাবা যায় না। সুকুমার রায় তৎকালীন পাশ্চাত্য আধুনিকতায় ভাব ও আঙ্গিকের সফল সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত কি কনস্টেবল বা টার্নারের ছবিতে দেখেছিলেন? একেও ছাড়িয়ে তখনকার যে আধুনিকতা তার সবটাকে কি মানতে পারেন নি তিনি?

সে যাই হোক, তাঁর শিল্পচিন্তা থেকে যে মূল কথাটি পাই তা হ'ল, বিজ্ঞানকে খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখতে গিয়ে এক ভ্রান্তি থেকে অন্য ভ্রান্তিতে পেঁছিল পাশ্চাত্য আধুনিকতা। এই খণ্ডিত দৃষ্টিকেই, আদর্শ ও বিজ্ঞানের এই বিচ্ছিন্নতাকেই, সুকুমার রায় শিল্পের মৌল সমস্যা বলে বুঝেছেন। এবং এর মধ্যে এক সমন্বয়ের সন্ধান করেছেন।

সুকুমার রায়ের সাহিত্যকে যেমন, তাঁর গ্রন্থচিত্রণকেও আমাদের এই সমন্বয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝে নেওয়ায় চেষ্টা করতে হয়।

।। তিন ।।

লেখার সঙ্গে আঁকা হাত ধরাধরি করে চলে আসছে সেই প্রাচীন কাল থেকে। প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই বলা যায়। লিখতে শেখার আগেই মানুষ আঁকতে শিখেছে। বাস্তবের প্রতিরূপ থেকেই এসেছে সংকেত। যেমন একপাল হরিণ ছুটে যাচ্ছে বোঝাতে সামনে পেছনে দুটো হরিণ আর মাঝখানে কিছু রেখার বুননই হয়েছে যথেষ্ট কয়েকটি রেখা তখন অনেক হরিণের প্রতীক হয়ে গেছে। অক্ষরের সৃষ্টিও ত বাস্তবের রূপায়ণকে পরিশুদ্ধ করতে করতে সংকেতের রূপান্তরণের মধ্য দিয়েই।

পৃথিবীর প্রথম গ্রন্থচিত্রণের যে নিদর্শন ঐতিহাসিকদের হাতে এসেছে তা ১৯৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মিশরের প্যাপিরাস রোল বা জড়ানো প্যাপিরাস। তার আগেও যে গ্রন্থচিত্রণ হয় নি তা নয়। কিন্তু তার কোনো নজির ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হিসেবে আমাদের হাতে পেঁছিায় নি। মিশরে লেখার শুরু খ্রীষ্টপূর্ব তিরিশ শতকে। তাই ধরে নেওয়া যেতেও পারে আরও আগেই প্রচলন হয়েছিল লেখার সঙ্গে আঁকারও। সে যাই হোক, সেই যে প্রথম গ্রন্থচিত্রণ সেখানে লেখার

সঙ্গে পাওয়া গেছে ছোট ছোট ছবি। লেখাটাই প্রধান ছিল। ছবি ছিল গৌণ।

এই মিশরের গ্রন্থচিত্রণেই পরবর্তী কালে দেখা গেছে, ছবি ক্রমান্বয়ে প্রাধান্য পেয়েছে। শিল্পী ছাপিয়ে গেছেন লেখককে। গ্রন্থচিত্রণের এই এক মূলগত সমস্যা। লেখা বড় না আঁকা বড়, এই টানাপোড়েন চলেছে আজ পর্যন্তও।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন লেখক বা শিল্পী জোড় দিয়েছেন একটি বা অন্যটির উপর, তাঁর ব্যক্তিগত প্রবণতার উপর ভিত্তি করে। লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি যেমন লিখেছিলেন, "শুধু কথা দিয়ে মানুষের রূপ বর্ণনা করতে চায় যে, তাঁর উচিত সে চেষ্টা থেকে বিরত থাকা। কেননা যতই নিপুণ হয় সে বর্ণনা, ততই গণ্ডীবদ্ধ হয়ে যায় মানুষের মন, ততই বর্ণিত বিষয়ের জ্ঞান থেকে দূরে সরে যায় সে। সেজন্যই দরকার একই সঙ্গে আঁকা এবং বর্ণনা করা।" শুধুই বর্ণনা, শুধুই শ্রব্য প্রতীক বাস্তবতার সম্পূর্ণ প্রতিরূপ গড়ে তোলে না। দৃশ্যতার সমন্বয়েই সম্পূর্ণতা পেতে পারে তা। এই মত ছিল লিওনার্দোর। কবির কল্পনাকে উদ্ঘাটিত করে তুলবেন শিল্পী, এই ছিল গ্যেটের মত। "The artist must think out to the end the poet's ideas." একক ভাবে সম্পূর্ণ নয় লেখা বা আঁকা। একে আলো ফেলবে অন্যের উপর। তবু আলো ফেলা অর্থ যেন অতিরিক্ত উজ্জ্বল করে ঢেকে দেওয়া না হয় তার মুখ। আঁকা যদি ছাপিয়ে যায় লেখাকে কাব্য যে কল্পনাকে উদ্দীপিত করে, কাব্য থেকে হারিয়ে যাবে সেই উদ্দীপনা। একথা ভেবেই হয়ত চার্লস ল্যাম্ব বলেছিলেন, তাঁর শেক্সপিয়রের সঙ্গে যে ছবি থাকবে তা হোক যথেষ্ট খারাপ ছবি, তাই তিনি চান। ছবি যেন শেক্সপিয়রকে ছেয়ে ফেলে না। লেখা ও আঁকার এই একাত্মতারই সিদ্ধান্তে আসেন লিটন ল্যাম্ব; যিনি নিজে ছিলেন গ্রন্থচিত্রণের সফল শিল্পী,—"ইলাস্ট্রেশনের যৌক্তিকতা আসে তখনই যখন তা এমন কিছু যোগ করে লেখায় সাহিত্য যার নাগাল পায় না।

এই রীতিতেই গড়ে ওঠে যেন আজকের দিনের গ্রন্থচিত্রণ। কবিতা বা গল্পের যে কাহিনী তার হুবহু চিত্রানুবাদ নয়। অতিরিক্ত কিছু ব্যঞ্জনা। আমাদের দেশে মধ্যযুগের গ্রন্থচিত্রণ যদি দেখি, পাল যুগের অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা বা মুঘল যুগের কোনো গ্রন্থচিত্রণ, সেখানে যে ছবি, ছবি হিসেবেই তা এত উচ্চমানের যে লেখাকে তা ছাপিয়ে যায়।

আধুনিক শিল্পী লেখককে ছাপিয়ে নিজেকে বড় করে তুলতে চান না। আবার লেখার বিষয় নিরপেক্ষভাবে নিছক অলঙ্করণও করে তুলতে চান না গ্রন্থচিত্রণকে, যেমন দেখা যেত মধ্য যুগে, বিশেষত ঐস্লামিক সংস্কৃতিতে। আধুনিক গ্রন্থচিত্রণে থাকে লেখার সঙ্গে আঁকার এক ভারসাম্য। লেখায় কবি বা লেখক শব্দ প্রতীকে গড়ে তোলেন শ্রব্য-প্রতিমা। শিল্পী তাঁর ছবিতে রেখা ও রঙে তাকে রূপান্তরিত করেন দৃশ্য প্রতিমায়। রূপান্তরিন করেন বললে ভুল বলা হয়। লেখার অন্তর্লীন যে ভাবগত নির্যাস, তা তাঁকে উদ্দীপিত করে দৃশ্য প্রতিমার সৃষ্টিতে। যে দৃশ্য

প্রতিমা লেখার ভাব-সাপেক্ষ হয়েও স্বাধীন। দুই প্রতিমার স্বাধীনতার ক্ষেত্র থেকে তাদের যে পারস্পরিক আদানপ্রদান ও টানাপোড়েন তাতেই সৃষ্টি হয় এক সমন্বিত প্রতিমার। এই সমন্বিত প্রতিমার সৃষ্টিই আধুনিক গ্রন্থচিত্রণের মূল কথা।

লেখার সঙ্গে ছবি দুভাবে উদ্দীপিত করবে পারে পাঠককে। লেখার যে শ্রব্য-প্রতিমা, অর্থগত দিক থেকে তার সঙ্গে কোনো সংযোগ না রেখেই, বরং দৃশ্যের বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে পাঠকের মনে। অথবা লেখারই এক দৃশ্যরূপ হতে পারে তা। লেখায় যা বলা হল, তাকেই যেন সম্পূর্ণতা দিল ছবি। শুধু সম্পূর্ণতাই দিল না, কল্পনাকে এক অভিনবত্বের দিকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করল। দুই সুপরিচিত উৎস থেকে তুলে আনা যায় এই দুই-এর দুটি দৃষ্টান্ত! 'সহজ পাঠ' প্রথম ভাগে 'চ ছ জ ঝ' দলে দলে। বোঝা নিয়ে হাটে 'চলে'— এই ছড়ার সঙ্গে নন্দলাল ছবি আঁকেন সাদা কালোর লিনো-কাটে অন্ধকার ভেঙ্গে দেখা দিয়েছে ভোরের প্রথম সূর্যের আলো, তাতে দূরের আবছা দেখা যাচ্ছে মাঠের শেষ গাছের সারি। লেখার সঙ্গে আঁকার প্রতিমাগত কোনো মিল নেই এখানে। আবার রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সে'-র সঙ্গে প্রথম যে ছবিটি এঁকেছেন তাতে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে এরকম একটি মানুষের আভাস, আর পাশে হাল্কা রেখায় কয়েকটি গাছ। ছবিটিতে দৃশ্যরূপ ধরা পড়েছে এই কথার যে, "সবাই মিলে হামাগুড়ি দাও ফিরে এসো চতুষ্পদী চালে যদি ধরণীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাও।"

এই দুই ধারার চিত্রণ ছাড়াও আছে আরও একটি ধারা। ছবি যেখানে হয়ে ওঠে লেখারই এক প্রসারণ। লেখার সঙ্গে সম্পর্ক একটা আছে কিন্তু লেখার ভেতরের অর্থকে অনেক প্রসারিত করছে ছবি। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনে হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি ধরণের যাত্রাপালা 'খুদ্দুর যাত্রা' বা 'ক্ষুদি রামলীলা'-র এক জায়গায় রাবণের যুদ্ধ হুংকারের পাশেই যখন কাগজ কেটে বসিয়ে দেন জার্মান সেনানায়কদের ছবি আর স্বস্তিকা চিহ্ন, তখন লেখা অন্য এক তাৎপর্যের দিকে প্রসারিত হয়ে যায়। অবনীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টান্তটি অবশ্য সঠিক অর্থে গ্রন্থচিত্রণের নয়। তবু এ থেকে তৃতীয় ধারার ধরনটা অনুমান করে নিতে পারি।

ছোটদের লেখার সঙ্গে ছবি আঁকা হয় যখন, তখন উপরোক্ত তিনটি ধারার মধ্যে দ্বিতীয়টিই অনুসরণ করেন অধিকাংশ লেখক বা শিল্পী। এটি করতে গিয়ে কখনো কখনো গল্পের বা ঘটনার যান্ত্রিক চিত্ররূপ হয়ে যেতে পারে ছবি। সেখানে এমন একটু ফাঁকা জায়গা থাকেনা যেখানে কল্পনার স্বাধীন সঞ্চরণ ঘটতে পারে। শিশু সাহিত্যে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের অবদান অনস্বীকার্য। স্বয়ং রবীন্দ্র-নাথ লিখেছিলেন তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি' সম্বন্ধে—"দক্ষিণারঞ্জন বাবুর ঠাকুমার ঝুলি বইখানি পাইয়া তাহা খুলিতে ভয় হইয়াছিল। আমার সন্দেহ ছিল, আধুনিক বাংলার কড়া ইস্পাতের মুখে ঐ সুরটা বাদ পড়ে।······কিন্তু দক্ষিণা-বাবুকে ধন্য। তিনি ঠাকুরমার মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পাঁতিয়াছেন

তবু তাহার পাতাগুলি তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে।" কিন্তু আজকের দৃষ্টিতে যখন আমরা তাঁর গল্পের সঙ্গের ছবিগুলির দিকে তাকাই, তখন গল্পের ঐ সতেজ ও লৌকিক পরিমণ্ডলের পাশে ছবিগুলিকে একটু আড়ষ্ট ও যান্ত্রিকই মনে হয়। আঁকার পদ্ধতিতে তিনি যে ইউরোপীয় বাস্তবানুগতা চিত্রায়ণের পথ নিয়েছেন, গল্পের লৌকিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে তা একেবারেই খাপ খায় না। গল্পের ভেতরকার কল্পনার বিস্তার নেই ছবিতে। এই যান্ত্রিকতা আজো অনেক পেশাদারি চিত্রায়ণে লক্ষ্য করা যায়।

একদিক থেকে বাংলা ভাষায় আধুনিক ও সফল শিশুসাহিত্যিক হিসেবে উপেন্দ্রকিশোরই যেমন প্রথমতম এক প্রতিভূ, শিশু সাহিত্যের সফল চিত্রায়ণেও তাঁকেই প্রথমের মর্যাদা দেওয়া যায়। উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন রীতিমতো সুদক্ষ শিল্পী। প্রথাগত ভাবে ছবি আঁকা শেখেন নি যদিও, তবু তাঁর রেখার চলন দেখলেই তাঁর দক্ষতা বাঝা যায়। রঙীন ছবি ছাপার ক্ষেত্রেও এ দেশে তিনিই পথিকৃৎ। লীলা মজুমদার লিখেছেন "জল রঙ-এর ওয়াশ দিয়ে তাঁর ছবি আঁকার পদ্ধতি, হাফটোনে সেগুলি ছাপার নিয়ম, এদেশের গ্রন্থশিল্পে নতুন যুগ এনে দিল।" আর সত্যজিৎ রায় বলেছেন "ইলস্ট্রেটর হিসেবে উপেন্দ্রকিশোরের কাজে যে দক্ষতা ও রীতি বৈচিত্র দেখা যায় তার তুলনা ভারতবর্ষে নেই।" উপেন্দ্রকিশোরে তাই শিশুদের উপযোগী সচিত্রকরণের সমস্ত গুণাবলীর প্রথম বিকাশ দেখা যায়। তিনিও অবশ্য বাস্তবানুগতা পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন আঙ্গিকের দিক থেকে। কিন্তু তাঁর গল্পের মতোই এমন এক দেশীয় লোকায়তিক ঐতিহ্যের ছোঁয়ায় সজল ও সরস হয়ে ওঠে সেগুলি যে তাতে এক ভিন্ন রসের সৃষ্টি হয়। ছবির মধ্য দিয়ে এই রস সৃষ্টি উপেন্দ্রকিশোরের অসাধারণ কৃতিত্ব। এই রস শুধু কৌতুক বা হাস্যরসই নয়, করুণা ও বিস্ময় মেশানো আছে তার সঙ্গে। সব মিলে এক আদর্শায়িত আনন্দের জগৎ গড়ে উঠেছে সেখানে। আবার তাঁর ছবি কাহিনীর সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কাহিনী নিরপেক্ষভাবে শধু ছবি হিসেবে তার আবেদন হয়ত ততটা নেই, যতটা রবীন্দ্রনাথর 'সে'-র ছবিগুলোয় তা আছে।

সুকুমার রায়ের ছবিতে উপেন্দ্রকিশোরের মতো রেখার প্রসাদগুণ হয়ত নেই। কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতা ক তিনি অতিক্রম করতে পেরেছেন, সত্যজিৎ রায় যেমন বলেছেন, দুটি বৈশিষ্ট ঃ একটি, তাঁর অসামান্য কল্পনাশক্তি, দ্বিতীয়টি অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। এই দুই গুণের সঙ্গে বাস্তববোধ ও বিজ্ঞানচেতনার সমন্বয় তাঁকে কবি হিসেবে যেমন মহৎ করেছে, শিল্পী হিসেবেও বিশিষ্ট করেছে।

॥ চার ॥

ললিতশিল্প হিসেবে ছবি আঁকেন নি কখনো সুকুমার রায়। ছবি এঁকেছেন প্রয়োজনে। শিশুদের জন্য তাঁর লেখাকে সরস ও দৃশ্যগ্রাহ্য করে তোলার জন্য। ১৯০৬ সালে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে অনার্স নিয়ে তিনি স্নাতক হন। সেই

বছরই সম্ভবত শুরু হয় 'ননসেন্স ক্লাব'। ননসেন্স ক্লাবের পত্রিকা ছিল 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'। ননসেন্স ক্লাবের সময় থেকেই সম্ভবত তাঁর ছবি আঁকার সূত্রপাত। ক্লাবের নিমন্ত্রণ পত্রাদির জন্য বা তার পত্রিকার জন্য তাঁকে আঁকতে হত। ১৯১৩ সালে সুকুমার রায় যখন ইংলণ্ডে তখনই উপেন্দ্রকিশোর 'সন্দেশ' পত্রিকা শুরু করেন। দেশে ফিরে সেই সময় থেকে ১৯২৩-এ জীবনাবসানের আগে পর্যন্ত সন্দেশের জন্য নিয়মিত ছবি আঁকতে হয়েছে তাঁকে।

বৈচিত্রের দিক থেকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় সুকুমার রায়ের ছবি। প্রথমটি প্রচ্ছদ হিসেবে আঁকা রঙীন ছবি। এর মধ্যে পড়বে বিভিন্ন সময়ে করা সন্দেশের প্রচ্ছদ। 'আবোল তাবোল' বইয়ের জন্য করা প্রচ্ছদ বা সন্দেশের জন্য ইলাস্ট্রেশন নয়, সম্পূর্ণ ছবি। যার একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে 'এক্কাগাড়ি খুব ছুটেছে' নামের ছবিটি সকলেরই পরিচিত। আর দ্বিতীয় ভাগে আসে তাঁর লেখার জন্য আঁকা ছবি বা ইলাস্ট্রেশন।

প্রচ্ছদ বা একটু বড় মাপের রঙীন ছবিতে কৌতুক বা হাস্যরসই প্রধান সুর। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'এক্কাগাড়ি খুব ছুটেছে' ছবিটিরই কথাই মনে করা যায়। রঙের পর্দার বিন্যাসে ছবিটি অনুভূমিক ভাবে চারিটি ভাগে বিভক্ত। একেবারে সামনে মাঠের সবুজ। তার পেছনে পরপর রাস্তার হাল্কা ইটের রঙ, সবুজে নীলে মেশানো বনের আভাস, একেবারে পেছনে চিত্রক্ষেত্রের উপরের অংশ আকাশের হাল্কা নীল। পাশ্চাত্য রীতির বাস্তবানুগ রীতিতে ছবিটি আঁকা। মানুষ বা পশু পাখি আঁকা হয়েছে ত্রিমাত্রিকভাবে, বর্তনাগুণ সহ। পার্সপেক্টিভ ব্যবহারেও পাশ্চাত্য রীতি যথাযথতা আনার প্রয়াস। মধ্যবর্তী অংশে রাস্তা দিয়ে দ্রুতবেগে ধাবমান ঘোড়ায় টানা এক্কাগাড়ি। গাড়ি চলার বেগে ছিটকে পড়ছে যুবক ও বৃদ্ধ দুজন আরোহী। ছড়িয়ে পড়েছে তাদের ছাতা, জলের পাত্র, জুতো, জামা ইত্যাদি। উপরে উড়ছে দুটো কাক। নীচে একটা ছুটন্ত কুকুর। সব মিলে অতিরঞ্জন থেকে তৈরি হয়েছে কৌতুকরস। নির্মল এক হাল্কা হাসির পরিবেশ। ছবিটির মূলগত যে দুর্বলতা, তা হল বস্তু বা প্রাণীর অবয়বেয় অঙ্কনগত দুর্বলতা। সেই দুর্বলতাই গল্পের বাইরের খোলস ছাড়িয়ে ছবির গভীরতর বিশুদ্ধ রসের দিকে নিয়ে যায় না। সেরকম কোনো উদ্দেশ্যও হয়ত শিল্পীর ছিল না। এসব ছবি প্রকৃত অর্থে ইলাস্ট্রেশন নয়। তবু এরা যথেষ্ট কাহিনী নির্ভর বা সাহিত্য-নির্ভর। এদের পূর্বোক্ত গ্রন্থচিত্রণের শ্রেণী বিভাগের প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

আমরা দেখেছি ছবি রূপবন্ধের দিক থেকে বাস্তবতাবর্জিত বা চিত্রবিজ্ঞান বর্জিত তৎকালীন বেঙ্গল স্কুলের পেলব সৌন্দর্যচর্চার সমর্থক ছিলেন না সুকুমার রায়। পাশ্চাত্য চিত্রবিজ্ঞানকে তিনি অনুসরণ করেছেন। দৃশ্যমান বাস্তবতার উপরের অবয়বকে তিনি ক্রমান্বয়ে দ্রবীভূত করে নিয়েছেন। অতিরঞ্জনের পথে তার স্বরূপকে পাল্টে নিয়েছেন। এতটাই পাল্টেছেন যে তা আর তাঁর ভাষায় নিছক

'অত্যুক্তি' না থেকে অনেকটা সুররিয়ালিস্টধর্মী হয়ে বাস্তবতার আপাত আবরণকে ছাড়িয়ে তার গভীরতর বিশ্লেষণ হয়ে গেছে। তেমনি তাঁর পরিণত পর্বের গল্প বা কবিতার সঙ্গে যে ছবি তাতেও সঞ্চারিত হয়েছে এই গুন। এই অর্থে লেখার জন্য আঁকা তাঁর ছবিকে পূর্বোক্ত দ্বিতীয় ভাগে রাখতে পারি।

দ্বিতীয় বিভাগের এই ছবিগুলিকে প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। প্রথম ভাগে পড়বে তাঁর ছোট গল্পগুলোর জন্য যেসব ছবি সেগুলো। যেমন 'দ্রিঘাংচু' গল্পে কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে রাজা মশাই, 'রাজার অসুখ' গল্পে গাছের তলায় সন্ন্যাসীর সামনে রাজার আমত্য, 'বোকা বুড়ি' গল্পের বুড়ির সামনে খরগোস হাতে বুড়ো, 'পুতুলের ভোজ' গল্পে টেবিলে বসে ভোজ খাচ্ছে ইঁদুরেরা ইত্যাদি ছবিগুলি। এগুলিকে নিছক ইলাস্ট্রেশনও বলা যেতে পারে। গল্পের একটি বিশেষ ঘটনার দৃশ্যরূপ দেওয়া ছাড়া এদের গভীরতর ভূমিকা কিছু নেই। এবং অঙ্কন হিসেবেও এদের অধিকাংশই গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।

এই একই ভাগের অন্তর্গত করে ভাবতে পারি 'আবোল তাবোল'-এরও কিছু ছবি। 'হাত গণনা'র গণক, 'হুলোর গানে'র বিড়াল দুটি, 'বাবুরাম সাপুড়ে'র ছবি ইত্যাদি। কিন্তু এখানেও একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তা হল, মুখের অদ্ভুত ভাবব্যঞ্জক অভিব্যক্তি। চোখ ও মুখের এই অভিব্যক্তির জোরেই ছবিগুলি অন্য মাত্রা পেয়ে যায়।

এই অভিব্যক্তির অনন্যতার সঙ্গে অন্য একটি গুণ জুড়ে তৈরি হয় দ্বিতীয় আর একটি শ্রেণী। এখানে ছবি নিছক অলঙ্করণ নয়। লেখারই যেন এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ছবি ছাড়া সম্পূর্ণ হত না লেখাটি। 'আবোল তাবোল-এর 'খিচুড়ি'র যে আজব জন্তুগুলো—কচ্ছপ, হাসজারু, টিয়ামুখো গিরগিটি, হাতিমি ইত্যাদি বা 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি'র যে বিচিত্র জানোয়ারগুলো—হ্যাংলা সেরিয়াম, গোমড়াথেরিয়াম, ল্যাগব্যাগিনস, চিল্লানোসরাস ইত্যাদি, এদের স্থান পৃথিবীর ইতিহাসে বা ভূগোলে কোথাও নেই। বাংলা সাহিত্য ও ছবিতে সুকুমার রায়ই এদের প্রথম স্রষ্টা। কবিতা বা কাহিনীর সঙ্গে এই ছবিগুলো দেখলে মনে হয় বৈজ্ঞানিকভাবে এদের অবয়ব-কল্পনা থেকেই হয়ত পরে সূত্রপাত হয়েছে লেখায় এদের রূপবর্ণ। এদের মধ্যে বিজ্ঞানের সত্য, বাস্তবতার সত্য ও অপ্রাকৃতের সত্য এক জায়গায় এসে মিলে গেছে যেন। সুররিয়ালিজম বাস্তবতাকে অতিক্রম করে বাস্তবতা থেকে যতটা দূরে যাওয়ার কথা কল্পনা করতে পারে, এরা বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করেই বাস্তবতাকে তার চেয়ে বেশী অতিক্রম করতে পেরেছে। 'সাইকিক অটোমেটিজম' বলতে যা বোঝায় এই সব রূপকল্পগুলি তা থেকে অনেক দূরের। অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক সুশৃঙ্খল যুক্তিবদ্ধতায় এদের উদ্ভাবন। কিন্তু 'অত্যুক্তি'র মাধ্যমে প্রকৃতিকে এখানে যেভাবে অতিক্রম করা হয়েছে, তা যেন বিজ্ঞান দিয়ে বিজ্ঞানকে অতিক্রম। সুররিয়ালিজমও এখানে যেন অন্য এক মাত্রা পায়।

ইলাস্ট্রেশন বা গ্রন্থচিত্রনে এতদিনকার যে সুপরিচিত নীতি যে, ছবি অনুসরণ করবে লেখাকে, লেখার একটি অংশকে বা মূল কেন্দ্রবিন্দুকে দৃশ্যতা দেবে সে, বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে সুকুমার রায় প্রথম এই নীতিকে ভাঙলেন। একথা ভাবতে প্রলুব্ধ হই আমরা যে 'আবোল তাবোল'-এর 'খিচুড়ির' প্রাণীদের ক্ষেত্রে বা 'হেশোরাম হুঁশিয়ারে'র জন্তুগুলির ক্ষেত্রে গল্প বা কবিতা কি দৃশ্যপ্রতিমারই ভাষায় রূপান্তরণ ? এই নীতিই অনুসৃত হয়েছে 'ট্যাশগরু', 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা, 'রামগরুড়ের ছানা' বা 'ভয় পেয়ো না' কবিতার জন্তু ও মানুষের সম্মিলিত রূপারোপে।

'খিচুড়ি' বা 'হেশোরাম হুঁশিয়ারে' যা ছিল নিছকই মজা, কিছুটা বা নির্দোষ কৌতুক, এখানে তা আর ততটা নির্মল থাকল না। এদের সঙ্গে আঁটা রইল সূক্ষ্ম সমালোচনার তীর, সময়কে বা সমাজকে বিদ্ধ করতে উদ্যত যা। গাছের ডালে বসে থাকা দুটি লেজ বিশিষ্ট জন্তুর ধড়ের সঙ্গে যখন যুক্ত হল উন্নত-নাসা এক ভয়ংকর মানুষের মুখ, আর কবিতার প্রথম দুটি লাইনেই যখন পড়লাম—"হুঁকো-মুখো হ্যাংলা, বাড়ি তার বাংলা/মুখে তার হাসি নাই দেখেছ ?" অথবা ট্যাশ গরু সম্বন্ধে যখন জানলাম যে ট্যাশ গরু আসলে গরু নয়, আর তাকে দেখতে পাওয়া যায় "হারুদের অফিসে", তখন এদের যে পরিচয় আমরা পাই, তাতে খুব একটা অচেনা থাকে না আর এরা। এখানে এসে বাস্তবতার গভীর থেকে বাস্তবতাকে এভাবে দ্রবীভূত করে নেওয়ার মধ্যে যদি কেউ সুররিয়ালিজমের সামান্য ছায়া দেখেন, তাঁকে একেবারে নস্যাৎ করা যায় না হয়ত।

গভীরতর বাস্তবতাকে ধরতে উপরিস্তরের বাস্তবতার যেমন এক রূপান্তর এখানে, তেমনি অনুপুঙ্খ বাস্তবতার অনুসরণের নিদর্শনও কম নেই একেবারে। 'বুড়ির বাড়ি' কবিতায় যে বুড়ির রূপারোপ বা 'ন্যাড়া বেলতলায় কবার যায়' এর ইঁটের পাঁজার উপর বসে থাকা যে রাজা, অথবা 'ধনঞ্জয়' নামের বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রবন্ধে (সন্দেশ চৈত্র ১৩২৪) ধনেশ পাখির যে স্কেচ এগুলির মধ্যে ছড়িয়ে আছে অনুপুঙ্খ বাস্তবতায় রূপায়নের ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতার পরিচয়।

তেমনি আবার ফর্মের দিক থেকে বাস্তবতাকে ভেঙে স্টাইলাইজেশনের দৃষ্টান্তও যে একেবারে নেই তা নয়। 'একুশে আইন'-এর পিছলে পড়া বাবু আর তাকে 'পাকড়ে ধরে যে প্যায়দা' সেই মানুষদুটিকে আঁকা হয় কতগুলি ঋজু চতুষ্কোণের সমন্বয়ে, যাতে করে এক নিয়মতান্ত্রিক যান্ত্রিকতার দ্যোতনা আসে। অথবা 'হাতুড়ে' কবিতার ডাক্তারের অপারেশনের দৃশ্যটিতেও অনেকটা সমধর্মী ফ্যানটাসির আভাস আছে।

এছাড়াও আরও একটি ধারার নিদর্শন হিসেবে অন্ততঃ দুটি ছবির কথা মনে রাখা যায়। একটি,—বনের গাছের সারির আড়ালে অন্ধকার ভেঙে বিস্ফারিত

দৃষ্টিতে হাসছে চাঁদ, তার সামনে হাত ধরাধরি করে সারি বেঁধে নাচছে কয়েকটি বিড়াল। নীচে একটি ছড়া, নাম 'নাচন' ঃ

'নাচ্ছি মোরা মনের সাধে গাচ্ছি তেড়ে গান
হুলো মেনী যে যার গলার কালোয়াতীর তান
ন্যাচ্ছি দেখে চাঁদা মামা হাসছে ভরে গাল
চোখটি ঠেরে ঠাট্টা করে দেখনা বুড়োর চাল।"

আর দ্বিতীয়টি "মেঘ মুলুকে ঝাপসা রাতে"র ছবি। 'অন্ধকার' যেখানে 'আলোয় ঢাকা' সেই জগতের এই ছবিটিতেও হাস্যরস যেন রূপান্তরিত হয়ে গেছে শান্ত ও করুণ রসে।

ইলাস্ট্রেশন করতে করতে সুকুমার রায় ছুঁয়ে গেলেন বিশুদ্ধ ছবিকে। হাল্কা চালে হাসি ও কৌতুকের মধ্য দিয়ে তিনি যে কবিতার শুদ্ধ স্বরূপকে ছুঁয়ে যান, একেই আমাদের কোনো একজন বিশিষ্ট কবি বলেছিলেন 'অসম্ভবের ছন্দ'। অসম্ভবের মধ্যে এরকম গভীরতার ছন্দ এসে গেছে তাঁর ছবিতেও অকাধিকবার।



প্রবন্ধে সুকুমার রায়

অরবিন্দ পোদ্দার

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে সুকুমার রায় প্রবন্ধ রচনার বিশেষ অবকাশ পান নি। ননসেন্স ভার্স বা আপাত অসংলগ্ন সৃষ্টিছাড়া বিষয়বস্তু নিয়ে কল্পনার ঐন্দ্রজালিক সম্মোহ রচনায় তাঁর অনন্যসাধারণ সফলতা বাংলার—শিক্ষিত বাঙালীর—ঘরে ঘরে পুরাকাহিনীর মর্যাদায়, বিস্ময়ে মমতায় শ্রদ্ধায় সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই উদ্ভটের আনন্দে বিভোর শিশুমন এবং বয়স্ক মনও, সব সময় সচেতন থাকে না যে বিজ্ঞানের উৎসাহী পাঠক ও ছাত্র হিসাবে তিনি অনুসন্ধিৎসু বিশ্লেষণী মননেরও অধিকারী ছিলেন। উদ্ভটের রসে একদিকে যেমন তিনি সকলকে উচ্ছ্বসিতভাবে মাতিয়েছেন, তেমনি 'সন্দেশ'-এর পাতায় উপহার দিয়েছেন বিজ্ঞানীদের জীবনী ও উদ্ভাবনের মানবিক গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী। একই সূত্রে গেঁথেছেন জিজ্ঞাসার কৌতূহল আর উদ্ভটের লাগামছাড়া স্ফূর্তি।

অবশ্য, কল্পনার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকে মননের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা। সেই মন গদ্যের যুক্তি-কাঠামোর আশ্রয়ে অভিব্যক্তি লাভ করার সুযোগ পেয়েছে কম; তাঁর গদ্য প্রবন্ধের সংখ্যা খুবই অল্প। কিন্তু যখনই ঐ মন গদ্যের শৃংখলায় আত্মপ্রকাশ করেছে তখনই দেখা গেছে যে মননশীল গদ্যরচনায় তাঁর দক্ষতা কোন অংশেই ন্যূন ছিল না। বরং এই ধারণাই সুস্পষ্ট হয় যে, যদি এই বিভাগে আরও কিছু সময় তিনি ব্যয় করতে পারতেন তাহলে নিঃসন্দেহে প্রবন্ধকার রূপেও তিনি বিরল প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারতেন।

যে অল্প ক'টি প্রবন্ধ তিনি রচনা করে গেছেন তার প্রাথমিক পরিচয় গ্রহণ করলেই একটি সচেতন, গতিশীল এবং ঐতিহাসিক রূপান্তরের বোধসম্পন্ন মনের সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। এই মন কালের প্রবহমান রূপটি সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ ও উৎসুক। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে যে একটা নিরবচ্ছিন্নতা দেখা যায়, যাহা সমস্ত জগৎকে দেশে ও কালে খণ্ডিত করিয়াও, সংযোগসূত্ররূপে সমগ্র অখণ্ডতা ধরিয়া রাখিয়াছে" বিশেষ স্থানে ও কালে আবদ্ধ জড় মন তা উপলব্ধি করতে পারে না। কারণ, চেতনার কর্ষণ হয় অবরুদ্ধ নতুবা পর্যাপ্ত হয় নি। মানব অভিযানের মধ্যে একটি আশ্চর্য গতিপ্রাণতা লক্ষ্য করা যায়, যা কোন বিন্দুতেই এসে বিশ্রাম গ্রহণ করে না। সেই অভিযানকে যদি সাধারণভাবে শুধু জীবন বলে অভিহিত করা যায়, তাহলেও অর্থগত কোন বৈষম্য দেখা দেয় না সেই অবিশ্রান্ত গতিপ্রাণতার জন্য সুকুমার রায় জীবনেরও একটি বিশেষ অর্থবহ তাৎপর্য গ্রহণ করেছেন। বলেছেন,

কিন্তু জীবনেরও একটা রূপ আছে, সেটা হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ।...... অসমাপিকা হলেও ক্রিয়াপদটি অকর্মক নয়, কারণ ওর একটি উদ্দিষ্ট কর্ম আছে এবং সেই কর্মটি হচ্ছে আর্ট।

ঈষৎ লঘু সুরে রচিত এই প্রবন্ধটিতে জীবনের সৃষ্টিশীলতার লক্ষ্য হিসেবে নির্দিষ্ট হয়েছে আর্ট, অথবা শিল্পের সুষমামণ্ডিত জীবন। আসল কথা, সৃজনধর্মী মনন যদি পূর্বোক্ত ঐ অসমাপিকা ক্রিয়াপদটির আন্তর সম্পদ উপলব্ধি করতে সমর্থ হয় এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সাধনে সমর্থ হয়, তাহলে ব্যক্তিক উপলব্ধি এবং শিল্পের সমস্যা অনেকাংশে মীমাংসিত হয়ে যায়।

কিন্তু, এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রবল অন্তরায় চেতনার পরাভূত অবস্থা, যা গতিহীন ভাষার প্রাণহীন আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত বসে থাকে। মানুষের ভাষা তার মনের সার্থক দর্পণ কিনা, বা চিন্তাকে যথাযথ প্রকাশ করতে পারে কি না, অথবা চিন্তা-নিরপেক্ষ ভাষার গৌরব কতটুকু, ইত্যাদি বিষয়ে নানাপ্রকার অভিমতের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে সুকুমার রায়ের সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট। তাঁর আপন কথায়, "ভাষা যে নিজের অর্থগৌরবেই সত্য, এ কথা ভুলিয়া সে যখন কেবল শব্দগৌরবে বড় হইতে চায়, তাহার অত্যাচার অনিবার্য। চিন্তা কোনোদিনই শব্দের দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে ও সম্যকরূপে ব্যক্ত হইতে পারে না। সেইজন্যই এক-একটা সত্যকে পঞ্চাশবার পঞ্চাশরকম ভাষায় পঞ্চাশদিক হইতে দেখার আবশ্যক হয়।" আসল সমস্যা হলো, শব্দ ও অর্থের, অথবা শব্দ ও চিন্তার পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংশ্লেষের গতিশীলতা অক্ষুণ্ন রাখা। তা বজায় থাকলেই "সৃষ্টিপ্রবাহের" নিরবচ্ছিন্নতা ও জীবনের গতিশীলতার সঙ্গে মানুষের ভাষা সংযুক্ত থাকতে পারে।

অপরপক্ষে, ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতা হলো গতি হারিয়ে ফেলা। নির্দিষ্ট স্থানকালের বিন্দুতে বিধৃত মানবিক অভিজ্ঞতা ভাষা অথবা শব্দকে বিশেষ অর্থে

মণ্ডিত করে ; অভিধানে ব্যাকরণে স্থানলাভ ক'রে তা কালক্রমে স্থবিরত্ব অর্জন করে। ব্যাকরণের সূত্র অনুযায়ী যারা জীবনকে গঠন করতে চায় তারা ঐ নির্দিষ্ট অর্থসীমা কিছুতেই লঙ্ঘন করতে চায় না। ফলে, দেখা দেয় এক ধরণের নিষ্প্রাণ শব্দরীতি, শব্দের নিকট প্রশ্নহীন আত্মনিবেদন। এর ফল দাঁড়ায়, সুকুমার রায়ের কথায়, "মানুষের চিন্তা আপনার উদ্দিষ্ট সার্থকতাকে ছাড়িয়া কতকগুলি বাক্যের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে চায়।" "ভাষারূপ বাহনটার খাতিরে চিন্তা কেমন করিয়া পঙ্গুত্বলাভ করে"। ভাষার অত্যাচার, সম্ভবত বলা উচিত শব্দের সম্মোহ, চিন্তাকে বিপথে চালিত করে। শব্দের খাঁচায় আবদ্ধ চিন্তা "অযৌক্তিক দ্বৈততত্ত্বের আকার ধারণ" করে। অর্থাৎ, মননশীল সত্তার মৃত্যু হয়। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে জীবনের অসমাপিকা রূপটি কিন্তু নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয় ; নিজস্ব আন্তর গরজ যদি তার নিঃশেষিত হয়, বাইরের আঘাত তাকে পুনরায় চঞ্চল করে, নতুন লক্ষ্যের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। সেইজন্যই নতুন পরিস্থিতি, পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার নিরিখে শব্দের প্রাচীন অর্থ অচল, তাই, ভাষাকে নতুন অর্থব্যঞ্জনায় ও ব্যাপ্তিতে পুনরায় সজীব করে তুলতে হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই কোন একটি সত্যকে অথবা নির্দিষ্ট অর্থসীমায় আবদ্ধ বস্তুকে পঞ্চাশরকম দিক থেকে পঞ্চাশরকম ভাষায় পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা। এই কথাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুকুমার রায় বুদ্ধিমার্গীয় ক্ষেত্রে আশ্চর্য কালসচেতনতার পরিচয় দান করেছেন। যে বস্তুটির উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হলো, সজীব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সজীব ভাষা ও চিন্তার উদ্বোধন এবং ব্যবহার।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে অভ্যাসে পঙ্গু মন প্রার্থিত সমন্বয় সাধনে বিমুখ, সুতরাং জীবনসাধনায়ও বিমুখ। অভ্যস্ত শব্দের মোহে সে কথা বলে, চলেও অবশ্য, কিন্তু সৃষ্টি করে না ; অস্তিত্ব বহন করে সত্য, কিন্তু সকর্মক জীবন-যাপন করে না। এ কথাটিকে তিনি সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত সহকারে ব্যক্ত করেছেন। লিখেছেন, "শব্দের গায়ে চিন্তার ছাঁটছুট যাহা লাগিয়া থাকে তাহাই যথেষ্ট, বাকিটুকু তোমার রুচি ও কল্পনা অনুসারে পরাইয়া লও। ছাতার নিচে চটি চলিতেছে দেখিয়া লোকে বুঝিত বিদ্যাসাগর চলিয়াছেন। আমরা দেখি ভাষার ছাতা আর চটি, জীবন্ত বিদ্যাসাগরকে আর দেখা হয় না।"

দেখা হয় না বলেই সংস্কারের জুজু সৃষ্টি করা হয় ; সৃষ্টি করা হয় জীবন নামক অসমাপিকা ক্রিয়াপদটি সম্পর্কে এক বিভীষিকা। এই জুজু মানুষের মনকে নিরন্তর পিড়িত করে ; মুক্ত চিন্তার পথ থেকে যেমন তাকে সরিয়ে আনে তেমনি সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ব্যাপারেও তা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য সমাজের স্থিতি অথবা গতি, সংরক্ষণ অথবা রূপান্তর, এই প্রশ্নের যে ঐতিহাসিক ব্যাপ্তি—সুকুমার রায়ের প্রবন্ধে তা তেমন প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নয়। কিন্তু, ব্যক্তিক চেতনাকে বিমূঢ় ক'রে ঐ জুজু যে এক বিরাট অচলাবস্থার সৃষ্টি করে সে-বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এর বিরুদ্ধেই তাঁর বলিষ্ঠ সমালোচনা, তাঁর

প্রতিবাদ। মুখ্যত 'দৈবেন দেয়ম্' এবং 'ভাষার অত্যাচার' শীর্ষক প্রবন্ধেও পরোক্ষে তিনি এ প্রসঙ্গে চমৎকার আলোচনা করেছেন। জুজুতন্ত্রের সামাজিক প্রভাব আমাদের দেশে কী মারাত্মক এক দুঃসহ প্রতিবেশ সৃষ্টি করেছিল, যা এখনও লক্ষণীয়, তা তাঁর আপন ভাষার প্রথমোক্ত প্রবন্ধ থেকে অংশত উদ্ধার করছি—

এই দুর্ভাগ্য দেশে, জীর্ণতার পরিত্যক্ত কঙ্কাল যেখানে প্রাণের চাইতে অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়, এই জুজুতন্ত্রের শাসনও এইখানেই মারত্মকরূপে প্রবল। এ জিনিষ যে অন্যদেশে নাই তাহা নয়, বাক্য ও চিন্তার ফেটিশ্ সকল দেশের সকল সমাজেই সুলভ। কিন্তু মোহের কবলে এমন নিশ্চেষ্ট নিরাশ্রয়ভাবে মানুষ আর কোথাও পড়িয়া থাকে না। লোকশাসন ও সমাজবিধির অপচার সর্বত্রই আছে কিন্তু তাহার এমন পাকাপাকি প্রতিষ্ঠার আড়ম্বর আর সকলখানেই দুর্লভ।

যুগ যুগ ধরে অস্তিত্বশীল অবরুদ্ধ ভারতবর্ষীয় সমাজ সম্পর্কে তাঁর এই অভিযোগ নিয়ে কোনই মতদ্বৈধতা নেই। সেই সমাজের মোহ-আবরণ ছিন্ন করে যাঁরা বহির্গত হয়েছিলেন এবং সৃষ্টি করেছিলেন এক গতিশীলতার বাতাবরণ, তাঁদের সংস্পর্শে, সেই ঐতিহ্যে তিনি লালিত হয়েছেন। কিন্তু সে-কালের সেই প্রগতিশীলতা মুক্তবায়ু চলাচলের পক্ষে যথেষ্ট উদার ছিল কি না, সে বিষয়ে তাঁর মনে প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক। কারণ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুব সহৃদয় ছিল না। হয়তো বা সেখানেও তিনি জুজুতন্ত্রের অস্তিত্ব লক্ষ্য করে থাকবেন। প্রাচীন এবং নবীন উভয়বিধ জুজুতন্ত্রকে সংযুক্ত করলে তাঁর মনোবেদনার গভীরতা অনুমান করা সহজ হয়।

আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি ফ্রি উইল এবং ডেস্টিনীর দ্বন্দ্বসমস্যা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, পুরুষকার ও অদৃষ্ট এর মধ্যে প্রকৃতই কোন বিরোধ নেই। বিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে; করেছে শাস্ত্রবচনে অজ্ঞ মানুষেরা এবং তাদের "লৌকিক বুদ্ধি"। বলা বাহুল্য, মানুষের জিজ্ঞাসু মন আর বোধশক্তিকে হত্যা করতে পারলেই সমাজবিধায়কদের অস্তিত্ব নিরাপদ হয়। তাদের নিরাপত্তার দাবিতে যদি সামগ্রিক জীবন ও প্রাণের গতিশীলতা অবরুদ্ধ হয়, তাতেও তাদের কিছুই ক্ষতির কারণ ঘটে না। বিজ্ঞানও যে তার যুক্তিশৃঙ্খলার সহায়তায় কখনও কখনও এই জুজুতন্ত্র সৃষ্টি করে এই অভিযোগও তিনি উত্থাপন করেছেন। অবশ্য, এক্ষেত্রে বিজ্ঞান বলতে আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর একগুঁয়ে বিজ্ঞানবাদকে বুঝতে হবে, যে বিজ্ঞানবাদ ছিল অসহিষ্ণু এবং ভৌত নিয়মের অমোঘতায় দৃষ্টি-হীন। সেই বিজ্ঞান "চৈতন্যকে খুঁজিতে আসে নাই, সে শক্তির নিয়মকেই খুঁজিয়াছে, এবং সেই জন্যই পদে-পদেই জীবজন্তুজ্ঞানের সাক্ষ্য পাইয়াও সে তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছে" [চিরন্তন প্রশ্ন]। মানসিক বন্ধন ও গতিশীলতার বিরুদ্ধে এই ধরণের আক্রমণ তা সে কর্মবাদ জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি আশ্রয় করেই আসুক অথবা বিজ্ঞান-

বাদকেই আশ্রয় করে আসুক—প্রতিরোধ করাই প্রাণশক্তির লক্ষণ। ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার পক্ষে যেমন তা সত্য সমষ্টিগত বা সামাজিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও তা সত্য। গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি লিখেছেন, "যেকোন দিক দিয়াই জীবনের পথকে উন্মুক্ত করি না কেন, জ্ঞানের অন্বেষণই হউক কি প্রেমের চরিতার্থতাই হউক, জীবনের জাগ্রতবুদ্ধি যেখানে আপনার জীবন্ত প্রবাহকে স্পর্শ করে, সকল দ্বন্দ্বের সকল সন্দেহের মোহরূপ সেখানেই খসিয়া যায়।"

মোহ আবরণ ত্যাগ এবং জীবনের জীবন্ত প্রবাহকে স্পর্শ করা—এই হল ব্যক্তিক অনুভবের মানস-জীবনের অন্বিষ্ট। জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে এর উদ্বোধন এবং ব্যবহারিক আচরণে এর প্রতিফলন তাঁর কাম্য। এই সত্য উপলব্ধি ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এমন একটি মনের পরিচয় লাভ করা যায়, যে মন কোন গোষ্ঠীবদ্ধ চিন্তার সংকীর্ণতা দ্বারা পীড়িত নয়, যে মন উদার, মুক্ত। বলা নিষ্প্রয়োজন, সুকুমার রায়ের আমলে তত্ত্বআলোচনায় ঐতিহাসিক-সামাজিক প্রেক্ষিত ব্যবহার বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না ; তিনি নিজেও সে প্রেক্ষিত গ্রহণ করেন নি। তিনি বুদ্ধিমার্গীয় জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে নিজেকে আবদ্ধ রেখেই তত্ত্ববিচার করেছেন ; তত্ত্বের সামাজিক পশ্চাৎপটকে বিচারের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। তথাপি, জীবন নামক অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রসন্ন স্বীকৃতি এবং মানব অভিজ্ঞতার জীবন্ত প্রবাহকে স্পর্শ করার জন্য তাঁর আকুতি তাঁর রচনাকে অনন্যতা দান করেছে। একটি সজীব মন ও চিন্তার স্পর্শ সত্যই পাঠককে "চমৎকৃত" করে।

'বর্ণমালা তত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে সুকুমার রায়ের ইংরাজী রচনা স্থান পেয়েছে। একটি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক। অপরটি 'দ্য বারডেন অব দ্য কমন ম্যান'। সাধারণ মানুষকে সর্বপ্রকার মানবিক সঞ্চয় থেকে বঞ্চিত করার ফলে মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে যে দ্বৈততার উদ্ভব, যুগ যুগ ধরে যা সভ্যতাকে বিদীর্ণ করে আসছে, স্বভাবতই দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে এক উচ্ছ্বাসময় আলোচনা প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে, মানব অভ্যুদয়ের স্বীকৃতিতে পূর্ণ তাঁর মন এই ভেবে নিশ্চিন্ত যে, সাধারণ মানুষ আজ জেগে উঠছে আর তা-ই যথেষ্ট [he has "positively appeared—that is enough"]। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভাবসম্পদ-সম্পর্কিত আলোচনায় ঐ আমলের পাঠকদের মধ্যে যে প্রবণতা প্রত্যক্ষ করা যায়, সুকুমার রায়ের আলোচনাও তার ব্যতিক্রম নয়, দেশকালাতীত যে পূর্ণতার কল্পিত আস্বাদনে তাঁরা তৃপ্ত হতেন, সেই তৃপ্তির স্বাক্ষর এখানেও বিদ্যমান। সেই একই আনন্দ, বিশ্বচরাচরব্যাপ্ত মুক্তির আনন্দ, চৈতন্যে স্থিতি। এই আলোচনায় অভিনবত্ব বিশেষ নেই, কিন্তু অভিনবত্ব আছে একটি মন্তব্যে। তা হলো ঊনবিংশ শতাব্দীর পটভূমি পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি প্রথম আমলের ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর মন্তব্য করেছেন ; বলেছেন, ওঁরা ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল এক গোষ্ঠী, ভয়ংকর রকমের হিন্দু-বিরোধী ও জাতীয়তা-বিরোধী। [The immediate consequence of this English education was the disastrous uprising of a group of reac-

tionaries, violently anti-Hindu and anti-national in attitude.]
ইয়ং বেঙ্গলদের সম্পর্কে সচরাচর বিদ্রোহী অভিধাটিই ব্যবহৃত হয়ে থাকে; সুকুমার রায় নির্দ্বিধায় তাঁদের বলেছেন প্রতিক্রিয়াশীল। এই অভিমত সর্বজনগ্রাহ্য হোক বা না-হোক, এটি যে অতিশয় শাণিত এবং মর্মভেদী সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের বিবর্তন এবং সাম্রাজ্যবাদ-সৃষ্ট বুদ্ধিজীবীদের চারিত্র বৈশিষ্ট্য, জীবনদর্শন, রাজনৈতিক ভূমিকা ইত্যাদি পর্যালোচনা করলে এই মন্তব্যের স্বপক্ষে কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণও উদ্ধার করা যেতে পারে। ঐ ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর যে কোন মোহ ছিল না, তা-ই তাঁর বুদ্ধিমার্গীয় স্বকীয়তার সাক্ষ্য বহন করছে।

যাই হোক, এইসব রচনা থেকে প্রাবন্ধিক সুকুমার রায় সম্পর্কে একটি মনোরম চিত্র উদ্‌ভাসিত হয়; এখানে সৃষ্টিশীল মননের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে যুক্তিনির্ভর মনস্কতা, গতিশীলতার সঙ্গে সংস্কারমুক্ত চেতনা, যা আধুনিক মানসভঙ্গির জনক।



কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই

অভ্র ঘোষ

॥ এক ॥

প্রবীণ ব্রাহ্মনেতা হেরম্বচন্দ্র মৈত্র সুকুমার রায়কে কথাচ্ছলে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তাঁর জীবনের আদর্শ কী? উত্তরে সুকুমার বলেছিলেন, 'সিরিয়াস ইন্‌টারেস্ট ইন লাইফ।'

উদ্ভট আর আজগুবির আড়ালে সমাজ-সম্পর্কের জটিল বুনন খোলার চেষ্টায় মেতেছিলেন সুকুমার। তন্ন তন্ন করে করে খুঁজেছেন জীবনের সার কথাগুলিও। খেয়াল-রসের কবিতায়, গল্পে বা নাটকগুলিতে আমরা তো তারই পরিচয় পাই। তবে এই গূঢ় শিল্পবোধ যে খুব ভারী আকারে প্রকাশ পায় নি তা তো আমরা সবাই জানি। প্রকাশটা ছিল হাসি আর কৌতুকের অনাবিল উচ্ছ্বলতায়। তাঁর জগৎ ছিল কেবলই কৌতুকের জগৎ। মজাদার ভঙ্গিতেই শিল্পীর চৈতন্যের অফুরন্ত বিস্তার সেখানে। তবে খেয়ালরসের পিছনে যে এক রূঢ় বস্তুবতার চেহারা আছে, এক চিরন্তনতার উদ্ঘাটন আছে, সুকুমারের সচেতন পাঠক সে কথা সহজেই বুঝে নেন। মানুষের চৈতন্যের স্বরূপ, তার দৈনন্দিনতা, তার স্বার্থ আর তার ভাবালু দার্শনিকতাকে চিনিয়ে দিয়েছেন সুকুমার এক আপাত কৌতুকময় শ্লেষ আর বিদ্রূপ দিয়ে। কখনও কখনও তিনি আশ্রয় করেন উদ্ভট এক খেয়ালরসের জগৎকেও, কিন্তু বক্তব্য বিষয় অস্পষ্ট হয় না। ছিটকে যায় না জীবন বোধ তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় থেকে। তাঁর অন্বেষণের ধ্রুব একক হয়ে দাঁড়ায় জীবনের প্রতি গভীর আগ্রহবোধ। সুকুমার একেই বলেছিলেন 'সিরিয়স ইনটারেস্ট ইন লাইফ।'

কিন্তু পাঠকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, জীবন সম্পর্কে এই তন্নিষ্ঠ আসক্তি ও জিজ্ঞাসার চেহারাটা কেমন সুকুমারের। আশৈশব ব্রাহ্ম পরিবেশে লালিত সুকুমার কি খুঁজেছেন এর উত্তর ধর্মীয় ভাবের বিমূর্ত জগতে? প্রচলিত অধ্যাত্ম দর্শনের কোনও ধোঁয়াটে ভাবের জটিলতায়? অথবা স্বীকৃত দৈবের নির্দিষ্ট বিধি বিধানে, যাকে আমরা জানি শাস্ত্রীয় লোকাচার হিসাবে? সুকুমার কিন্তু একাধিক ক্ষেত্রে এসবের সুষ্ট উত্তর দিয়েছেন। 'ভাবুক সভা' নাটিকার এক জায়গায় পাচ্ছি ধোঁয়াটে ভাবালুতার বিরুদ্ধে এক তীক্ষ্ণ কৌতুকময় উক্তি: ভাবি এক্কে ভাব, ভাব দুগুণে ধোঁয়া / তিন ভাবে ডিসপেপশিয়া—ঢেকুর উঠবে চোঁয়া।

অথবা, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভারতীয় চিত্রশিল্প নিয়ে একটি বিতর্কে তিনি যে কথাগুলি বলেছিলেন, তাতেও পাচ্ছি সুকুমারের আবেগ তাৎপর্যপূর্ণ মানসিকতা। প্রবাসীতে প্রকাশিত প্রবন্ধে অর্ধেন্দ্রকুমার বলতে চেয়েছিলেন যে 'আধ্যাত্মিকতাতেই ভারতশিল্পের প্রাণ'। এর বিরুদ্ধে সুকুমার তির্যক মন্তব্য করে লিখে-ছিলেন: 'এই তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা কিরূপ বস্তু? চিত্রের নায়ক-নায়িকার চোখে-মুখে যদি একটু তন্দ্রার ভাব দেখা গেল অথবা চারদিকে কুহেলিকা সৃষ্টি করিয়া শিল্পী যদি তন্মধ্যে একটু আলোকের আভাস দিলেন তবেই কি আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত হইল? তদুপরি যদি চিত্রে ভাবের অস্পষ্টতা লক্ষিত হয় এবং নায়ক বা নায়িকা যদি এনাটমি শাস্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া তাঁহাদের অস্থিহীন অঙ্গভঙ্গির কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি করিয়া বসেন তবে তো সোনায় সোহাগা!' ('ভারতীয় চিত্রশিল্প', বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ)।

আর 'দৈবেন দেয়ম' প্রবন্ধে পাচ্ছি সুকুমারের অধ্যাত্ম চেতনার স্পষ্ট রূপ, 'স্বভাব-শঙ্কিত দুর্বল মন দৈবের স্পষ্ট রূপকে না দেখিয়াই আপস করিতে চায়, জীবনকে বিশ্বজীবনের মধ্যে, আত্মশক্তিকে বিশ্বশক্তির মধ্যে বৃহত্তররূপে দর্শন করে না। পুরুষকারকে সে অবতীর্ণ দৈবশক্তি রূপে জানে না তাই দৈব সেই বাহিরের নিষ্ঠুর বিভীষিকাই থাকিয়া যায়। দৈব তাহার জীবনের সুখ-দুঃখ সংগ্রাম আর বহন করিতে চায় না, কেবল দুঃস্বপ্নের মতো নিদ্রিত জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে মাত্র।' (বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ) 'জীবনকে বিশ্বজীবনের মধ্যে, আত্মশক্তিকে বিশ্বশক্তির বৃহত্তররূপে' পেতে চাইছেন তাহলে সুকুমার। আর সে পাওয়া যে কত-গুলি মূঢ় সংস্কারের মধ্যে সম্ভব নয়, দৈবের বিধানরূপী অন্ধ বিশ্বাসে যে তা পাওয়া যাবে না কোনও দিন, সেই কথাই এই প্রবন্ধে বারবার বলেছেন সুকুমার।

ব্রাহ্ম 'ছাত্র-সমাজ' ও 'যুব-সমাজের' আঙ্গিনায় যে সংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলে-ছিলেন সুকুমার, 'মদ খাব না, সিগারেট খাব না, পাবলিক থিয়েটারে যাব না' জাতীয় নঞর্থক নৈতিক শাসনের পরিবর্তে যে সদর্থক আত্মনির্মাণের আন্দোলন চাইছিলেন তিনি, তাতেও তো স্পষ্ট সুকুমারের এই প্রতিজ্ঞা।[১] কৈশোরে 'রাগ বানানো' খেলায় যে দ্বেষমুক্তির[২] অভ্যাস করেছেন তিনি, পূর্ণ জীবনবোধের অন্বেষণে সেই সুকুমারই গড়ে তুলেছেন তাঁর মণ্ডা ক্লাব বা নন্‌সেন্স ক্লাব শিল্প-

সাহিত্য-সংগীত-চর্চায় বিভোর থেকে। এসব কাজে 'ছোট আমি' থেকে 'বড় আমি'-তে যাবার সাধনাই ছিল তাঁর একান্ত লক্ষ্য।

আত্মনির্মাণের নিরন্তর সাধনার তত্ত্বগত রূপের বিশ্লেষণ পাওয়া গেল পরিণত মনস্ক সুকুমারের আরেক প্রবন্ধ 'চিরন্তন প্রশ্ন'-এ। সে প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'বাহিরের সাধনা দ্বারা যে আমি-কে আমরা অন্বেষণ করি, সে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ নয়। বিবর্তনবাদের ভিতর দিয়া জগতের সম্বন্ধের ভিতর দিয়া আমার যে চেহারাকে দেখিতে পাই, সে কেবল আমার একটা বাহিরের ছায়া মাত্র। এই ভ্রান্ত আমিত্বের সংস্কারকে আবার জ্ঞানের আঘাতে ভাঙ্গিয়া দেখিতে হয়।···আমার জীবনস্রোতের অনিত্যতার মধ্যে নিত্যরূপে আমিই বর্তমান, আমার অন্তর্নিহিত পূর্ণতার আদর্শের মধ্যে আমি, আমার জীবনের মূলগত সুখ-দুঃখাতীত আনন্দের মধ্যে আমি।'

সুকুমারের এই আমিত্বের সন্ধান, জ্ঞানমার্গসম্মত তাঁর এই বৈদান্তিক জীবনবোধ সহজেই আমাদের মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের আমিত্বের দর্শন, তাঁর আত্মবোধনের তীক্ষ্ণচর্চাকে। 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধাবলীতে যে দর্শন ও মননের পরিচয় পাই আমরা, সুকুমার যেন সেই দর্শনেরই ঘনিষ্ঠ অংশীদার। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতায় ও জীবনবোধে যে যথার্থই আপ্লুত সুকুমার সেকথা কেবল এই দুই মনস্বীর পারস্পরিক অন্তরঙ্গতার কাহিনীতেই বিধৃত নয়, বিধৃত নয় শুধু রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে তাঁর নানান কর্ম্মকাণ্ডে। সুকুমার-সাহিত্যে নিহিত দর্শনের সে প্রভাব রয়েছে। শিল্পের বহিরঙ্গরূপে, শৈলীতে, উপস্থাপনার ভঙ্গিতে কিম্বা মেজাজে হয় তো সে মিল নেই, কিন্তু জীবনবোধে ও দার্শনিকতার পরিমন্ডলে যে সে-প্রভাব স্পষ্ট তা তাঁর জীবনচর্চা ও তাঁর লেখা উল্লেখিত প্রবন্ধগুলিতে প্রত্যক্ষত বোঝা যায়।

উল্লিখিত 'চিরন্তন প্রশ্ন' শীর্ষক প্রবন্ধেই তো ব্যবহার করেন সুকুমার তাঁর আমিত্বের দর্শন বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'উৎসর্গ' কাব্যের একুশতম কবিতার দু-একটি পঙক্তি। লেখেন, 'আমি এই দেহ নই' এই দেহের মধ্যে আবদ্ধ শক্তিবিশেষ নই, আমি এই প্রবহমান পরিবর্তন পরম্পরা নই—··············· ·········

মানুষ আকারে বদ্ধ যে-জন ঘরে
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে
যাহারে কাঁপায় স্তুতি নিন্দার জ্বরে—
কেবল সেই আমিই আমি নই।
যে আমি স্বপনমুরতি গোপনচারী
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি—

সেই আমিই প্রকৃত আমি। তাহাকে জানাই জীবনের প্রশ্ন, তাহাকে প্রকাশিত হইতে দেওয়াই জীবনের সাধনা, তাহার প্রকাশেই জীবনের সার্থকতা।············

বস্তুত, আত্মশক্তিচর্চার যে ব্রতে আত্মমগ্ন 'গীতাঞ্জলি' পর্বের রবীন্দ্রনাথ, 'সাধনা'র রবীন্দ্রনাথ, নিরন্তর আত্মনির্মাণের দীক্ষায় যে রবীন্দ্রনাথ ভাবেন, 'আপন হতে বাহির

হয়ে বাইরে দাঁড়া, বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।' সেই রাবীন্দ্রিক চেতনাতেই যে সুকুমার উদ্‌বোধিত তাতে সন্দেহ থাকে না ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা সভায় সুকুমারের ভাষণগুলি কিম্বা 'চিরন্তন প্রশ্ন' 'দৈবেন দেয়ম' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি পড়লে। সুকুমার সন্ধানীরা জানে যে ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত ভাষণগুলি কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছিল 'তত্ত্ববোধিনী' 'প্রবাসী' বা 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার' নামে পত্র-পত্রিকায় কিন্তু দুঃখের কথা সেগুলি এখনও গ্রন্থভুক্ত হয় নি।

১৯১২ সালে লণ্ডনের 'ইষ্ট ওয়েষ্ট' সোসাইটিতে রবীন্দ্রকাব্য বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন সুকুমার। পঁচিশ বছর বয়সে লেখা সে-রচনার শিরোনাম ছিল 'The spirit of Rabindranath Tagore.' পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবী সভায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়াই ছিল এ-প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দুধর্ম ও ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রভাব কিছুমাত্র অস্বীকার না করে, বরং তার মূল সুর আত্মস্থ করে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক ও সাহিত্যিক স্বকীয়তা কোথায়, তার দিক্-নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন সুকুমার এই প্রবন্ধে। রবীন্দ্রকাব্যের বিবর্তনের বিষয়টিও এসেছিল প্রাসঙ্গিকভাবে।

কিন্তু কী এই স্বকীয়তা, রবীন্দ্র দর্শনের মূল চেহারাটাই বা কী—সুকুমার বিশ্লেষণ করেন সে-প্রসঙ্গ বিস্তৃত করেই। রবীন্দ্র সাহিত্যের পটভূমি বিশ্লেষণ করে তিনি দেখান ভারতীয় ঐতিহ্য ও বহু প্রশাখায় বিভক্ত হিন্দুধর্মের ঐশ্বর্যবান মূল মন্ত্রটির দ্বারা কতখানি প্রভাবিত রবীন্দ্রনাথ—কোথায় তাঁকে মনে হয় বৈষ্ণব-প্রভাবিত প্রেমতত্ত্বানুসারী আর কোথায় তিনি জ্ঞানমার্গদীপ্ত বেদান্তবাদী। আর এই দুই দর্শনের কোনটিরই যে তিনি অন্ধ অনুগামী নন, রবীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট যে মুক্তি সে যে মানবসত্তার সামগ্রিক বিকাশের সঙ্গে জড়িয়ে, বিশ্বজনীনতার আদর্শে বিধৃত, অথবা আত্মশক্তি উদ্‌বোধনের এক নিবিড় চর্চায় যে এক পরমশক্তির উন্মোচন সম্ভব—রবীন্দ্রদর্শনের এই কথাগুলি বুঝিয়ে দেন সুকুমার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে। ব্যক্তিমুক্তির স্বরূপ বলতে রবীন্দ্রনাথ যা বোঝেন সে বিষয় উল্লেখ করে সুকুমার লিখেছেন, Mukti or Freedom is the fulfilment of the purpose of existence. and that fulfilment is perfect self-realisation. আর সত্তার এই বোধন অর্থাৎ মুক্তির সন্ধান করেছেন রবীন্দ্রনাথ প্রেমের পূর্ণতার মধ্যে, জগতের বহু বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করে সীমার মাঝে অসীমের ছোঁয়া অনুভব করে। সুকুমার তাই লেখেন, 'Rabindranath's poetry is an echo of the infinite variety of life' of the triumph of love of the supreme unity of existence, of the joy that abides at the heart of all things. The whole development of his poetry is a sustained glorification of love. His philosophy of love is an interpretation of the mystery of existence itself." প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে তার এই বক্তব্য বিশ্লেষণের সূত্রে সুকুমার অনুবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ দুটি কবিতা

এবং দু একটির অংশবিশেষ। "প্রভাত-সংগীত" 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর দুটি কবিতার অংশবিশেষ ছাড়া সুকুমার অনুবাদ করেছিলেন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' এর মৌল অংশটুকু রবীন্দ্রকাব্যের বিবর্তনের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য। আর কবির দার্শনিক বোধ বিশ্লেষণের জন্য সুকুমার অনুবাদ করলেন 'উৎসর্গ' কাব্যের 'সুদূর' কবিতাটির পূর্ণ অবয়ব আর 'উৎসর্গ' কাব্যের সতের নম্বর কবিতাটি, যার মধ্যস্থ দুটি পঙক্তি হল,

অসীম যে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।

সুকুমারের অনুবাদে,

The limitless abides in the close touch of limits,,
The limits lose themselves in the limitless

এই কয়েকটি অনুবাদ ছাড়াও সুকুমার রবীন্দ্রনাথের আরও কিছু কবিতার অনুবাদ করেছিলেন, যদিও সে সব অনূদিত কবিতার সন্ধান এখনও আমরা জানি না। তবে বিপুল উৎসাহেই যে লণ্ডনে বসে সুকুমার এসব অনুবাদের কাজে লিপ্ত, তা উপেন্দ্রকিশোরকে লেখা সুকুমারের এক চিঠিতেই আমরা জানতে পারছি। সুকুমার লিখেছেন যে চিঠিতে, 'মঙ্গলবার রবিবাবুর ওখানে রাত্রে খাবার নেমন্তন্ন ছিল। Rothenstein ও সেখানে এসেছিলেন—দুজনেই বললেন, আমি রবিবাবুর কয়েকটা poetry-র যা translation করেছি তা তাঁদের খুব ভালো লেগেছে—সেইগুলো এবং আরো কয়েকটা translate করে publish করবার জন্য বিশেষ করে বললেন। রবিবাবু এখানে আসায় অনেকেই খুব interested হয়েছেন......Mr. Rothen stein বল্লেন, এখানকার কয়েকজন ভাল ভাল লেখক রবিবাবুর translation যদি কেউ করে তাঁরা সেটা দেখে দিতে রাজি আছেন। এখন অবসর আছে—কাজেই অনেকগুলো poetry translation করেছি। যদি সুবিধা হয় publish করব। দু তিন জন publisher এখন নিতে রাজি আছে।'

॥ দুই ॥

"The spirit of Rabindranath Tagore" প্রবন্ধটি লেখার বছর-দুয়েক বাদে ১৯১৪ সালে সুকুমার হিন্দু ব্রাহ্ম সম্পর্কের সমস্যাকে কেন্দ্র করে অজিতকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে এক বিতর্কে নিজেকে জড়ালেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এর সাক্ষ্য মেলে [দ্রষ্টব্য, অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'ব্রাহ্মসমাজের সমস্যা'—তত্ত্ববোধিনী, জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৬ শক ; 'ব্রাহ্ম ও হিন্দু', ঐ, আষাঢ় ১৮৩৬ শক ; সমর্থনে স্বাক্ষরহীন পত্র, ঐ, শ্রাবণ ১৮৩৬ শক ; অজিতকুমার চক্রবর্তী, পত্রোত্তর, ঐ, ঐ ; সুকুমার রায়চৌধুরী 'ব্রাহ্ম ও হিন্দু প্রবন্ধের প্রতিবাদ' ঐ, ভাদ্র ১৮৩৬ শক ; অজিতকুমার চক্রবর্তী ঐ, ঐ ; সুকুমার রায়চৌধুরী 'ব্রাহ্ম হিন্দু সমস্যার প্রতিবাদ, ঐ, আশ্বিন কার্তিক

১৮৩৬ শক ; অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'ব্রাহ্ম হিন্দু সমস্যা প্রতিবাদের উত্তর' ঐ, ঐ ; গুরু চরণ মহলানবিশ, 'প্রতিবাদ-পত্র,' ঐ, অগ্রহায়ণ ১৮৩৬ শক ; অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'প্রতিবাদ সম্বন্ধে বক্তব্য' ঐ, ঐ ; ঐ, 'ব্রাহ্ম হিন্দু সমস্যা,' ঐ পৌষ ১৮৩৬ শক)।

তবে হিন্দু ব্রাহ্ম সম্পর্ক বিষয়ে এই বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল এর কিছুকাল আগেই রবীন্দ্রনাথের মতামতকে কেন্দ্র করে। ১৯১১ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ তিনটি প্রবন্ধ—'ব্রাহ্ম সমাজের সার্থকতা' 'আত্ম পরিচয়' 'হিন্দু ব্রাহ্ম'। আর উল্লিখিত সময়ে প্রবাসী রবীন্দ্রনাথ তাঁর জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে বা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রমুখকে যে সব চিঠিপত্র লেখেন তাতেও জানা গেল ব্রাহ্ম আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথ কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গ্রহণ করেন বা হিন্দু-ব্রাহ্ম সম্পর্ক বিষয়েই বা তাঁর মত কী? রবীন্দ্রনাথ জানালেন, অচলায়তন হিন্দুসমাজ আর কুসংস্কারদীর্ণ হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন সার্থক হলেও সম্প্রদায়গতভাবে ব্রাহ্মদের পৃথক কোন অস্তিত্বই নেই। হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের আত্ম-পরিচয়ের প্রকাশ ঘটতে পারে না। 'ব্রাহ্ম সমাজের সার্থকতা' প্রবন্ধে কবি লিখলেন, 'ব্রাহ্ম সমাজকে, তার সাম্প্রদায়িকতার আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে, মানব ইতিহাসের এই বিরাট ক্ষেত্রে বৃহৎ করে উপলব্ধি করবার দিন আজ উপস্থিত হয়েছে'। হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্রাহ্মদের নিবিড় বন্ধনের সূত্র উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ 'আত্মপরিচয়'-এ লিখলেন। '……ব্রাহ্ম সমাজ আকস্মিক অদ্ভুত একটা খাপছাড়া কাণ্ড নহে। যেখানে তাহার উদ্ভব যেখানকার সমগ্রের সহিত তাহার গভীরতম জীবনের যোগ আছে। বীজকে বিদীর্ণ করিয়া গাছ বাহির হয় বলিয়াই সে গাছ বীজের পক্ষে একটা বিরুদ্ধ উৎপাত নহে। হিন্দু সমাজের বহুস্তরবদ্ধ কঠিন আবরণ একদা ভেদ করিয়া সতেজ ব্রাহ্মসমাজ মাথা তুলিয়াছিল বলিয়া তাহা হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধ নহে, ভিতর হইতে যে অন্তর্যামী কাজ করিতেছেন। তিনি জানেন তাহা হিন্দু-সমাজেরই পরিণাম।' অতএব রবীন্দ্রনাথের মতে, 'হিন্দু ব্রাহ্মরা হিন্দুই অর্থাৎ যে ব্যক্তি হিন্দু সে ব্রাহ্ম হইলেও হিন্দু ব্রাহ্ম না হইলেও হিন্দু।' প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য ব্রাহ্মরা মূলত হিন্দু।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গি গোঁড়া ব্রাহ্মদের অনেকেরই পছন্দ ছিল না। 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধের প্রতিবাদে তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় [১ বৈশাখ, ১৩১৯] লেখা হল, 'ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু কিনা, এ কথা বিচার করিবার অধিকার আদি ব্রাহ্ম-সমাজের কাহারও নাই, উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ হিন্দুত্বের সংকীর্ণ গণ্ডী অনেককাল অতিক্রম করিয়াছেন।'

মনে রাখা দরকার যে, বিতর্কের এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের একনিষ্ঠ কর্মী, 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদকও বটে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে আদি সমাজভুক্ত হলেও হিন্দুসমাজের সদর্থক ঐতিহ্যের প্রতি ব্রাহ্ম-সমাজের নিরুৎসাহী

মনোভাব রবীন্দ্রনাথ কখনই অনুমোদন করেন নি। ব্রাহ্ম-সমাজের তিন শাখার গোষ্ঠীদ্বন্দ্বেরও তীব্র সমালোচক ছিলেন তিনি। হিন্দু সমাজের সংকীর্ণ কুরীতিগুলি পরিহার করে ব্রাহ্ম আন্দোলন যে বিশ্বজনীনতার অন্বেষণে সচেষ্ট সেই ধারার অব্যাহত গতিকে বেগবান করে তুলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মহাজাতির প্রাচীন ঐতিহ্য বিস্মৃত না হয়ে। বস্তুত এখানেই রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য, তাঁর আত্মপরিচয় অন্বেষণের বিশেষ সূত্র।

১৩২১-এর জ্যৈষ্ঠ মাসের 'তত্ত্ববোধিনী'তে রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য অজিতকুমার চক্রবর্তী হিন্দু-ব্রাহ্ম সম্পর্ক বিষয়ে নববিধান ও সাধারণ সমাজেয় গোঁড়া ব্রাহ্মনেতাদের সংকীর্ণতা ও উগ্র স্বাতন্ত্র্যের সমালোচনা করে লিখলেন 'ব্রাহ্ম সমাজের সমস্যা' নামে একটি প্রবন্ধ। এই বিষয়েই আষাঢ় সংখ্যাতে লিখলেন 'ব্রাহ্ম ও হিন্দু' নামে আরেক প্রবন্ধ। ব্রাহ্মরা যে মূলত হিন্দু এবং হিন্দু ঐতিহ্য অস্বীকার করে ব্রাহ্মদের যে কোন কুলপরিচয় নেই, অজিতকুমার সে কথাগুলিই লিখেছিলেন বিস্তৃত করে। অজিত-কুমারের দ্বিতীয়োক্ত এই প্রবন্ধের বিরুদ্ধেই সুকুমারের ভাদ্র সংখ্যায় 'ব্রাহ্ম হিন্দু সমস্যার প্রতিবাদ' শীর্ষক নিবন্ধ। বিতর্ক শুরু হল সমারোহ করেই। পরপর কয়েকটি সংখ্যায় চলল এই বিতর্ক, অবশেষে পৌষ সংখ্যায় অজিতকুমার চক্রবর্তী জানালেন যে, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবাদ কিছু নেই তাঁর ও সুকুমারের মধ্যে। পার্থক্য ঘটেছে গৌণ কিছু প্রসঙ্গে।

বস্তুত এ বিতর্কে সুকুমার সমস্যাটাকে দেখেছিলেন স্বতন্ত্র এক দৃষ্টিতে। ব্রাহ্ম-সমাজ হিন্দু কি অহিন্দু এ প্রশ্ন নিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যথা ছিল না। তিনি স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলেন, আমরা ব্রাহ্মরা যে হিন্দু—অর্থাৎ আমাদের 'জাতি পরিচয়' যে হিন্দু, ব্রাহ্ম সমাজ যে হিন্দু সমাজেরই অভিব্যক্ত প্রকাশ এবং ব্রাহ্ম আদর্শ যে মূলত হিন্দু আদর্শেরই পূর্ণ বিকশিত রূপ—এই সকল অত্যন্ত মামুলী সত্য আর নতুন করে জানবার বা বোঝাবার কোন প্রয়োজন নেই।' প্রকৃতপক্ষে 'হিন্দু নামরূপ পরিচয় লক্ষণ'-কে সুকুমার সমস্যার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে মানতে চাননি, তাঁর দৃষ্টিতে ব্রাহ্ম-সমাজের দুর্বলতা ধরা পড়েছিল সমাজের প্রাণহীনতায়, তার গতি-হীনতার চরিত্রে। সুকুমার লিখেছেন, 'ব্রাহ্ম সমাজের আত্মবিস্মৃতি ঘুচান আবশ্যক একথা সর্বতোভাবে স্বীকার করি কিন্তু হিন্দু সমাজের সহিত 'বিচ্ছেদ-ই' যে এই বিস্মৃতির মূল কারণ একথা একেবারেই বিশ্বাস করি না, কারণ এ বিস্মৃতি হিন্দু সমাজের অস্থিমজ্জাগত'।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের দৈন্য, যান্ত্রিকতা, আত্মকলহ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই এর ডাক দিয়েছিলেন এবং তাকে বিশ্বজনীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করার জন্য অন্য বহু কর্তব্যের সঙ্গে আত্মপরিচয়গত সংকট মীমাংসার এক সূত্র অন্বেষণ করার কথা বলেছিলেন। সুকুমার ব্রাহ্ম আন্দোলনের দুর্বলতা মোচনের জন্য রাবীন্দ্রিক পন্থেরই অনুগামী ছিলেন, সর্বাঙ্গীণ মানবমুক্তি, স্বদেশ-চেতনা ও স্বদেশ প্রীতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য ছিল তার ধর্মবোধ। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ অনুসারেই

তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সমাজ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিশুদ্ধ অধ্যাত্মমার্গকে, সমাজকল্যাণ ও মানব প্রগতির ধারণা থেকে তাঁর ধর্মবোধও উৎসারিত হয়েছিল। আর ব্রাহ্ম সমাজের আত্মবিস্মৃতির সমস্যাও তাঁর কাছে প্রাসঙ্গিক ছিল, কিন্তু সে সংকট-মোচনে 'হিন্দু-নামরূপ পরিচয় লক্ষণ'কে তাঁর সমাধানের সূত্র হিসেবে অনন্য মনে হয় নি। অজিতকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে বিতর্কে মেতে ওঠবার কারণ ওই টুকুতেই। সুকুমার লিখেছেন, 'ব্রাহ্ম সমাজ আগে তাহার নিজ স্বরূপকে চিনিতে শিখুক, নিজের চিন্তা জ্ঞান, সাধনা ও অনুভূতির দ্বারা আপনাকে উপলব্ধি করুক। কেননা রবীন্দ্রনাথের মতই তাঁরও ধারণা যে, 'ব্রাহ্ম সমাজ এককালে যাই থাকুক আজ সে অতিরিক্ত মাত্রায় গতিশীল নহে, স্থিতিশীলতার ব্যাধি তাহার হাড়ে হাড়ে। কোথা হইতে প্রাণের বেগ আসিয়া এ দৈন্যকে ঘুচাইবে তাহা নির্দেশ করা আমার সাধ্যাতীত। ব্যক্তিগত ভাবে নিজ জীবনে ইহার উত্তর অন্বেষণ করা ছাড়া যথার্থ কার্যকরী আর কোন মীমাংসার কথা আমি জানি না।' বোঝা যায়, 'নিয়ম চক্রে তৈল প্রদানের' পরিবর্তে সুকুমার চাইছেন এক দুর্বার প্রাণশক্তি প্রতিষ্ঠার, আর সে প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় যে রবীন্দ্রনাথই তাঁর সার্বভৌম আদর্শ, তাতে আর সন্দেহ কী।

॥ তিন ॥

দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছায় রবীন্দ্রনাথ বেশ অনেককাল আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদে ব্রত ছিলেন। তবে কবিজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে সে কাজ তিনি কর্তব্য হিসেবেই পালন করেছিলেন, তার বেশী কোন উৎসাহ ছিল না এবং উৎসাহ হ্রাস পেতে পেতে তাঁর জীবদ্দশাতেই আদি-ব্রাহ্ম সমাজের নিত্যকাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে এরই মধ্যে আবার ১৯১১-১২তে রবীন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন, শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক তৈরী করে সমাজের সংস্কার-সাধনে তৎপর হয়েছেন, 'তত্ত্ববোধিনী'তে শুষ্ক তত্ত্বালোচনার পরিবর্তে চিন্তা ভাবনায় সৃজনশীল মানবিকতাবোধ আমদানির চেষ্টা করেছেন। তবে এসব কাজে, রবীন্দ্রনাথের অখণ্ড বিশ্বধর্মে, মানবিক ধর্মচিন্তায়ও সাম্প্রদায়িকতার বন্ধনমুক্তিতে সমসাময়িক ধার্মিকেরা অনেকেই কিন্তু বিশ্বাসহীনতার প্রশ্রয় দেখতে পেয়েছেন। ভেবেছেন, এসব নেহাৎই ভাববিলাসী কবির ধর্ম, কেননা তিনি ধর্ম বিষয়ে কোন গুরু-উপদেশ গ্রহণ করেন না তাঁর ধর্মীয় ভাষণ কোন বিশেষ ভারতীয় দার্শনিক মতবাদ সমন্বিত হয়ে ওঠে না। অতএব এই দৃষ্টি নিতান্তই 'বস্তুতন্ত্রহীন'। এই অভিযোগ ছিল যেমন গোঁড়া হিন্দুদের গোঁড়া ব্রাহ্মরাও তাঁকে স্বীকার করেন নি। কিন্তু ওই একই সময়ে অনেকেই যে আবার রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-শীল উদার সার্বভৌমিকতায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাও দেখা যায়। বিশেষত তরুণদের মধ্যে তাঁর প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর ধর্ম-চিন্তার যে অচ্ছেদ্যরূপ, যুগমানসিকতার আশ্রয় থেকে যে উত্তরণের দাবি ছিল তাঁর

চিন্তায়-সাধনায়, তা ছিল তরুণ সমাজের অনুপ্রেরণার বিষয়। এরই ফলে অজিতকুমার চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র রায় যেমন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমেও আশ্রমিক, তেমনি সুকুমার রায়, কালিদাস নাগ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের মত আরও অনেকেই ছিলেন তাঁর ভাবানুগত আদর্শের সন্ধানী।

এরই প্রেক্ষিতে ১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাসে সুকুমার ও প্রশান্তচন্দ্রের নেতৃত্বে তরুণ ব্রাহ্মদের দাবি উঠল, রবীন্দ্রনাথকে সমাজের সম্মানিত সদস্যপদে বরণ করে নিতে হবে। ব্রাহ্মসমাজের সংবিধানে এরকম সভ্যপদ নেওয়ার রীতি ও নীতি চালু ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে এই সভ্যপদ দেওয়ার কথা উঠতেই সমাজের কার্য-নির্বাহিক সমিতির একাংশ আপত্তি জানালেন নানারকম খুঁটিনাটি টেকনিক্যাল আপত্তি তুলে। সমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী'তে প্রকাশিত হল এমন দু-একটি চিঠি যাতে বোঝা গেল রবীন্দ্রনাথের সভ্যপদ বিষয়ে তরুণদের দাবি স্বীকারে প্রবীণ ব্রাহ্মরা নিতান্তই অপারগ। এই অপারগতার কথা জানবার পর সুকুমার প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশেরা সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করে নিলেন তাঁদের প্রস্তাব। শুরু হল আসলে ব্যাপক আন্দোলনের প্রস্তুতি। ব্রাহ্ম তরুণদল সুকুমার-প্রশান্তচন্দ্রের নেতৃত্বে এ বিষয়ে প্রবীণ ব্রাহ্ম রবীন্দ্রানুরাগীর সমর্থন আদায়ের চেষ্টাও শুরু করলেন। পেলেনও তাঁরা অনেক বিদগ্ধ মান্য জনের অকুণ্ঠ সমর্থন। জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর মত ব্রাহ্ম মণীষীরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সুকুমারদের এই আন্দোলন সর্বতোভাবে সমর্থন করলেন। এই আন্দোলন যে এক পরিপূর্ণ জীবনবোধের আন্দোলন, সংকীর্ণতা পরিহার করে আত্মজাগরণের আন্দোলন, ১৩২৪-এর চৈত্র সংখ্যায় 'প্রবাসী'-তে সে কথাই লিখলেন সুকুমার, 'কেবল কতগুলি মূঢ় সংস্কারের প্রতিবাদের জন্য নয়, কেবল কতগুলি সাময়িক কুব্যবস্থার মোচনের জন্য নয়, জীবনের এই পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে জগতকে উজ্জ্বল করিয়া দেখিবার জন্য ব্রাহ্ম সমাজের ডাক পড়িয়াছিল.........সাধকমণ্ডলী চাই, উপাসক সম্প্রদায় চাই, আদর্শ উপাসক সম্প্রদায় চাই, আদর্শ বহুনকামী সমাজ চাই, কর্মের বিধিবিধান, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান —এ সমস্তই চাই, কিন্তু সর্বোপরি চাই অন্ধসংস্কারমুক্ত উদারচিত্ত প্রশস্ত প্রাণ ব্যক্তি-মানবকে, সত্যের জন্য অকুতোভয় সর্বত্যাগীকে, যে সত্যের জন্য এমন সংস্কার নাই এবং বন্ধন নাই যাহা ছাড়িতে পারে না। চাই বিশ্বমানবের সেইসব প্রতিনিধিকে যাহারা এই জীবনকে ক্ষুদ্র বলিয়া জানিবে না।' (জীবনের হিসাব) সুকুমারের কাছে বিশ্বমানবের এই প্রতিনিধি যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ নন, সে কথা বলা বাহুল্য।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে আন্দোলন যখন তুঙ্গে, ১৯২১ সালে, তখন সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য সুকুমার প্রশান্তচন্দ্রেরা প্রকাশ করলেন এক পুস্তিকা—'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই'—এই শিরোনামে। তাতে লেখা হল,

'আমরা দেখিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বিশ্বমানবকে লইয়া এক বিরাট সার্ব-

ভৌমিকতার আদর্শ গড়িয়া তুলিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমিকতা স্বাতন্ত্র্যকে পরিহার করে নাই, জাতীয়ত্বকে বর্জন করে নাই, বৈচিত্র্যকে বিসর্জন দেয় নাই। রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমিকতার মূল মন্ত্র—বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন। এই একমেবাদ্বিতীয়মের সাধনাকেই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত তপস্যা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসেও আমরা এই এক মূল আদর্শ দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথ নিজে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে ব্রহ্মসাধনার এই সার্বভৌমিক আদর্শটিকে বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করাই ব্রাহ্ম সমাজের পরম সার্থকতা। তাই রবীন্দ্রনাথের বাণী ব্রাহ্ম সমাজেরই বাণী।

............ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসে আজ 'নেতি' হইতে ও' ইতি-তে যাইবার দিন আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বাণী এই নূতন যাত্রাটিকে সূচনা করিতেছে, তাই আমরা রবীন্দ্রনাথকে চাই। তাহার এই বাণী শুধু একটি আদর্শমাত্র নহে, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের মধ্যে ইহা মূর্ত। তাই, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে মানুষ সেই মানুষটিকেই আমরা চাই। আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রীতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা চাই।'

শেষ পর্যন্ত সমাজে সভ্যদের রেফারেণ্ডামে রবীন্দ্রনাথ সম্মানিত সভ্য হিসেবে নির্বাচিত হলেন। সুকুমারদের জয় হল। পক্ষে ছিল ৪৪৬টি ভোট, আর বিপক্ষে ২৩৩টি। এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই সুকুমার রোগাক্রান্ত হলেন, অকালমৃত্যুও ঘটল তাঁর ১৯২৩-এ। ভাবতে ভাল লাগে যে, মৃত্যুর আগে ব্রাহ্ম সমাজের আঙিনায় তিনি তাঁর শেষ লড়াইটি চালিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই। আর রোগশয্যার দীর্ঘপর্বে যখনই আসেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর তরুণ বন্ধুকে দেখতে, সুকুমার শুনতে চেয়েছেন কবির মুখে সেইসব গান যাতে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, '.........সেদিন সেই যুবকের মৃত্যুশয্যায় দেখলুম সু-দীর্ঘকাল দুঃখভোগের পরে জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর মত অত বড় বিচ্ছেদকে, প্রাণ যাকে বিরাট শত্রু বলে জানে, তাকেও তিনি পরিপূর্ণ করে দেখতে পেরেছেন। তাই আমাকে গাইতে অনুরোধ করেছিলেন—

'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে। ....'

যে গানটি তিনি আমাকে দু'বার অনুরোধ করে শুনলেন সেটি এই :

দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো, গভীর শান্তি এ যে,
আমার সকল ছাড়িয়ে গিয়ে উঠল কোথায় বেজে।
ছাড়িয়ে গৃহ, ছাড়িয়ে আরাম, ছাড়িয়ে আপনারে
সাথে করে নিল আমায় জন্ম মরণ পারে,
এল পথিক সেজে। ....'

(১) সুকুমার রায় ব্রাহ্ম ছাত্রসমাজের উৎসাহী নেতা তো ছিলেনই, কিন্তু তার সঙ্গে গড়ে তুলেছিলেন আরেক 'যুবসমাজ'। সেই যুবসমাজ ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে প্রাণ প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়েছিলেন, শিল্প ছন্দ সুষমায় সমাজের আদর্শকে বাঁধতে চেয়েছিলেন নতুন করে। পেরেছিলেন কতটুকু সেটা বিচারের বিষয় হতে পারে, কিন্তু স্বল্পায়ু জীবনে সুকুমার যে চেষ্টায় মেতেছিলেন নিরন্তর, তার প্রমাণ অজস্র। সমাজের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা সংস্কার সাধনে। এঁরা ছিলেন সতত তৎপর। যুবসমাজের উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল ব্রাহ্ম মৈত্রীসভা বা ফ্রেটারনিটি —এডুকেশনাল, ডিভোশনাল, সোশ্যাল, লিটারেরি। সুকুমারের নেতৃত্বে তরুণ ব্রাহ্মরা 'ছাত্রসমাজের' নিয়ম কানুনগুলি সংস্কার করার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে তৈরি হয়েছিল অ্যাডমিশন ফর্ম কমিটি। সুকুমার এই কমিটির একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্ম সমাজের রীতিনীতিতে, আচার আচরণে স্থবিরতা বা নিশ্চলতার যে গ্লানি অনুভব করতেন সুকুমারেরা, বিদ্রোহ ছিল মূলত তারই বিরুদ্ধে। সমাজের প্রবীণ নেতাদের চিন্তাতেও প্রায়ই টের পাওয়া যেত এই স্থবিরতা। অথচ ব্রাহ্ম মন্দিরের চত্বরে বেসব বক্তৃতা—উপাসনাবাণী শোনা যেত তাতে বলা হত অন্য কথা। ধর্ম আচারশাসনের কূপমণ্ডুকতা নয়, নিস্তরঙ্গ জীবন বোধ নয়; ধর্ম জীবন উপভোগ করার সানন্দ মাধ্যম, তা জীবনের ব্যাপ্তি ঘটায়, প্রসার করে মানুষের রুচিবোধ, তার দৃষ্টিভঙ্গি। এসব কথার ফুলঝুরি থাকলেও সুকুমারেরা বুঝতে পারছিলেন যে বাস্তবিক জীবনচর্যায় সেসব আদর্শের কোন প্রতিফলন নেই। তাই ছাত্রসমাজের সভ্যপদ প্রার্থীকে যখন শপথ নিতে হত 'মদ খাব না, সিগারেট খাব না, পাবলিক থিয়েটারে যাব না'—তাতে সুকুমার রায় টের পেতেন এক স্থবির শুচিবায়ুগ্রস্ত নঙর্থক মনোভাব। অ্যাডমিশন ফর্ম রিফর্ম কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে তিনি এর পরিবর্তন চেয়েছিলেন। পরিবর্তে জানতে চেয়েছিলেন 'কী কী করব' সেকথা কেন বলা হয় না। ব্রাহ্ম নীতিদর্শনের মধ্যে ইতিবাচক প্রত্যয়ের বদলে নিষেধের প্রাবল্য নিয়ে যে কেবল সুকুমার ও তাঁর যুবকবন্ধুরাই ভাবিতে ছিলেন, তাও কিন্তু বলা যাবে না। বস্তুত সে আমলে জ্ঞানমার্গী আরও বেশ কয়েকজন ব্রাহ্মনেতা যেমন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রমুখরাও তর্ক তুলে ছিলেন তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনায়। সমাজের ধর্মতত্ত্বের ইতিবাচক রূপ নিয়ে এক প্রবল তাত্ত্বিক তর্ক ছিল সেসময় জোরদার। তবে সুকুমার বা যুবব্রাহ্মরা এই তাত্ত্বিক তর্কে যোগ দিয়েছেন, এমন কোন সাক্ষ্য নেই। বরং এসব তত্ত্বভাবনা তাঁদের কাছে ছিল খানিকটা ধোঁয়াটে। বাস্তবে তাঁরা চেয়েছিলেন এসব ব্যবস্থার আমূল সংস্কার। আর তাত্ত্বিক এসব তর্ক

বিতর্ক ও ঝগড়াঝাটি যে সুকুমারের কাছে খানিকটা কৌতুকময় ছিল তারও প্রমাণ তাঁর লেখা 'চলচিত্তচঞ্চরী', 'ভাবুকসভা' ইত্যাদি নাটিকা। সমাজের কার্যবিধির সংস্কার আন্দোলনে আরেকটি ঘটনাও বোধহয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। সে ঘটনাটা হল উপাসনার বেদীসংক্রান্ত আন্দোলন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে উপাসনা বেদীটি ছিল সিমেন্ট বাঁধানো স্থায়ী আসন। মন্দিরগৃহ তৈরির সময়ই এটি তৈরি হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের যুবকসভ্যরা সে বেদী ভেঙে ফেলে গোপনে বসিয়ে দিয়েছিলেন একটি কাঠের বেদী, যার কোন অনড় অচল মহিমা নেই। এ কাণ্ড করার পিছনে ছিল এক গভীর গণতান্ত্রিক বোধ। ব্রাহ্মধর্ম প্রতীকী উপাসনায় বিশ্বাস করে না, কিন্তু নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে আচার্য কেশবচন্দ্র সেন যে বেদীতে বসে উপাসনা করতেন, কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর সে বেদী শূন্য রাখা হয়েছিল, তৈরি হয়েছিল, আরেক স্বতন্ত্র বেদী। কারণ যে বেদীতে কেশবচন্দ্র আসীন হতেন তা কখনও অন্যের আসন হতে পারে না। কেশবচন্দ্র তাঁর বেদী প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। সাধারণ সমাজের যুবকদের কাছে এই অভিজ্ঞতা রীতিমত ভীতিপ্রদ ছিল, আর সেই কারণেই তাঁদের কাঠের বেদীর প্রতিষ্ঠা।

(২) 'ছেলেবেলার দিনগুলি'-তে পুণ্যলতা চক্রবর্তী লিখেছেন, 'হয়তো কারো উপর রাগ হয়েছে অথচ তার শোধ নিতে পারছিনা, তখন দাদা বলত 'আয়, রাগ বানাই।' বলেই সেই লোকটির সম্বন্ধে যা তা অদ্ভুত গল্প বানিয়ে বলতে আরম্ভ করত, আমরাও সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বলতাম। তার মধ্যে বিদ্বেষ কিংবা হিংস্রভাব কিছু থাকত না, সে ব্যক্তির কোন অনিষ্ট চিন্তা থাকত না, শুধু মজার কথা। যত রকম বোকামি হতে পারে সবকিছু সেই লোকটির সম্বন্ধে কল্পনা করে আমরা হেসে কুটি পাতি হতাম।' (পৃষ্ঠা ৫৫)



চলচিত্তচঞ্চরি

॥ এক ॥

চলচিত্তচঞ্চরি প্রথম বেরিয়েছিল 'বিচিত্রা' পত্রিকায়।[১] তার প্রায় চারবছর আগে সুকুমার রায়ের অকালমৃত্যু ঘটেছিল। বিচিত্রায় চলচিত্তচঞ্চরির জন্য গুটিকতক ছবি এঁকেছিলেন যতীন্দ্রকুমার সেন ওরফে নারদ।

'ঝালাপালা'য় প্রথম সিগনেট সংস্করণে চলচিত্তচঞ্চরি অন্তর্ভুক্ত হয় নি। এ নাটককে প্রথম জনপ্রিয় করেন 'রূপকার' নাট্যগোষ্ঠী ষাটের দশকের গোড়ার দিকে। সন্তোষ দত্তের ভবদুলাল এবং সবিতাব্রত দত্তের ঈশান গানে অভিনয়ে প্রযোজনাটি জমিয়ে দিয়েছিল।

চলচিত্তচঞ্চরি ঠিক কত সালে সুকুমার লিখেছিলেন তা বোধহয় বলা যায় না। 'সুকুমার রচনা সমগ্র'তে সম্পাদক জানিয়েছেন এটি নাকি লেখা হয়েছিল 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম'-এর সমকালে অর্থাৎ ১৩২১ সালে।[২]

দুটি কারণে এ তথ্য সঠিক বলে মনে হয় না। প্রথমত, ১৩২১ সালে (ইং ১৯১৪ খৃঃ) যদি একটি লেখা হয় তাহলে এটি লেখার পরেও সুকুমার প্রায় ন'বছর বেঁচেছিলেন। অথচ এমন একটি ধাঁধানো লেখা তিনি না ছাপিয়ে ফেলে রেখেছিলেন, একথা মেনে নেওয়া কঠিন। অবশ্য এমন যদি হয় এ-নাটকে যাঁদের তিনি ব্যঙ্গ করেছিলেন তাঁরা কেউ কেউ চারপাশের চেনাজানাদের মধ্যে ঘোরাফেরা করেন, তাহলে না-ছাপানোর একটা কারণ থাকতে পারে। তবে ব্যঙ্গে তো তেমন সম্ভাবনার সুযোগ সবসময় থেকেই যায় এবং তেমন ধরনের লেখা, এমন কি, সুকুমার রায়ের অন্যত্রও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তাই কোপটা শুধু চলচিত্তচঞ্চরির উপরই পড়বে কেন?

দ্বিতীয়ত, এ-নাটকে সভাসমিতির হাস্যকরতা নিয়ে যেভাবে বিদ্রূপ করা হয়েছে তার কিছু ঐতিহাসিক উৎস খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্য করার ব্যাপারে ব্রাহ্মদের মধ্যে তুমুল বিতণ্ডা হয়েছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ নবীন সভ্যরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন এবং প্রচুর বিতর্ক চলে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে গোলযোগ যদিও চলছিল ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কিন্তু ব্যাপারটি চরমে উঠেছিল ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। মনে হয়, এরই অভিঘাতে নাটকটি লেখা হয়েছিল। সে-হিসাবে রচনাকালকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত টেনে নেওয়া যেতে পারে।[৩] অর্থাৎ ১৯১৭ থেকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে এটি লেখা হয়েছিল।

চলচিত্তচঞ্চরিতে দুটি সভার কথা আছে। সাম্যসিদ্ধান্ত সভা এবং শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রম। অবশ্য শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রমের চেহারা ও চরিত্র সভার চাইতে কিছু আলাদা। কিন্তু তার মধ্যেও সভার বৈশিষ্ট্য বেশ খানিকটা রয়ে গেছে। তাছাড়া দুটো প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের মধ্যে প্রকৃতিগত মিল খোঁজার জন্য বেশি ভাবতে হয় না। আবার শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রম পুরোপুরি সভা নয় বলেই তাকে ব্যঙ্গের কেন্দ্রে রাখেন নি সুকুমার, এমন সিদ্ধান্তও করা চলে হয়তো।

প্রশ্ন এই, সুকুমার রায় এধরণের সভাসমিতির উপর ক্ষিপ্ত হলেন কেন? তিনি নিজেই এধরণের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন! অবশ্য সৃষ্টিশীল লেখক মাত্রেই নিজের স্খলন পতন ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন থাকেন। সুকুমার রায়ও ছিলেন। বরং একটু বেশী পরিমাণেই ছিলেন। নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ করবার মতো তির্যক দৃষ্টিও তাঁর ছিল। শুধু মাত্র এর মধ্যে বোধহয় উত্তরটি খুঁজলে চলবে না।

আসলে সভাসমিতির বিরুদ্ধে একটা বিরূপ মনোভাব বাঙালীদের মধ্যেই বহুদিন ধরে গড়ে উঠেছিল। এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে উনিশ-শতকী নবজাগরণে নতুন মূল্যবোধ বাঙালীর জীবনে যে উত্তেজনা আর তরঙ্গ তৈরি করেছিল তার বেশ কিছু অংশ প্রকাশ পেয়েছিল সেকালের সভাসমিতিগুলোর মধ্য দিয়ে। সমাজ-বিজ্ঞানীরাও বলেন, সভাসমিতির কাজই হলো 'পেশাদারী আগ্রহ নিয়ে জ্ঞানের উন্নয়ন'[৪] ঘটানো। কিন্তু আমাদের নবজাগরণজাত উদ্যম অনেকটাই সীমিত থেকেছিল শুষ্ক তত্ত্ব-আলোচনায়, যেহেতু দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ও রাষ্ট্র পরি-চালনার সঙ্গে বাঙালীর তেমন কোনো যোগ ছিল না। তাই জীবন-বিচ্ছিন্ন বাগাড়ম্বর স্বাভাবিক কারণেই জাতির জীবনে প্রশ্রয় পেয়েছিল। অজস্র সভাসমিতির কর্ম-চাঞ্চল্যের মধ্য দিয়ে গত শতকের সামাজিক ভাঙাগড়ার প্রতিফলন ঘটেছিল একথা যেমন ঐতিহাসিক সত্য, তেমনি আবার তার অর্থহীন প্রাচুর্য অনেক সময়ে হাস্যকর হয়ে উঠত এ তথ্যও মিথ্যে নয়। সেই উনিশ-শতকেই স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এ ব্যাপারে কঠিন বিদ্রূপ করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তিনি [ঈশ্বরচন্দ্র] আজিকার দিনে বাঁচিয়া নাই, তাহা হইলে সভার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতেন। রামরঙ্গিণী, শ্যামতরঙ্গিণী, নববাহিনী, ভবদাহিনী

প্রভৃতি সভার জ্বালায় তিনি কলিকাতা ছাড়িতেন—।"[৫] ঈশ্বরচন্দ্র ব্যতিব্যস্ত হতেন কিনা বলা যায় না তবে বঙ্কিমচন্দ্র যে হয়েছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই তাই লিখেছেন "কলিকাতা ছাড়িলেও নিষ্কৃতি পাইতেন, এমন নহে। গ্রামে গেলে দেখিতেন, গ্রামে গ্রামরক্ষিণী সভা, হাটে হাটভঞ্জিনী, মাঠে মাঠ-সঞ্চারিণী, ঘাটে ঘাটসাধনী, জলে জলতরঙ্গিণী, স্থলে স্থলশায়িনী, খানায় নিখাতিনী, ডোবায় নিমজ্জনী, বিলে বিল-বাসিনী এবং মাচার নীচে অলাবুসমপহারিণী সভাসকল সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছে।"[৬] সভাগুলোর নামকরণের মধ্যে যে ঝাঁঝ, বিদ্রূপ ও শব্দগত হুল্লোড় রয়েছে তা যেন অনায়াসে সুকুমার রায়েও খাপ খেয়ে যায়। সাম্যসিদ্ধান্ত সভার নামটি যেন একটুর জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের নজর এড়িয়ে গেছে।

শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নয়, এমন কি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দেও ব্রাহ্মসমাজেরই অন্যতম প্রবীণ ও প্রধান ব্যক্তি আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন, এমন একটি সভা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যার ঘোষিত উদ্দেশ্য হবে যেকোনো সভাসমিতির ধ্বংসসাধন। এ সভার নাম হবে 'সভানিবারণী সভা'। যেখানেই কোনো সভার সভ্যরা একসঙ্গে বসবে অমনি সভানিবারণীর সভ্যরা লাঠি সোটা নিয়ে সেখানে ছুটে যাবে এবং গায়ের জোরে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেবে।[৭]

শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো প্রবীণ স্থিতধী মানুষ যদি এব্যাপারে এতটা বিচলিত হতে পারেন তাহলে সুকুমার রায়ের মতো সচেতন তরুণদের মনের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে সুকুমার রায়ের ঘনিষ্ঠতার কথা সকলেরই জানা। চলচিত্তচঞ্চরির রচনার প্রেক্ষিত হিসেবে উদ্ধৃত মন্তব্যগুলি মনে রাখা যেতে পারে।

তবে মনে হয়, শুধু কিছু অনির্দিষ্ট ক্ষোভ সুকুমার রায়কে এ তীক্ষ্ণ নাটকটি লেখায় প্রবৃত্ত করে নি। সমকালীন ব্রাহ্মসমাজের সংকীর্ণতা ও দলাদলি তাঁকে উত্তেজিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সদস্য করার প্রস্তাবে ব্রাহ্মদের মধ্যে যে তুমুল মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, তা অনেক তরুণ ব্রাহ্মের সঙ্গে সুকুমারকেও অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ করেছিল। প্রভাবশালী ব্রাহ্মদের একটি অংশ মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ আদৌ ব্রাহ্মই নন। তাঁর লেখা প্রেমের গান ব্রাহ্মভাবা-দর্শের বিরোধী।[৮]

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ব্রাহ্মদের এ লড়াই চলছিল ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। রবীন্দ্র-নাথের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

যাই হোক, তরুণ গোষ্ঠীর নেতা হিসাবে সুকুমার প্রবীণ ব্রাহ্মদের এ মনোভাব বরদাস্ত করতে পারেন নি। উদার মানবিকতায় পুষ্ট সুকুমার যে-কোনো ধরণের সংকীর্ণতাকে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম ছিলেন। তিনি জানতেন, "মিথ্যা দৈবের অন্ধ-সংস্কারে মানুষ ডুবিয়া আছে"[৯] এবং "বিজ্ঞানের জুজু যখন টিকিতত্ত্ব ও গঙ্গাজল মাহাত্ম্যের সমর্থনেও অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তখন দৈববাদ যে বিজ্ঞানের দোহাই দিবে সেটা কিছুই বিচিত্র নয়।"[১০] তাই "আগে তাহার মোহসংস্কার ভাঙিয়া দেখ, আগে

জীবনকে এই অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার কর।"[১১] শ্রীখণ্ডদেব ও সত্যবাহনদের দল সংস্কারকেই বিজ্ঞান বলে চালাতে চায়, সুকুমার তা স্বীকার ক'রে নেবেন কেন? তিনি জানেন, "জীবনের যে কোন দ্বন্দ্ব জীবনের মধ্যেই আপনার সর্বোত্তম সমাধান লাভ করিয়া থাকে। কারণ, জীবনের একটা তন্ত্র লজিক আছে, তাহা তত্ত্বের লজিককে চিরকালই অতিক্রম করিয়া যায়।"[১২] চলচিত্তচঞ্চরিতে সুকুমার স্বতন্ত্র লজিক হাজির করেছেন। যে 'কমন ম্যান'-কে[১৩] তিনি খুঁজেছেন নিজস্ব লজিকে ভবদুলাল তারই প্রতিভূ হয়ে এস্‌টাব্লিশমেণ্টের বিরুদ্ধে ফেটে পড়েছে। চলচিত্তচঞ্চরি সুকুমার রায়ের সংকটময় ও সংঘাতপূর্ণ মননেরই তির্যক অভিব্যক্তি। ভবদুলাল সুকুমার সৃষ্ট এমন একটি চরিত্র যাতে লেখকের ব্যক্তিত্বের আরোপ ঘটেছে সবচাইতে বেশি।

॥ দুই ॥

রাগ বানাতেন সুকুমার। "হয়তো কারো উপর রাগ হয়েছে অথচ তার শোধ নিতে পারছি না, তখন দাদা বলত 'আয়, রাগ বানাই।' বলেই সেই লোকটির সম্বন্ধে যা তা অদ্ভুত গল্প বানিয়ে বলতে আরম্ভ করত, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বলতাম। তার মধ্যে বিদ্বেষ কিংবা হিংস্রভাব কিছু থাকত না, সে ব্যক্তির কোনও অনিষ্ট চিন্তা থাকত না, শুধু মজার মজার কথা। যত রকম বোকামি হতে পারে সবকিছু সেই লোকটির সম্বন্ধে কল্পনা করে আমরা হেসে কুটিপাতি হতাম।"[১৪] চলচিত্তচঞ্চরিও সুকুমার রায়ের এমনই একটি রাগ-বানানোর দলিল। এবং পুণ্যলতার সাক্ষ্য মেনেও ভাবতে ইচ্ছে যায় এ-নাটকে যাদের নিয়ে রাগ বানানো হয়েছে তারা সুকুমারের চেনা লোকই হয়তো, তাই সব মজা তাঁর রাগকে চাপা দিতে পারে নি। পরশুরামের 'বিরিঞ্চিবাবা'য় সত্য যেমন প্রবল চেষ্টায় হাসিটাকে কান্নায় রূপান্তরিত ক'রে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিল, সুকুমারও তাঁর ক্রোধকে হাসিতে পাল্টে নিয়ে চলতে চেয়েছেন এ নাটকে। তবে তাঁর এ চেষ্টা যে সম্পূর্ণ সফল হয়েছে এমন বলা যায় না। কেননা প্রবল চেষ্টা সত্ত্বে তাঁর রাগ ফুটে বেরিয়েছে। চলচিত্তচঞ্চরি সুকুমারের সবচাইতে ক্রুদ্ধ রচনা।

চলচিত্তচঞ্চরি নামটির সঙ্গেই সম্ভবত সুকুমারের কিছু ক্রোধের অনুষঙ্গ এসে যায়। একটি অসমাপ্ত রচনায় রয়েছে—

চলে চটপট চকিত চরণ, চোঁচা চম্পট নৃত্যে,
চলচিত্রিত চিরচিন্তন, চলে চঞ্চল চিত্তে।…
চলে চকমকি চোখের চাহনে, চঞ্চরী-চল-ছন্দ,
চলে চীৎকার চাবুক চালনে, চপেট চাপড়ে চণ্ড।[১৫]

চলচিত্তচঞ্চরির প্রভৃতি অনুপ্রাসের সঙ্গে অনিবার্যভাবেই যেন চাবুক চালানো আর চণ্ড চাপড়ের কথা তাঁর মনে চলে এসেছে। এ চাবুক কথার চাবুক। তা তিনি তুলে দিয়েছেন ভবদুলালের সংলাপে। রাগের প্রমাণ রয়েছে প্রায় সারা নাটকটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সাম্যসিদ্ধান্ত সভার সদস্যদের সঙ্গে শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রম থেকে প্রত্যাগত

ভবদুলালের সংলাপ—

ভবদুলাল ঃ···এই তো সেদিন আমায় বলছিলেন ঈশান আর সত্যবাহন দুই সমান—এ বলে আমায় দেখ আর ও বলে আমায় দেখ। আরে দেখব আর কি? এরও যেমন কানকাটা খরগোসের মতন চেহারা, ওরও তেমনি হাঁ-করা বোয়াল মাছের মতন চেহারা! [চতুর্থ দৃশ্য]

একথা শ্রীখণ্ড়দেবের না ভবদুলালের? অবশ্যই ভবদুলালের। অন্তত শেষ দুটো লাইন ত বটেই। ভবদুলাল শুধু ঈশান ও সত্যবাহনকে কানকাটা খরগোস বা হাঁ-করা বোয়াল মাছ বলছে না, সোমপ্রকাশ নিকুঞ্জ জনার্দন কারুকেই ছাড়ছে না। ফলে সোমপ্রকাশ হলো 'কোলা ব্যাঙ', জনার্দন 'ছাগলা দাড়ি' এবং নিকুঞ্জ 'ডাবাহুঁকো'।

সত্যবাহন ঃ কি! এত বড় আস্পর্ধা! আমায় কানকাটা খরগোস বলে!

ভবদুলাল ঃ না, না, আপনাকে তো তা বলেনিনি, আপনাকে বোয়াল মাছ বলেছে।

নিকুঞ্জ ঃ কি অসভ্য ভাষা! আমায় কিছু বললে?

ভবদুলাল ঃ আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম—তা, বললে, নিকুঞ্জ কোন্‌টা? ঐ ছাগলা দাড়ি, না যার ডাবাহুঁকোর মতো মুখ?

নিকুঞ্জ ঃ আপনি কি বললেন?

ভবদুলাল ঃ আমি বললাম ডাবাহুঁকো। [চতুর্থ দৃশ্য]

পাছে কেউ সন্দেহ ক'রে ভুল বোঝে তাই ভবদুলাল নির্দিষ্ট করে জানিয়েছে কে কোন্‌টা অর্থাৎ কাকে সে কী মনে করে! তাই টিপ্পনি জুড়ে দিয়েছে, 'আরে দেখব আর কি?'

অন্যভাবেও ভবদুলালের রাগ প্রকাশ পেয়েছে। সর্দিকাশি হল্‌দিজ্বর যার হয়েছে তার না-ভুগে মরাই উচিত—এ সিদ্ধান্ত ভবদুলালের স্বরচিত সংগীতেই রয়েছে। ভবদুলালের নিজের লেখা দুটো গান নাটকে আছে—একটি হলো 'ও হরিরামের খুড়ো' এবং অপরটি সমাপ্তিসংগীত 'সংসার কটাহ তলে।' দুটোতেই ধ্বংস ও মৃত্যুর কথা এসেছে। ঈশান অবশ্য ব্যঙ্গ না ধরতে পেরে মন্তব্য করেছে, 'হ্যাঁ যেরকম গান—একটু জোরজার না করলে মরবে কেন?' [প্রথম দৃশ্য] এ কথায় ভবদুলাল অন্তত এটুকু 'মরাল সাপোর্ট' পেয়েছে যে একটু জোরাজুরি না করলে অবাঞ্ছিতের নিধন সম্ভব নয়। তাই "সংসার কটাহ তলে জ্বলেরে জ্বলে···। খেলে কাঁচা কচু জ্বলে চুলকানি, জ্বলে.রে জ্বলে।" [চতুর্থ দৃশ্য] ভবদুলাল সাম্যসিদ্ধান্ত সভায় কাঁচা কচু হিসাবেই দেখা দিয়েছে। নির্বিচারে চালিয়ে গেছে তার সংহারকার্য।

সভা বা আশ্রম—দুজায়গাতেই মধ্যমণিদের কথার সূত্র ধরে যেসব ভবদুলালীর তুলনা হাজির করা হয়েছে সেগুলোতে প্রায় সর্বদাই প্রহারের প্রসঙ্গ এসেছে এবং মনে হয় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই। তাই সেজোমামা গব্যঘৃতের কথা শুনে ছাতের সমান লাফ দিয়ে 'তেড়ে মারতে' আসে, পাটনায় শিক্ষকতাকালে ছাত্রদের 'পিটিয়ে' তার 'হাত টনটন, কাঁধে ব্যথা' হয় এবং দোষ না করেও শুধু নীরব থাকার অপরাধে বালক

ভবদ্দুলাল মাস্টারের 'মার' খায়। অর্থাৎ পরিস্থিতি অনুযায়ী নীরব থাকাটাও অপরাধ হতে পারে। জয়রামের মোষ 'গুঁতো মারলে' বোঝা যায় 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুখানি চ'। 'চ' শব্দটি প্রায় চাবুকের মতো 'কেন্দ্রগতং নির্বিশেষং চ'-কে গিয়ে আঘাত করে। এবং ভবদ্দুলালের মনোভাব আরো বেশি স্পষ্ট হয় যখন সে জানায় শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রম থেকে চলে আসার সময় সে একটি ছেলের কান মলে দিয়ে এসেছে। প্রয়োজন অনুসারে সে কান মলতেও পিছ-পা নয়।

অর্থাৎ ভবদ্দুলাল আগাগোড়াই সচেতন। সে জানে সে কি করতে চাইছে। 'রূপকার' গোষ্ঠী যখন নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিল, তারা ভবদ্দুলালকে অনেকটা 'আলাভোলা বাবাজির চেলা' হিসাবেই দেখেছিল। ভবদ্দুলাল যা বলে বা করে যেন না জেনেবুঝেই করে, ইচ্ছের বিরুদ্ধে ভণ্ডুল পাকিয়ে বসে। ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয়, বরং উল্টো। নাটকে ভবদ্দুলালই একমাত্র আত্মসচেতন চরিত্র। দাশু সম্পর্কে স্বয়ং সুকুমার রায় যে-সন্দেহ জাগিয়ে তোলেন ('দাশু সত্যি সত্যি পাগল, না কেবল মিচ্‌কেমি করে!'[১৬]) ভবদ্দুলালও প্রায় একই ধরণের মন্তব্য ডেকে আনে যেন। নিতান্ত হাবাগোবা হলে সত্যবাহনের কথায় ভবদ্দুলালের এমন প্রতিক্রিয়া হ'ত না:

সত্যবাহন: ব্যাপারটা কি জানেন, খণ্ড-সিদ্ধান্ত হচ্ছে যাকে বলে পৃথ-গ্‌দর্শন··· । এ নয়, ও নয়, তা নয়, সব আলগা, সব খণ্ড খণ্ড—এই সাধারণ ইতর-লোকে যেমন মনে করে।

ভবদ্দুলাল: [স্বগত] দেখলে! আমার দিকে তাকিয়ে বলছে সাধারণ ইতর লোক! [প্রথম দৃশ্য]

প্রখরভাবে সচেতন ও আত্মমর্যাদা-জ্ঞানসম্পন্ন না হলে ভবদ্দুলাল এ উপলব্ধিতে পৌঁছোতে পারত না। পরিস্থিতিতে কোনো ধরণের ধোঁয়াটে ভাব রাখতে চান নি বলেই নাট্যকার এ সংলাপটিকে স্বগতোক্তির অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আসলে সরলতা ও বোকামি ভবদ্দুলালের ভান। এবং এখানেও সুকুমারের কিছু ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের আরোপ ঘটেছে। পুণ্যলতার স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় এক 'স্টাইলিশ' মাসী সুকুমার ও তাঁর ভাইবোনদের কায়দাদুরস্ত করে তুলতে চাইলে তিনি তাঁকে কিভাবে জব্দ করেছিলেন। "শেষটায় দাদা বিদ্রোহ করল। অত্যন্ত বোকার মত মুখ করে, হাঁ করে কুঁজো হয়ে এসে বসল, দুই হাতে মুঠো করে কাঁটাচামচ খাড়া করে ধরে খটাখট শব্দে খেতে আরম্ভ করল; তাড়া খেয়ে অতি সন্তর্পণে কাঁটা চামচ ঠিক করে ধরতে গিয়ে 'কি যেন কি করে' হাত ফসকে চামচ কাঁটা এদিক ওদিক ছিটকে পড়ে গেল। সোজা হয়ে বসতে বলাতে, চেয়ারের দুই হাতলে ভর করে আস্তে আস্তে কষ্টে সৃষ্টে খাড়া হওয়া মাত্রই হঠাৎ 'কেমন করে যেন' পিছলে শরীরটা সড়াৎ করে টেবিলের নিচে চলে গেল আর চিবুকটা ঠকাস করে টেবিলে ঠুকে গেল।—মাসী যতই ধমক ধামক করে, দাদা ততই হাঁদার মত মুখ করে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়—"।[১৭] পুরো বর্ণনাটা চার্লি চ্যাপলিনকে মনে পড়িয়ে দেয়। "তিক্তবিরক্ত হয়ে মাসী আমাদের

স্টাইলিশ করবার চেষ্টা ছেড়ে দিল" ।[১৮]

ভবদুলালের প্রকৃতিগত মিল অবশ্য রয়েছে মোল্লা নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে, চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে নয়। চার্লি ঘটনা থেকে ক্রিয়া নিংড়ে আনেন, নাসিরুদ্দিন কথাকেই ক্রিয়া করে তোলেন। সুকুমারও কথাকে ক্রিয়ায় পরিণত করার কৌশল জানতেন। নাসিরুদ্দিনের গল্পের প্রথম ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে। বইটির নাম 'টেল্‌স অব দ্য খোজা'—অনুবাদ করেছিলেন মিসেস এউইং (Mrs Ewing)। এ বই সুকুমারের হাতে এসেছিল কিনা জানা নেই। তবে নাসিরুদ্দিনের অন্তত একটি গল্পের সঙ্গে সুকুমারের 'জীবনের হিসাব' কবিতার আশ্চর্য মিল রয়েছে। কবিতাটি 'সন্দেশ' পত্রিকায় বেরিয়েছিল ১৩২৫ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় (১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ)। এ গল্পটি প্রায় হুবহু পাওয়া যায় ইদ্রিশ শাহ পরিবেশিত মোল্লার গল্পে।[১৯] অবশ্য একটি ফরাসী লোককথাতেও এ গল্পের হদিশ মেলে।[২০] মোল্লার ভাণ্ডার থেকে তা ফরাসী লোককথায় আশ্রয় পেয়েছিল কিনা তা অবশ্য বলা যায় না।

মোল্লার আপাতনিরীহ গল্পগুলোও ভবদুলালের মতোই ব্যঙ্গমুখর। নানা-লোকে সে গল্পের নানা অর্থ করতে পারে তবে শেষ অর্থ খানি সরাসরি নির্ভুল-ভাবে লক্ষ্যে গিয়ে বেঁধে। নাসিরুদ্দিনের অন্তত দুটি গল্পের কথা এখানে উল্লেখ করা যায় যা অবিকল ভবদুলালী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে। নাটকে দেখা যায়, অনেক সময়েই তথাকথিত গম্ভীর বিষয় নিয়ে ঘোর আলোচনা চলার মধ্যে চলতি প্রসঙ্গকে আঁকড়ে ধরে ভবদুলাল কোনো পুরোনো অভিজ্ঞতা বিবরণ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পুরো ব্যাপারটার মাত্রা পাল্টে যায়, সমস্ত গম্ভীর পরিস্থিতি এক লহমায় হাস্যকর ও অকিঞ্চিৎকর বলে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। সেজোমামা-গব্যঘৃত প্রসঙ্গ, জয়রামের মোষ প্রভৃতি যে-কোনো মন্তব্য একথার প্রমাণ করে। ব্যাপারটা চরম পর্যায়ে পেঁছেছে ঈশানের 'সমীক্ষা সাধন' চলার সময়ে। 'সমীক্ষাচক্র' থেকে ঈশান জানায় কিভাবে সৃষ্টিতে ভেজাল পড়ছে। তখন

ভবদুলাল ঃ আপনি চলে আসার পর আমি দেখলাম সেই যে লোকটা ভেজাল দিয়েছে, সেই ভেজাল ক্রমাগত ঠেলে উপর দিকে উঠতে চাচ্ছে। উঠতে পারছে না আর গুমরে গুমরে কেঁপে উঠছে। আর কে যেন ফিস-ফিস করে বলছে—শেক দি বট্‌ল্‌, শেক দি বট্‌ল্‌। [দ্বিতীয় দৃশ্য]

ভবদুলাল শুধু এখানেই থেমে থাকে না, এর পরেই প্রসঙ্গ টেনে সে ছেলে-বেলার বেড়ালে (না কি, সজারু) কামড়ানোর গল্প ফেঁদে বসে। ক্ষুব্ধ ঈশান সমীক্ষাচক্র ছেড়ে চলে যেতে চাইলে—

ভবদুলাল ঃ আর একটু শুনে যান—গল্পটা ভারি মজার।

ঈশান ঃ দেখুন, এটা হাসবার-এবং গল্প করবার জায়গা নয়।

ভবদুলাল ঃ তাই নাকি ? তবে আপনি যে এতক্ষণ গল্প করছিলেন ?

ঈশান গল্প করছিল কিনা সে অন্য কথা, কিন্তু ভবদুলাল যে গল্প বলেই পরি-

বেশের গাম্ভীর্য গুঁড়িয়ে দিতে চায় সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। 'সমীক্ষাচক্র' কে গল্পবলার আসর বলে ধরে নেওয়ার মধ্যেই তার নষ্টামি বুদ্ধির পরিচয় মেলে। নাসিরুদ্দিনও প্রায় একইভাবে সরাইখানায় আত্মকথনের আসরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে-ছিলেন। গল্পটি পুরোটাই তুলে দেওয়ার যোগ্য ঃ

যুদ্ধ-ফেরৎ সৈনিকেরা সরাইখানায় বসে নিজেদের বীরত্বের গল্প বলছে। এক-জন বলল, 'তলোয়ার দিয়ে কত শত্রু যে ঘায়েল করেছি তার আর লেখাজোকা নেই।' অন্যরাও একই ধরণের বাহাদুরির গল্প চালিয়ে যাচ্ছে। নাসিরুদ্দিন তখন বললেন, 'আমিও একবার লড়াইতে তলোয়ারের এক কোপে ঘ্যাচাং করে এক ব্যাটার ঠ্যাং কেটে দিয়েছিলাম।' একজন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আরে তুমি ঠ্যাং কাটতে গেলে কেন? মুণ্ডুটা কাটলেই তো পারতে?' 'মুণ্ডু থাকলে তো কাটব', নাসিরুদ্দিনের জবাব, 'সেটা তো আগেই কেউ কেটে নিয়ে গিয়েছিল।'

নাসিরুদ্দিনের শেষ সংলাপটি নিমেষের মধ্যে সব কিছুর মাত্রা পাল্টে দেয়। যুদ্ধ, বীরত্ব প্রভৃতি জগৎসংসারের ব্যাপার-গুলি তুচ্ছ ও হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। নাসিরুদ্দিন শুধু যে সমবেত সৈনিকদের ব্যঙ্গ করছে তা নয়, যে-কোনো যুদ্ধের গাম্ভীর্যকেও অকিঞ্চিৎকর প্রমাণ করে দিচ্ছে। ভারতীয় যোগীর কাহিনীটিও একই ধরণের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে। 'ঈশ্বরের সৃষ্ট যত প্রাণী আছে সকলের সেবাই তার ধর্ম'—যোগীর এ উপলব্ধিকে সমর্থন করে নাসিরুদ্দিন জানায় কিভাবে ঈশ্বর-সৃষ্ট একটি মৎস্য একবার তার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। বিমুগ্ধ যোগীর আগ্রহে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা ক'রে নাসিরুদ্দিন জানালেন, 'একবার খাদ্যাভাবে প্রাণ যায় যায় অবস্থায় আমার বড়শীতে একটি মাছ ওঠে, আমি সেটি ভেজে খাই।'[২১] অহিংসা, জীবে দয়া, সমপ্রাণতা প্রভৃতি গালভরা বুলি—যা অহরহ প্রচারিত হয় কিন্তু কেউ মানে না—এককথায় যেন নস্যাৎ হয়ে গেল। ভবদুলালও প্রায় একই কায়দায় সভাসমিতি, আশ্রমবাসী সমীক্ষাচক্রের সভ্যদের মধ্যে বিধ্বংসী কাণ্ডকারখানা চালিয়ে গেছে অবলীলায়, অকুতোভয়ে। সাম্যসিদ্ধান্ত সভার নাজেহাল সদস্যরা অবশেষে ক্ষিপ্ত হয়েছে, ভবদুলালকে প্রায় শরীরী আক্রমণেও কুণ্ঠিত হয় নি তারা। তাদের সমবেত হামলায় চলচিত্তচঞ্চরির পাতাগুলো লুণ্ঠিত ও ছিন্ন হয়েছে। এ সব প্রতিবাদ ও প্রতিরোধেও ভবদুলাল কিন্তু অদম্যই থেকে গেছে। তার অকুণ্ঠিত ঘোষণা,

> ভবদুলাল ঃ খাতা ছিঁড়ে দিয়েছেন তা কি হয়েছে! আবার লিখব—চলচিত্ত-চঞ্চরি—লাল রঙের মলাট—চামড়া দিয়ে বাঁধানো। তার উপরে বড়-বড় করে সোনার জলে লেখা—চলচিত্তচঞ্চরি—পাবলিশড্ বাই ভবদুলাল। [চতুর্থ দৃশ্য]

খেয়াল রাখতে হবে, সুকুমার নিজের লেখাটির নামও দিয়েছেন—চলচিত্তচঞ্চরি! অর্থাৎ যেন জানিয়ে দিতে চান কেউ যদি তাঁর রচনার উপরও হামলা করে তাহলেও তিনি দমে যাবেন না। সত্যবাহন ঈশানের মতো আত্মসর্বস্ব অহংকারী মানুষ-গুলোকে ব্যঙ্গ করা থেকে কেউ তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারবে না।

বোধ করি, এটাই সুকুমার রয়ের চ্যালেঞ্জ।

১। বিচিত্রা ঃ শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল

২, ১৬। সুকুমার রায় সমগ্র রচনাবলী ২য় খণ্ড / এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী [অক্টোবর ১৯৭৫] পৃষ্ঠা ঃ ৩৮২

৩। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় অবশ্য স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, চলচিত্তচঞ্চরি লেখা হয়েছিল সুকুমার রায়ের বিলেত যাওয়ার আগে অর্থাৎ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আগে [দ্রঃ বৈতানিক, বৈশাখ ১৩৭২]। এ তথ্য সঠিক বলে মনে হয় না। কেননা ঐ লেখার অন্যত্রও স্মৃতিবিভ্রমের প্রমাণ আছে।

৪। 'Societies, learned and literary—associations of individuals with a common professional interest, intended to pormote learning. The Columbia Encyclopaedia, Vol 1.

৫, ৬। বঙ্কিম-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড/সাহিত্য সংসদ, ফাল্গুন ১৩৬৬/ পৃঃ ৮৪৫-৪৬

৭। 'It seems necessary that a society should be established, with the declared object of putting down societies. Its name should be Sabha Nibarani Sabha or a society for preventing the foundation of societies, and its members should find themselves to rush with arms and sticks into all places where members of any society meet and disperse them by force'. Shivanath Sastri : Men I have seen, 1919.

৮। দ্রষ্টব্য, সুশোভন সরকার—রবীন্দ্রনাথ : কিছু স্মৃতি, দেশ, ২৪ এপ্রিল ১৯৮২, পৃষ্টা ১১

৯, ১০, ১১, ১২, ১৫। সুকুমার রায় ঃ বর্ণমালা তত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬৩, পৃঃ ৬০—৬৩, ১৩

১৩। সুকুমার রায় ঃ The Burden of the Common Man, তদেব, পৃষ্ঠা ১১১—১২০

১৪, ১৭, ১৮। পুণ্যলতা চক্রবর্তী ঃ ছেলেবেলার দিনগুলি, নিউস্ক্রিপ্ট, আষাঢ় ১৩৮৮, পৃষ্ঠা ৫৫, ৮২

১৯। Idrics Shah : The Sufis/Doubleday & Company, New York 1964/p.58

২০। Henry pourrat : A Treasury of French Tales/George Allen & Unwin Ltd. London/p. 55-57 ; গল্পটির নাম The Tale of the Learned Man and the Boatman.

২১। সত্যজিৎ রায় ঃ মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প, সেরা সন্দেশ ঃ সম্পাদক, সত্যজিৎ রায়, পৌষ ১৩৮৮, পৃষ্ঠা ১৫০



সুকুমারের নাটক

পুলক চন্দ

দুষ্প্রাপ্য 'রামধন বধ'কে হিসেবের ভিতরে রাখলে সুকুমারের মোট নাটকের সংখ্যা আট। একটি ('হিংসুটে') স্কুলের মেয়েদের জন্য লেখা। আমরা সেটিকে বিবেচনার বাইরে রাখছি। 'ভাবুক সভা'র পরে সুকুমারের নাট্যকার জীবনে একটা সাময়িক যতি পড়েছিল। উচ্চশিক্ষার্থে তাঁর বিলেত যাত্রার পূর্বকাল পর্যন্ত ঐ সময়ই আমাদের আলোচনার প্রথম পর্ব।

প্রথম পর্ব

সুকুমারের সমস্ত নাটকের ভিতরে 'রামধন বধ', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' আর 'ঝালাপালা'তেই ছিল সম-সময়ের ছাপ সবচাইতে বেশি।

বঙ্গভঙ্গের আমলে, ১৯০৫-০৬ সালে লেখা 'রামধন বধ'-এর কাহিনী-কাঠামোটুকু ছাড়া বিশেষ কিছু আজ জানবার উপায় নেই। সাহেবিয়ানায় র‍্যাম্‌সডেন অর্থাৎ রামধন সাহেব-দেরও ছাড়িয়ে যায় আর দেশের মানুষ 'নেটিভ নিগার'। তাকে দেখলেই ছেলেরা চীৎকার ক'রে বলে 'বন্দেমাতরম'। শুনে রেগে আগুন তেলে বেগুন সে তেড়ে যায় তাদের দিকে। গালপাড়ে, পুলিশ ডাকে! ঐ নাটকেই ছিল 'দেশী পাগলার দলে'র গান:

আমরা দেশী পাগলার দল
দেশের জন্য ভেবে ভেবে হয়েছি পাগল
(যদিও) দেখতে খারাপ, টিকবে কম দামটা একটু বেশি
(তা হোক) তাতে দেশেরই মঙ্গল।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি বা শ্রদ্ধার অভাব না থাকলেও তার হুজুগ ও স্ববিরোধিতার হাস্যকর দিকগুলো সুকুমারের খোলা চোখের নজর এড়ায়নি। এর পরের নাটক 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল

রামায়ণের বহুল পরিচিত কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে সরস নাটক লিখতে ব'সে সুকুমার গোড়াতেই টান মেরে তাঁর প্রধান চরিত্রদের নামিয়ে এনেছেন মহাকাব্যের অতিলৌকিক জগৎ থেকে। মহাকাব্যিক পরিচয়টুকু বাদ দিলে তারা সবাই পোষাক-পরিচ্ছদ কথাবার্তায় নেহাৎই ছা-পোষা বাঙালী মধ্যবিত্ত।

নাটকে 'পুঁই শাক চচ্চড়ি আর কুমড়ো ছেঁচকি দিয়ে' 'চাট্টি' ভাত খায় রামের দূত। 'কৈলাস পাহাড়ের' নাম শুনে হনুমান বলে, 'কৈলেস ডাক্তার আবার কে?' যমদূতেরা এখানে চাকুরীগত-প্রাণ। যম গন্ধমাদনে চাপা পড়ে গেলে এই দূতেরাই 'তেরো আনা মাইনে বাকি' পড়ে থাকবার জন্য রীতিমতন মড়াকান্না জুড়ে বসে। গোটা নাটকটাতেই রয়েছে এমনিতর রংতামাশার অকৃপণ ছড়াছড়ি।

এর উপরে মজার সুরে মজার মজার গান। চরিত্রদের মুখে সুকুমার গুঁজে দিয়েছেন লৌকিক জগতের ভাষা। লঘু, অ-মহাকাব্যিক বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গান ও মুখের ভাষায় এন্তার মিশেল করেছেন সংস্কৃতের সঙ্গে অ-সংস্কৃত শব্দ। যেমন 'ঠ্যাঙের' সঙ্গে 'পদ্ম'। 'পিলে' 'অক্কা' 'তত কিম' এবং অবশেষে 'ইতি সমাপ্তেয়ং লক্ষ্মণের শক্তিশেলাভিধেয়স্য কাব্যস্য প্রথমো সর্গ:'—মহাকাব্যের রীতি অনুসরণে এই গালভরা সংস্কৃতে সমাপ্তি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে নকল গাম্ভীর্যের নাটকীয় পরিবেশটুকু পৌঁছে যায় লঘুভাব একেবারে তুঙ্গে। একই উদ্দেশ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দেরও পরিমিত ব্যবহার সুকুমার করেছেন।

বহিরঙ্গের এই সমস্ত উপকরণ নাটকের উপভোগ্যতার একটা কারণ কিন্তু প্রধান কারণ অবশ্যই নয়। মঞ্চে কাউকে বিভীষণ হিসেবে উপস্থিত ক'রে তার হাতে ব্যাগ ও ছাতা গুঁজে দিলে অনেকখানি কাজ হয়ে যায়। কিন্তু তারপরও অনাবিল হাস্য-রসের অপ্রতিরোধ্য প্রাথমিক আবেদনের অতিরিক্ত কিছু এ নাটকের কাছে সমসাময়িক মানুষের পাওনা ছিল।

লক্ষ্মণের শক্তিশেলের সুনির্দিষ্ট কোন রচনাকাল জানা যায় না। পুণ্যলতা চক্রবর্তীকে অনুসরণ ক'রে কল্যাণী কার্লেকার লিখেছেন "সম্ভবতঃ ১৯০৭ সাল"; লীলা মজুমদারও অনুমান করেছেন 'ঝালাপালা' ও 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' সুকুমারের "বছর কুড়ি বয়সে লেখা।" কিন্তু 'ঝালাপালা'র যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তাতে রচনাকাল হিসেবে ১৯১১-র উল্লেখ আছে বলে জানা যায়। নাটকের আভ্যন্তরীন কিছু সমসাময়িক তথ্য-ও এর সমর্থন করে। তাহলে 'লক্ষ্মণের শক্তিশেলই' বা কবেকার? 'ঝালাপালা'র কিছু আগে হওয়াই স্বাভাবিক, অন্তত ১৯১১-র পরে নয়। সীতা দেবী সে বছরই শান্তিনিকেতনে সুকুমারের মুখে ঐ নাটকের গান শুনেছিলেন।

মোটকথা ১৯০৭ থেকে ১৯১০ যে বছরেই লেখা হয়ে থাকুক না কেন, আমাদের কাছে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হ'ল : সেই সময়টা ছিল 'স্বদেশী' আন্দোলনের অন্তপর্বের অন্তর্গত।

বিশ শতকের প্রথম দশকে নব জাগ্রত দেশাত্মবোধের পরিপুষ্টিতে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক সাহিত্যের ভূমিকার কথা বিশেষ সুবিদিত। সাহিত্যিকরা তখন ইতিহাস কিংবা মহাকাব্যের পৃষ্ঠায় দেশপ্রেমের প্রেরণাই শুধু সংগ্রহ করেন নি, অতীতকে নিজের নিজের ক্ষমতা অনুসারে গড়ে-পিটেও নিচ্ছিলেন। অন্যদিকে সুকুমারের বাবা উপেন্দ্রকিশোর লিখেছিলেন ছোটদের জন্য গদ্যে পদ্যে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন যে, কোনো কিছু 'হিন্দু' হলেই ব্রাহ্মসমাজ তার রসগ্রহণে বিমুখ নয়। "রামায়ণ মহাভারতের ধর্মীয় সত্যকে ব্যাখ্যা ক'রে সমাজের লেখক লেখিকারা অনেক বই লিখেছেন। ইউ, কে, রায়ের ছোটদের জন্য লেখা রামায়ণ-মহাভারতের গল্পগুলো তার দৃষ্টান্ত" (History of the Brahmo Samaj, Vol. 2. p. 278)। অর্থাৎ মহাকাব্য নিয়ে লঘুতা সৃষ্টি করার সময় সেটা ছিল না। ফলে সুকুমারকে যথেষ্ট সমালোচনারও মুখোমুখি হ'তে হয়েছিল—"ঠাকুর দেবতাদের নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করা উচিত নয়" ('সুকুমার রায় / লীলা মজুমদার)। তবে সুকুমার কাদের নিয়ে আসলে 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'-এ 'ঠাট্টা তামাশা' করেছেন ? রাম-লক্ষ্মণ-বিভীষণ-ই কি প্রধান লক্ষ্য ? এ বিষয়ে আন্দাজ করতে হলেও আমাদের ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে হবে।

সমসময়ের ঘটনাবলী সম্পর্কে, বলাবাহুল্য সুকুমার কোনদিন উদাসীন ছিলেন না। সেই বিবরণ আছে পুণ্যলতা চক্রবর্তীর 'ছেলেবেলার দিনগুলি'তে। অল্প বয়সে কংগ্রেসের কোন এক অনুষ্ঠানে গানের দলেও তাঁর উপস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

অন্যদিকে 'স্বদেশী' আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মত ও পথ নিয়ে নরম ও চরম দলের ভিতরে কোন্দল ক্রমশঃ জোরাল হয়ে উঠেছিল। 'বয়কটে'র প্রশ্নেই মূলতঃ দানা-বেঁধে উঠেছিল বিরোধ। ১৯০৭-এর ডিসেম্বরে সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশন চরমপন্থীরা পণ্ড করল। বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হ'ল। কার্যক্ষেত্রে দেশের রাজনীতিতে দেখা গেল চরমপন্থীদের প্রাধান্য।

নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলায় ইংরেজ সরকারও একে একে 'রাজদ্রোহমূলক-সভা আইন' 'প্রেস আইন' 'বিস্ফোরক দ্রব্য আইন' ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে নামল। ১৯০৭ এর ১লা নভেম্বর 'Seditious Meetings Act' জারী হবার পরের দিন অরবিন্দ ঘোষ 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় লিখলেন 'How to Meet the Inevitable Repression'। তিনি বললেন, 'বয়কটে'র সাফল্যের প্রতিক্রিয়ায় ইংলণ্ডের রপ্তানীর পরিমাণ যখন কমতে লাগল তখনই তারা আন্দোলনের কোমর ভেঙ্গে দেবার সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করল ; "প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রতিপক্ষের চরম হৃদয়-হীন শত্রুতামূলক কার্যকলাপের মুখে টিকে থেকে জয়লাভ করায় মতন শক্তি দেশের

অবশ্যই চাই"। কার্যত মাত্র কয়েক মাসের সরকারী চণ্ডনীতির সাঁড়াসী প্রয়োগ অত্যন্ত সহজেই আন্দোলনকে ছত্রখান ক'রে দিল। 'স্বদেশীযজ্ঞে'র অন্যতম পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ যুবকদের উপদেশ দিলেন আত্মসমর্পণ করতে। এ প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মন্তব্য: "...উত্তেজনার বশে দুই বৎসর ধরিয়া ইংরেজের অনুগ্রহ লইব না, ইংরেজদের শাসনযন্ত্র অচল করিয়া দিব বলিয়া লাফালাফি করিয়া আসিতেছি ; এবং ইংরেজরা যখন সেই লাফালাফিতে ধৈর্যভ্রষ্ট হইয়া লগুড় তুলিয়া আমাদের গলা চাপিয়া ধরিয়াছেন তখন আমাদের সেই অস্বাভাবিক আস্ফালনের নিষ্ফলতা দর্শনে ব্যথিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—ওপথে চলিলে হইবে না..." (প্রবাসী / আশ্বিন ১৩১৪)।

একদিকে স্বদেশীদের 'অস্বাভাবিক আস্ফালন' ও 'নিস্ফলতা' অপরদিকে 'ধৈর্যভ্রষ্ট' ইংরেজের হাতের 'লগুড়'—ইত্যাদি, সব মিলিয়ে পরিস্থিতির একটা তিক্ত কৌতুকময় দিক কি সুকুমারের চোখে ধরা পড়েছিল? শক্তিশেলের সঙ্গে দমন-মূলক আইন বা অন্যকিছুর আপাত-সাদৃশ্য সম্ভবত প্রথমে তাঁর মনে এসেছিল। তারপরই সম্ভবত জেগেছিল সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা ব্যঙ্গাত্মক ভাষ্য তৈরীর বাসনা।

রামায়ণের সুপরিচিত শ্লোক.'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'—স্বদেশী-যুগে দেশাত্মবোধের প্রায় বীজমন্ত্র হয়ে উঠেছিল। এরকম একটা সময়ে রামকে স্বদেশী এবং রাবণকে বিদেশী কল্পনা করা ছিল সহজ ও স্বাভাবিক। উপস্থিত, এ-বিষয়ে নাটক থেকে দুটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা দাখিল করব।

বিশল্যকরণী প্রয়োগের ফলে লক্ষ্মণ চেতনা লাভ করল। 'সবাই' বলে উঠল, '...কি সাফাই ওষুধ রে!' হনুমান বলল: "হাজার হোক স্বদেশী ওষুধ ত!" সকলে আশ্বস্ত হ'ল ; 'তাই বল। স্বদেশী না হলে কী এমন হয়?' 'স্বদেশী'র প্রতি রামের দলবলের এই অনুরাগ, গভীর বিশ্বাস তাদের চরিত্রের রাজনৈতিক দিক সম্পর্কে সংশয়ের কোন অবকাশ রাখে নি।

রাম 'স্বদেশী' হলে রাবণ স্বভাবতই বিদেশী অর্থাৎ ইংরেজপক্ষ: সহজ এই সমীকরণের উপরেই অবশ্য বিষয়টা সুকুমার ছেড়ে দেন নি, দু-একটা সুক্ষ্ম ইঙ্গিত তিনি নাটকের ভিতর রেখেছেন যেমন, রাবণের দম্ভোক্তির কথাই ধরা যাক:

আমি পালোয়ান স্যাণ্ডো সমান
তুই ব্যাটা তার জানিস কি?
কোথায় লাগে বা কুরোপাট্‌কিন্‌
কোথায় রোজেদ্‌ভেনিস্কি।

প্রথমত, নামগুলো সব বিদেশী। দ্বিতীয়ত, বাহুবলের দম্ভ প্রকাশের জন্য পালোয়ান 'স্যাণ্ডো'র সঙ্গে শুধু নয় 'কুরোপাটকিন' ও 'রোজেদ্‌ভেনিস্কি'র সঙ্গেও রাবণ নিজের তুলনা করছে। এরা কেউই 'খেলার ছলে' 'যখন তখন' 'হাতি লোফেন' এমন কোন কাল্পনিক 'ষষ্ঠিচরণ' নন। দুজনেই ইতিহাসের মানুষ। পৃথিবীকে

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের ভিতরে নতুন ভাবে ভাগবাঁটোয়ারা করে নেবার যুদ্ধগুলোর অন্যতম প্রথম হল ১৯০৫-এর রুশ-জাপ যুদ্ধ। সেই যুদ্ধেই মাঞ্চুরিয়ায় রুশ সেনা-বাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন তৎকালীন যুদ্ধমন্ত্রী অ্যালেক্সি কুরোপাটকিন। এ্যাডমিরাল রোজেদ্স্তভেন্স্কি (Rozhdest Venski) ছিলেন বাল্টিক নৌবহরের কম্যান্ডার। সুতরাং কুরোপাটকিন ও রোজেদভেনিস্কির নামে তাল ঠোকাতে ও গলাবাজিতে রাবণের সাম্রাজ্যবাদী হুঙ্কার ধরা পড়ল। সঙ্গত কারণেই ইংরেজ সরকার ও রাবণকে তো বটেই, রাবণের হাতের 'লগুড়' বা শক্তিশেলকেও ক্রমশঃ 'Seditious Meetings Act,' 'Press Act', 'Indian Criminal Law Amendment Act' ইত্যাদি থেকে অভিন্ন মনে হতে পারে। তা ছাড়া, অর্থনৈতিক লুঠতরাজ সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির সামগ্রিক পরিচয়ের এমন একটি অপরিহার্য দিক যে রাবণ কর্তৃক লক্ষ্মণের 'পকেট লুণ্ঠণে'র ঘটনাটিকেও আর অবিমিশ্র মজা হিসেবে দেখে যেতে সাহস হয় না।

'রাবণ বুড়ো'র কথায় আর কাজে কোন বিরোধ নেই। দম্ভ করে যেমন, সেই মতন কাজও করে। 'ওরে পাষণ্ড, তোর ও মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিব'—সুগ্রীবকে একথা শুধু বলা নয়, কার্যক্ষেত্রে তার মাথাও সে ফাটায়! পাশাপাশি 'স্বদেশী' সম্পর্কে ইংরেজ রাজপুরুষদের একাংশের একটি হুমকি "...We shall try to break the back of it (swadeshi) in every possible way, we shall put the staying power of the Bengalee to the severest test before we allow them to develop their new nationalism" এবং অরবিন্দর মন্তব্য ঃ "Thus spoke they and what happened since has certainly been singularly confirmatory of their frank avowal."

রাবণ সম্পর্কে রাম-শিবিরের প্রতিক্রিয়া গুলোও চমৎকার। প্রথমে, দল-নেতার স্বপ্নের বিবরণে সবার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীর 'জান' স্বভাবতই 'খুব কড়া' স্বপ্নে তা যাবার মতন নয়। সুগ্রীব, বিভীষণ, জাম্বুবান সকলেই রাবণের সঙ্গে মোলাকাতের সম্ভাবনার কথা ভেবে কেঁপে অস্থির। 'রাবণ আসছে' শুনে সুগ্রীব ও বিভীষণ আঁতকে ওঠে 'অ্যাঁ-কি ?' এবং গান জোড়ে ঃ

যদি রাবণের ঘুঁষি লাগে গায়
তবে তুই মরে যাবি—

নাটকে রাবণের হাতের অস্ত্র 'লগুড়' ও 'শক্তিশেল'। স্মরণ করা যেতে পারে দমনমূলক আইনকে 'লগুড়ে'র সঙ্গে তুলনা করবার চল সে সময় ছিল। স্বদেশী 'লাফালাফি' ও 'ধৈর্যভ্রষ্ট' ইংরেজ প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের পূর্বোক্ত মন্তব্যে তার প্রমাণ মিলেছে।

যাই হোক, বিভীষণ জরুরী কাজের অছিলায় এক সময় রণস্থল থেকে পালাল। সুগ্রীব অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামল রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে। কিন্তু সংক্ষিপ্ত এক সংগ্রামের পরে রাবণের অস্ত্রের দাপটের কথা না মেনে তার উপায় থাকল না ঃ 'ওরে বাবা ইকী

লাঠি/গেল বুঝি মাথা ফাটি'। তারপর সুগ্রীবের মুখে শোনা গেল সর্বকালের পৃষ্ঠপ্রদর্শকারীদের জীবনদর্শনের মর্মবাণী। রাবণ ও তার পলায়ণকারী প্রতিপক্ষ সুগ্রীবকে রাজনৈতিক মঞ্চের উপযুক্ত ভাষায় ধিক্কার জানিয়েছে ঃ "ছি ছি ছি—এত গর্ব করে, এত আস্ফালন ক'রে, শেষটায় চম্পট দিলি ? শেম্ ! শেম্ !" 'স্বদেশী আন্দোলনও প্রচুর 'আস্ফালন' গর্জনের সঙ্গে শুরু হলেও শেষ হয়েছিল কাৎরাণীর শব্দে। 'Why did the movement begin with a bang and end with a whimper ?" (The Extremist Challenge—P.139, Amalesh Tripathi)—উত্তর যাই হোক, আধুনিক গবেষকের এই প্রশ্নেই আমরা প্রয়োজনীয় তথ্যের সমর্থন পাই। এর পর 'লক্ষ্মণের শক্তিশেলে'র প্রচ্ছন্ন সমসাময়িকতার প্রসঙ্গ আর শিথিল অনুমানের বিষয় সম্ভবত থাকে না।

'নন্ সেন্স ক্লাবের' অভিনয়ের জন্য হাসির নাটকটি লিখেছিলেন সুকুমার। কোন রাজনৈতিক প্রয়োজনের শাসন বা উদ্দেশ্যপূরণের অভিপ্রায়ে নয়। মহাকাব্যের কাহিনী নিয়ে রঙ্গতামাশার আড়ালে নিজেরই খেয়ালে তিনি তুলে ধরেছেন সাময়িক রাজনৈতিক চালচিত্রের ব্যঙ্গরূপ। সকৌতুকে—কারণ কৌতুক তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর সমালোচনার নিজস্ব ভাষা।

পটভূমি অপরিবর্তিত থাকলেও পরের নাটকেই সুকুমার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের উচ্চভূমি ও তার কুশীলবদের ছেড়ে সরাসরি নেমে এলেন অতি সাধারণ মানুষজনের ভিড়ে, তাঁর নিজের অর্থাৎ মধ্যবিত্তশ্রেণীর সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে।

ঝালাপালা

প্রথমেই, 'পালা' কথাটির সরস ও অর্থচোরা প্রয়োগ দর্শকপাঠকের মনে নতুন কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা জাগায়। 'পালা' হলেও এ পালার জাত যে আলাদা তা আঁচ করা যায়।

যাত্রার রেওয়াজ অনুসারে প্রথমেই মঞ্চে হাজির হয় 'জুড়ি'র দল। তাদের প্রথম গানের প্রথম কলি 'সখের প্রাণ গড়ের মাঠ'-এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পালার প্রধান যে কৌতুকের সুর তা বাঁধা হয়ে যায়।

আপাতভাবে 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' অথবা 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য' নিয়ে গল্প। নাটকের শেষে কেদার সেটা বেশ বড় গলা করেই ঘোষণা করে দিয়েছে। চরিত্রগুলো সবই এক-নয়। অনেক ক্ষেত্রে চেষ্টাকৃত। সুকুমারের মৃত্যুর পরে 'সন্দেশে' ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হবার সময়ে কেষ্টার পাঠ (প্রথম দৃশ্য) ছাপা হয়েছিল ইংরেজীতে। পড়ার সময় সে একাধিকবার 'I go up you go down' পড়লেও প্রশ্ন করার সময় কিন্তু বলছে 'I go up we go down মানে কি ?' (পরবর্তীকালে গ্রন্থাবলীতে প্রথমত, বাংলা হরফে ছাপা হয়েছে, দ্বিতীয়ত, we এর বদলে 'ইউ' ছাপা হয়েছে)। বোঝা যাচ্ছে পণ্ডিত এর পরে 'গুদোম ঘরে' 'উই পোকা' ধরার মজাদার ব্যাখ্যা যাতে

সহজে দিতে পারে, সেই জন্যেই এই আয়োজন।

এ নাটকের রচনাকাল ১৯১১। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ও 'ঝালাপালা' একই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের অন্তর্গত 'সিডিশন'-এর ফাঁদে ফেঁসে যাবার ভয়ে সন্ত্রস্ত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'দের আতঙ্কের কৌতুকপূর্ণ ছবি সুকুমার এঁকেছেন। কেবলচাঁদ ওস্তাদের স্বদেশসংগীত: 'হায়রে সোনার ভারত'-এর শেষাংশে সে যখন আহ্বান জানাল 'জাগো জাগো উঠে পড়ে লাগো / দেশোদ্ধারে ব্রতী হও হে।' ওমনি সকলে হাঁ হাঁ করে উঠল:

দুলি। এই সিডিশাস।

পণ্ডিত। অ্যাঁ, কি বললে? রাজদ্রোহ সূচক? অ্যাঁ?

খেঁটুরাম। তবে রে! সিডিশাস গান কচ্ছিস কেন রে!

দুলি। জানিস, আমার মামাতো ভাই গবর্মেণ্টের চাকরি করে।

হিন্দু পুনরুত্থানবাদের প্রতি সুস্পষ্ট কটাক্ষ 'ঝালাপালা'র আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। 'ন্যায়শাস্ত্র নিয়ে পণ্ডিতের মুহুর্মুহু আস্ফালনের ভিতরে আপাতকৌতুকের অতিরিক্ত কিছু অর্থ সহজেই পাওয়া যাবে। কিংবা কেবলচাঁদের স্বদেশী সংগীতকেও ঠেকবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শাস্ত্রবচন বা শাস্ত্রের অনুমোদনের সমারোহপূর্ণ উল্লেখ, এমনকি তার অপব্যাখ্যার সাহায্যেও যে-কোন বক্তব্যের ভিতর অভ্রান্ততার ভঙ্গি ও গাম্ভীর্য সঞ্চার করবার ঝোঁক হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের একাংশের মধ্যে প্রকট ছিল। আমাদের পণ্ডিত যেন তাদেরই অতিক্ষুদ্র এক কৌতুক-সংস্করণ। নাটকে অন্তত বারোবার পণ্ডিত বিভিন্ন উপলক্ষ্যে 'ন্যায়-শাস্ত্রে'র কথা তুলেছে। কেবলচাঁদের প্রথম গানে 'কালের ফেরে' পড়া 'মনু'-'যাজ্ঞবল্ক্য'-র উত্তরপুরুষদের বিলাপ: 'আহা পড়িয়া কালের ফেরে মোরা কি হনুরে?' কী তারা হয়েছে, 'হনু' শব্দের ইঙ্গিতময় প্রয়োগে সেটা অস্পষ্ট থাকে নি।

'মস্ত গায়ক' কেবলচাঁদ স্বরচিত দ্বিতীয় সংগীতে 'দেশোদ্ধারে ব্রতী' হবার জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে থামল। তবে তার গানের ভাব-গর্ভ প্রথম পঙক্তি শুরু হতে না হতেই একবার 'উচ্চহাস্য' শোনা গিয়েছিল। বাধা পেয়ে কেবলচাঁদ অভিমান করেছিল: 'দেখলেন মশায়! গম্ভীর বিষয়, এর মধ্যে কী কাণ্ডটা না কল্লে।' নিজের হাসিটুকু কেষ্টা ও ঘটিকে দিয়ে হাসালেও স্বাধীন ও বহুমাত্রিক চরিত্র হিসেবে সুকুমার তাদের গড়ে তুলতে পারেন নি। এই ব্যর্থতার শিক্ষা 'চলচিত্তচঞ্চরির'র অসামান্য ভবদুলালের সৃষ্টিতে পরে কোনভাবেই তাঁকে সাহায্য করে নি তা হলফ করে নিশ্চয় বলা যায় না।

'মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক' শ্রেণীর স্বভাবগত অসংগতিতে চিরকাল সুকুমারের প্রবল কৌতুকবোধ। তার অজস্র নিদর্শন 'আবোল-তাবোলের'-র বিভিন্ন কবিতায় ও তাঁর প্রায় প্রতিটি নাটকে গল্প ছড়িয়ে রয়েছে। 'ঝালাপালা'তেও তা আছে; এতখানিই আছে যে তার পাশে সাদামাটা মূল কাহিনী-অংশকে কখনো কখনো উপলক্ষ্য মাত্র মনে হয়!

প্রথমে নাটকের সেই ছোট্ট অথচ অনবদ্য মধ্যবিত্ত বৈঠকি আলাপে 'গরম' শব্দটির খেই ধরে জমিদার বললে 'এসব বোধ হয় সেই ধূমকেতুর জন্যে।' অতঃপর শোনা গেল 'ধূমকেতুর ন্যাজ' 'ও'রই [পণ্ডিতের] ন্যাজ হয়ত' এবং ফলাফল হিসেবে 'ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প' 'প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, বেরিবেরি, পানের পোকা, এলাহাবাদ একজিবিশান…' ইত্যাদি। উল্লেখ করা যায়, 'ঝালাপালা' লেখার কিছুকাল আগেই হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে ভীষণ সোরগোল উঠেছিল ; গুজবের অন্ত ছিল না। প্রবাসী (চৈত্র, ১৩১৬) লিখেছিল ঃ "কয়েকমাস হইতে সংবাদপত্রে ধূমকেতুর উৎপাত সম্বন্ধে নানাবিধ জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। গণনায় নাকি আসিতেছে তাহার সহিত বসুন্ধরার সংঘর্ষণ হইবে, তাহার বিষাক্ত বাষ্পে প্রাণীকুল নির্মূল হইবে—"। সুকুমার তাঁর সমসময়ের গুজবপ্রিয় কুসংস্কারমগ্ন, আত্মম্ভরি মধ্যবিত্তের অসংলগ্ন আলাপচারিতার যে জগৎ সুনিপুণ কৌতুকভাষ্যের মাধ্যমে 'ঝালাপালা'য় এ'কেছিলেন সেটা তখন যতখানি সত্য ছিল, আজও ততখানিই আছে। কিন্তু সেটুকুই সব নয়, মধ্যবিত্ত জীবন-যাপনের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ অসংগতি সুকুমার এখানে উদ্ঘাটন করেছেন।

নাটকের 'পরগাছা' প্রায় সবকটি চরিত্র নানা সময়ে নানা ভাবে দাবি জানিয়েছে, তারা 'ভদ্রলোক'। অপরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙার ব্যাপারে অথবা তোষামুদি খোশামুদিতে অবশ্য এ ওকে টেক্কা দিয়ে যায়। কিন্তু ভদ্রলোক হিসেবে পাওয়া সম্মান সম্পর্কে তাদের হুঁশ ষোল আনা। আত্মসম্মানের নাড়ি টনটনে ঃ

১. পণ্ডিত। যা! বাবুদের হটিয়ে দে।…
   দুলি। সিকী! আমাদের গাঁয়ের লোক! হবুগ্রামের অপমান!
২. কেবল। এইও, ইস্টুপিট বেয়াদব, ভদ্রলোকের গায়ে হাত তুলিস!
৩. দুলি। ভদ্রলোককে এমনি ক'রে ইনসাল্ট!
৪. খেঁটু। কী, ভদ্দরলোকের ঘাড়ে ধাক্কা!
   দুলি। চাকর দিয়ে ইনসাল্ট!

ভদ্রলোকী সম্মান 'চাকর দিয়ে' এই 'ইনসাল্টে' ভীষণভাবে আহত। নাটকের বর্ণনা অনুযায়ী খেঁটু আর দুলির অতঃপর 'ডিগনিফায়েড একজিট'। 'ভদ্রলোক' হবার বিড়ম্বনা কম নয়। 'ঘাড় ধাক্কা' খাওয়া সত্ত্বেও 'মর্য্যাদাপূর্ণ প্রস্থানে'র ঠাট বজায় রাখতেই হয়। ভদ্রলোকী অস্তিত্বের অনেকখানিই যে ভঙ্গি-সর্বস্ব সেটা বুঝিয়ে দিতে সুকুমার একটুও ফাঁক রাখেন নি।

'ভদ্রলোক' প্রসঙ্গ নাটকে যে আদপেই আকস্মিক বা প্রক্ষিপ্ত নয় 'জুড়ির' গানের দিকে তাকালে তার সুনিশ্চিত প্রমাণ মেলে। জুড়িরা এখানে ভদ্রলোকশ্রেণীর বিবেকবান অংশের প্রতিনিধি। শুরুতে পরান্নভোজী 'নিষ্কর্মা'দের জন্য তাদের কোন সহানুভূতি নেই বরং জমিদারের পাশে দাঁড়ানো নিজেদের নৈতিক কর্তব্য বলে তারা বিবেচনা করেছে। স্বভাবতই, জমিদারের 'অনুরক্ত ভক্ত' হিসেবে নিজেদের ঘোষণা করতে অথবা 'চণ্ডী-বাবুর মস্তকে পুষ্প চন্দন' বৃষ্টি'র কথা

জানাতে জুড়িদের কোন দ্বিধা হয় নি। ক্রমশঃ তাদের সুর পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথমে 'খোশামুদে'দের আত্মমর্যাদাহীনতার জন্য তারা অস্বস্তি-বোধ করছে : 'কচ্ছে সবাই যাচ্ছেতাই/চাকর ব্যাটা দিচ্ছে গালি হাঁ করে সব খাচ্ছে তাই।' এরপর তৃতীয় দৃশ্যের শেষে চতুর্থ ও শেষবারের মতন মঞ্চে এসে খোলাখুলি ভাবে জমিদারকে অভিসম্পাত দিয়ে গান ধরল : 'ওরে ও চণ্ডীচরণ/তোমার কি নাই রে মরণ।'

জুড়িরা খোলাখুলি ভাবে চলে গেল 'খোশামুদে'দের পক্ষে। 'ভণ্ড' 'খোশামুদে'রা হাজার হোক 'ভদ্রলোক'। 'বড়লোকে'র কানমলা খাওয়ার ও 'ছোটলোক'কে কানমলা দেবার মৌলিক অধিকার তাদের আছে। সুতরাং জমিদার নিজের হাতে কানমুলে দিলে জুড়িদের অন্তত আপত্তি হয়ত হত না। হয়ত সাধুবাদই জানাত। 'চাকর ডেকে' 'কানমলানো'র মতন ভয়ঙ্কর বেনিয়ম বাড়াবাড়ি বরদাস্ত করা কঠিন। 'খোশামুদে'দের প্রতি প্রীতি নয়, শ্রেণীসম্ভ্রম লুণ্ঠিত হওয়ার প্রতিবাদে জুড়িরা শেষ পর্যন্ত জমিদারকে পরিত্যাগ করল।

ভাবুকসভা

আগাগোড়া পদ্যে লেখা সুকুমারের পরবর্তী নাটক-জাতীয় রচনা 'ভাবুকসভা'। নাটক 'জাতীয়,' কারণ একে নির্দ্বিধায় নাটক বলা যায় না। এতে কোন নাট্য-দ্বন্দ্ব নেই, ঘটনার পারম্পর্যপূর্ণ বিকাশ নেই—শুধু এক শ্রেণীর মানুষের অসংগত ভাবের আতিশয্যই প্রধান উপজীব্য।

প্রকৃত রচনাকাল ১৯১১-১২ হলেও 'ভাবুকসভা'র প্রথম প্রকাশ 'প্রবাসী'তে ১৩২১ (১৯১৪)-এর আশ্বিনে। সঙ্গে সুকুমারের নিজের আঁকা ছবি। ছবিতে, আকাশের আধখানা বাঁকা চাঁদ। নদীর উপরে এসে পড়েছে গাছের সরু ডাল। সেই 'ভাবের গাছ'-এর ন্যাড়া ডালের ডগায় বসে 'ভাবুক'। তার মাথার চুল সামান্য এলোমেলো। চোখে চশমা, পরনে ধুতিপাঞ্জাবী। গায়ে প্যাঁচানো 'র‍্যাপার' বা চাদর। চাদরের একদিক ডান কাঁধের ওপর হাওয়ায় উড়ছে। অন্যপ্রান্ত প্রায় জল ছুঁই ছুঁই। ভাবুকের বাঁ হাতে একটা খোলা খাতা বা বই। মলাটে লেখা চাঁদ। ডান হাতে ধরা পেন্সিল চিবুকে ঠেকানো। 'ভাবের ঝোঁকে' ভাবুক 'এক্কেবারে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত' তাতে সন্দেহ নেই।

'হ য ব র ল' কিংবা 'আবোলতাবোলে'র ছবি বাদ গেলে অর্ধেকটাই মাটি। লেখায় যা বলা হল তারও অতিরিক্ত তিনি কখনো কখনো ফুটিয়ে তুলেছেন ছবিতে। সেই বিচারে 'আবোলতাবোলে'র 'খিচুড়ি' বা 'চোরধরা'র ছবিগুলির সঙ্গে সমান গুরুত্বে 'ভাবুকসভা'র অপরিচিত এই ছবিটিও স্মরণ-যোগ্য।

সুকুমারের ভাবুকদাদা ও ভক্তবৃন্দ যে কবি-শ্রেণীভুক্ত তাতে সন্দেহ নেই। নাটকে সাক্ষ্য আছে ; দুই নম্বর ভক্ত বলছে, 'দিন নাই রাত নাই লিখে হাত ক্ষয়—'। অর্থাৎ ভাবুক কবি তো বটেই, বহুপ্রসূ কবি। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও সেকালে অসংখ্য

কবিতা লিখতেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবিরা। বলা বাহুল্য, তখনকার এক অতিভাবুক নব্য কবিগোষ্ঠীর অবিসম্বাদী গুরু ছিলের রবীন্দ্রনাথ। তাই শিষ্য-পরিবেষ্টিত ভাবুকদাদা ও কবি-শিষ্য পরিবৃত রবীন্দ্রনাথের ভিতরে আপাত-সাদৃশ্য নজরে পড়ে।

ভাবুক দাদার ছন্দ বিষয়ক 'নব ঢেঁকিতত্ত্ব'-কেও 'মম চিত্তে নৃত্যে'র পরিহাস রূপ মনে হয়। ১৯১০-এ প্রকাশিত 'রাজা' নাটকের ঐ গানটিতে আছে ঃ 'মম চিত্তে নিতি নৃত্তে কে যে নাচে···তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে/তাতা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ'। অন্যদিকে ভাবুকের 'চিত্তে'ও 'ভাবের ঢেঁকি পাগল পারা আপনি নাচে নাচেরে'। রবীন্দ্রনাথের গানে 'হাসি কান্না হীরাপান্না দোলে ভালে/কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে/নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে···'। ভাবুকের ভাবের ঢেঁকির ছন্দময় নৃত্যও অনাদি অনন্ত কাল জুড়ে অব্যাহত, 'ছন্দে ওঠে ছন্দে নামে নিত্য ধ্বনি চিত্ত ধামে/গভীর সুরে বাজে রে/নাচে ঢেঁকি তালে তালে যুগে যুগে কালে কালে/বিশ্ব নাচে সাথেরে।'

অবশ্য গুরুর চাইতে হয়ত ভক্তদের ভাবের আতিশয্যই সুকুমারের কাছে বেশি কৌতুকজনক ঠেকে থাকবে। এবং রবীন্দ্রনাথের অনুসারী ভক্ত কবিদের ভিতরে দেবেন্দ্রনাথ সেন, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ থাকলেও, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই নিঃসন্দেহে প্রধান। ভাবুক হিসাবেও তাঁর পরিচয় ছিল সর্ব-জনবিদিত। 'প্রবাসী' ১৯১০-এর এক সংখ্যায় 'নব্য কবিতা' নামে প্রবন্ধে তিনি পরিষ্কার ভাষায় ভাবের জয়গান করেছিলেন এবং উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের। উল্লিখিত ছবিতে 'ভাবুককে দেখে তাই প্রথমে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথা মনে আসা অসম্ভব নয়। নাটকে ভাবুকের ছন্দোন্মাদনাতেও পরোক্ষ সমর্থনের সন্ধান পাওয়া যায়! একের পর এক ভাবের ধাক্কায় 'শৃঙ্খল টুটিয়া' ভাবুকের 'উদ্দাম চিত্ত' 'আঁকু পাঁকু ছন্দে' 'নৃত্য'রত। 'নাচে ল্যাগ ব্যাগ তাণ্ডব তালে। ঝলক জ্যোতি জ্বলিছে ভালে।' অর্থের চাইতে ছন্দের তরল ঝঙ্কারের প্রতি 'ছন্দের যাদুকর' 'ছন্দসরস্বতী' সত্যেন্দ্রনাথের আকর্ষণ ছিল বেশি। হয়ত সম্পূর্ণই কাকতালীয়, তবু উল্লেখ করা যেতে পারে রুসো অবলম্বনে সত্যেন্দ্রনাথের রচনা 'ভাবুকের নিবেদন' প্রবাসীতে বের হবার (১৯১১) কাছাকাছি কোন এক সময়ে সুকুমার তৈরী করেছিলেন 'ভাবুক সভা'র প্রথম খসড়া।

সুকুমার ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য একান্ত অনুরাগী, তবে তিনি অন্ধ অনুসারী নন। প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখের মাত্রাছাড়া রবীন্দ্রভক্তি ছিল তাঁর অপছন্দের। এঁদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক যথেষ্টই ছিল। 'মানডে ক্লাব' প্রসঙ্গে অন্তত একবার 'হিজিবিজি খাতায়' সত্যেন্দ্রনাথের নাম আছে। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সুকুমার সম্পাদিত 'সন্দেশ' পত্রিকার শ্রদ্ধা নিবেদনেও প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর সাহিত্যকৃতির প্রতি সুকুমারের সশ্রদ্ধ মনোভাব। কিন্তু সুকুমারের তির্যক সকৌতুক দৃষ্টিতে কোন হাস্যকর ভারসাম্যহীনতা বা অসংগতি

ধরা পড়লে তার রেহাই নেই। রবীন্দ্রনাথও সুকুমারের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটুকু ভালোমতন জানতেন ; তাই 'শোনা যায়' তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁকে 'মনে করে'ই 'নিশ্চয়' 'ভাবুক সভা' লেখা হয়েছে ('সুকুমার রায়'/লীলা মজুমদার)।

অবশ্য সুস্পষ্টভাবে এখানে বলা প্রয়োজন, সুকুমার শুধু সত্যেন্দ্রনাথকেই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ক'রে তুলেছেন এমন কোন সিদ্ধান্তে ভুলেও পৌঁছবার বাসনা বর্তমান আলোচকের নেই। তবে সমসাময়িক একশ্রেণীর কবির ভাব-বিলাসিতা তিনি উপহাসযোগ্য মনে করেছিলের সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

দ্বিতীয় পর্ব

১৯১৫ থেকে ১৯২০ সালের ভিতরে লেখা হয়েছিল 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম' 'চলচিত্ত-চঞ্চরি' ও 'অবাক জলপান'। মাঝখানে মাত্র তিনটি বছর অতিক্রম করে এসে দ্বিতীয় পর্বে, সুকুমার যেন হঠাৎই বিস্ময়কর ভাবে পরিপূর্ণ। স্মরণীয়, 'ভাষার অত্যাচার' প্রবন্ধও তিনি লিখেছিলেন ঐ ১৯১৫ সালে। এবং তার ঠিক আগের বছর 'সন্দেশ' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিল 'খিচুড়ি'—'খেয়াল রসে'র বিচিত্র রসায়নে 'বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য' যেখানে অদ্ভুত 'বৈপরীত্যে' উজ্জ্বল—সেই 'আবোলতাবোল' কবিতাগুচ্ছের প্রথম কবিতা।

অন্তর্বর্তী তিনটি বছরে (১৯১২-১৫) চিন্তা-ভাবনায়, জীবন-বোধে সুকুমার গম্ভীর ও আত্মস্থ হয়ে উঠেছিলেন শুধু নয়, তাঁর দৃষ্টির সামনে থেকে অনেক অস্পষ্টতা সরে গেছে। চারপাশের অর্থশূন্য বড় কথা বড় ভাবের চোখধাঁধানো ধুলোর ঝড়ের ভিতরেও সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের একটা মান বা norm-কে যেন তিনি খুঁজে পেয়েছেন। 'সবার চাইতে ভাল' যে-'পাঁউরুটি আর' ঝোলাগুড়, তার সরল বাস্তবতায়, প্রতীকী অর্থের ভিতরে। সদর্থক জীবনবোধের শক্ত জমির ওপর দাঁড়িয়েই সুকুমার লিখলেন 'জীবনের হিসাব' কবিতা (সন্দেশ, ১৩২৫)। সেখানেই 'সাঁতার' না-জানা জ্ঞান-গর্বী 'বাবু'র—তথা সমস্ত মধ্যবিত্ত বাবু-শ্রেণীর 'জীবন'কে 'ষোল আনাই মিছে' বলে রায় দিয়েছে 'মুখ্য মাঝি'। প্রায় ঐ সময়ে লেখা (প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৪) একটি প্রবন্ধে (মজার কথা, তারও নাম 'জীবনের হিসাব') সুকুমার 'তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তের তল্পি বহিতে বহিতে মানুষ কেমন করিয়া জীবন্ত সত্যের মর্যাদা ভুলিয়া বসে'—সে কথা লিখেছিলেন। আর এক প্রবন্ধে ('যুবকের জগৎ' 'তত্ত্বকৌমুদী' ২৩ এপ্রিল, ১৯১৭) সুকুমার 'নিজস্ব', মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট ঘোষণা ক'রে বলেছিলেন, '…আমার চাইতেও কত বিচিত্র ভাবে কত নিবিড় ভাবে কত লোক জগৎকে জানিয়াছে বুঝিয়াছে, আমি তেমন করিয়া বুঝি নাই—নাই বা বুঝিলাম। আমার জীবন যেটুকু দেখিয়াছে, সেইটুকুই আমার দেখা—একান্তভাবে নিজস্বভাবে বিচিত্রভাবে আপনার বলিয়া দেখা।' সহজ আন্তরিক জীবনযাপনের প্রতি সুকুমারের সশ্রদ্ধ মনোভাব ১৯১৯ সালে লেখা একটা

ছোট্ট তাৎপর্যপূর্ণ 'শোক রচনা'তেও প্রকাশ পেয়েছিল। 'মংলি', অর্থাৎ সুকুমারের মামা প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন সমাজের আর পাঁচ দশ জনের বিচারে ছিল লক্ষ্যহীন, 'কেবল বাজে কাজে' 'নষ্ট'। কারণ, 'সে উচ্চ আদর্শের কথা' বলত না, 'ধর্মের বড় বড় তত্ত্ব' জানতনা, 'পাণ্ডিত্যের পরিচয়' তার মধ্যে পাওয়া যায়নি। 'শুধু আপন···অন্তরের প্রেরণায় সেবার অহেতুক আনন্দে···অম্লান বদনে আপনার সুখ দুঃখ বহন' ক'রে 'সহজ জীবনের পথ' ধরে 'সহজেই' 'সে' চলে গেছে। সুকুমারের মনে হয়েছিল···এই ত জীবনের সার্থকতা···যথার্থ জীবনের উৎস'। জীবনের 'Fundamental Ideal' সম্পর্কে এই যে বোধ তা ছিল সুকুমারের একান্ত নিজস্ব, 'সমাজ' বা চারপাশের গড়পড়তা মানুষজনের থেকে স্বভাবতই স্বতন্ত্র। বলাবাহুল্য, স্বতন্ত্র হলেও এই চেতনা স্বয়ং-সৃষ্ট ছিল না।

আমরা জানি, সর্ববিধ সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ব্রাহ্ম আন্দোলনের গঠনমূলক সদর্থক ভূমিকার প্রায় সবটুকুই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ; মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে। এরপরও বিশ শতকে অতীত গৌরবের স্মৃতি বুকে নিয়ে ব্রাহ্মসমাজ তার সাংগঠনিক অস্তিত্ব ও ক্রিয়া-কলাপ অব্যাহত রেখে গেছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে স্পষ্টতই জীর্ণ হয়ে এসেছিল তার আদর্শের পুঁজি। বহুকাল যাবৎ ত্রিধাবিভক্ত ব্রাহ্মসমাজে গোষ্ঠিগত দ্বন্দ্বের তীব্রতা বিশ শতকে এসে যদিও কিছু কম তবু হঠাৎ হঠাৎই ছোটখাট নানান আপততুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে চুলোচুলি বেধেছে। অবস্থা অবশ্য পড়ে গেছে সকলেরই। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি ব্রাহ্মসমাজ তো প্রায় নিরস্তিত্ব—তার টিমটিমে প্রদীপকে কোনক্রমে জ্বালিয়ে রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'কেশব কৈন্দ্রিক' নববিধানও শক্তিহীন। যেটুকু দাপট তা ঐ শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সাধরণ ব্রাহ্মসমাজের। অবশ্য সংকট সেখানেও ঘনীভূত। সমাজে'র সদস্যদের ভিতরে অতীতের 'missionary spirit' 'Spirit of self sacrifice' আর নেই—১৯১২-তে এই আক্ষেপ করেছেন স্বয়ং শাস্ত্রী মশাই, তাঁর 'History of the Brahmo Samaj'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে (P. 274-75)।

যাই হোক, পরিবর্তনশীল সময় ও জীবনের সঙ্গে 'সমাজে'র গণ্ডিবদ্ধ ধ্যান ধারণার বিচ্ছিন্নতা যত প্রবল হল ততই বর্তমানের দাবি পূরণে অসমর্থ ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব কালাসঙ্গতিদুষ্ট (anachronistic) হয়ে উঠল। যে সমস্ত আদর্শের ঘোষণা, উচ্চ-ভাবের কথা বা শব্দের সঙ্গে এক সময় সরাসরি কিছু না কিছু সম্পর্ক ছিল বাস্তব জীবনের—অবস্থান্তরে সে গুলোই অন্তঃ-সারশূন্য শব্দের খোলস মাত্রে পরিণত হল। বলা বাহুল্য, এই পরিমণ্ডলে, ব্রাহ্মসমাজের ভাঁটার সময়েই কেটেছে সুকুমারের শৈশব, কৈশোর। সংক্ষেপে বলতে গেলে, উৎসাহী ব্রাহ্ম উপেন্দ্রকিশোরের ছেলে সুকুমার, জন্মসূত্রে সমাজ-এর আপনজন। মাঘোৎসব, নববর্ষোৎসব ইত্যাদি বাৎসরিক অনুষ্ঠান আর বাড়িতে, সমাজমন্দিরে নিত্যকার উপাসনা, ব্রহ্মসংগীতের ভিতর দিয়ে, হয়ত ছেলে সত্যজিতের মতনই উপাসনাকালে সুজনির নক্সা মুখস্ত করতে করতে ('যখন ছোট ছিলাম' পৃঃ ২০), এক সময় নিজের অজান্তেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন

ব্রাহ্মসমাজের একজন সক্রিয় সদস্য।

'সমাজে'র সঙ্গে তাঁর পরবর্তী আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের টানা-পোড়েনের ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক। স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ এক আলোচনার বিষয়। আমাদের কাছে এ মুহূর্তে প্রাসঙ্গিক তথ্য হল, প্রশ্নাকুল বৈজ্ঞানিক চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে নিজের চারপাশেই অসংগতির অর্থহীনতার এক চূড়ান্ত রূপ সুকুমার আবিষ্কার করেছিলেন। 'হিজিবিজি খাতা'য় তাই তিনি 'কে আমরা ?' এই প্রশ্নের দ্বিধাহীন উত্তরে লিখেছিলেন : 'ব্রাহ্মসমাজে জন্মিয়াছি' ব্রাহ্মসমাজের হাওয়ার মধ্যে বাস করিয়াছি, 'ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়াছি কিন্তু জিজ্ঞাসার কোন উত্তর পাই নাই। ইহাই আমাদের পরিচয়।' সুকুমার বিশ্বাস করতেন, '…বর্তমানের মত এমন স্পষ্ট, এমন পরিপূর্ণ শুভমুহূর্ত আর কোথায় ?' 'যুবকের জগৎ'-এ তিনি মন্তব্য করেছিলেন, '…এই বর্ত্তমান, যাহার মধ্যে পূর্ণ পরিণত ভবিষ্যতের সমুদয় সম্ভাবনা ও সার্থকতা নিহিত রহিয়াছে, এই বর্ত্তমানই ত যথার্থ জীবন।' স্বভাবতই তাঁর মনে হয়েছিল '…যে নবীনতার উৎস একদিন ব্রাহ্মসমাজকে সঞ্জীবন সুধাসিক্ত করিয়া রাখিয়াছিল নবযুগের আবেষ্টনের মধ্যে আবার তাহাকে নূতন করিয়া অন্বেষণ করিতে হইবে।' সমস্যা তাতেও মেটেনি, কারণ 'জীবনের মধ্যে সে উৎসকে' তিনি আর খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অবশ্য তখনও 'আশা' ছিল, ভেবেছিলেন হয়ত 'তাহার সন্ধান পাওয়া কঠিন হইবে না।' কিন্তু শেষ এই 'অশো'-ও ধাক্কা খেয়েছিল রূঢ় বাস্তবে। 'বর্ত্তমানতা'র উপাসক সুকুমারের কাছে ব্রাহ্মসমাজের সামগ্রিক অস্তিত্বই ক্রমশঃ অর্থহীন, সময়-বিরুদ্ধ প্রতিভাত হতে লাগল। তাই 'হিজিবিজি খাতা'য় তিনি, পুনশ্চ, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছিলেন, 'প্রশ্ন এই যে, সে বস্তুটা কি, এবং সে বস্তু কোথায় যাহার জন্য ব্রাহ্মসমাজের এই সংগ্রাম ? প্রশ্ন এই যে, এই ব্রাহ্মসমাজ চক্ষের সমক্ষে যাহাকে স্পষ্ট দেখিতেছে—সে কোন্ বার্তা বহন করিতে চায়—তাহার সংগ্রামের সার্থকতা কোথায় ?' উদ্ধৃত অংশের নিম্নরেখটুকু, বলা-বাহুল্য, সুকুমারের নিজের হাতে দেওয়া। বুঝতে অসুবিধা হয়না, তাঁর সমস্ত মোহ মুক্তির পিছনে ছিল বিশ্বাসের, স্বাধীন স্বাভাবিক ও সঙ্গতিপূর্ণ জীবন-বোধের, একটিই সাধারণ উৎসভূমি।

শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম

'অর্থ! অর্থ তো অনর্থের গোড়া।' 'ভাবুকসভা'তে ভাবুকদাদার এই বক্তব্যের ভিতরেই ছিল দ্বিতীয় পর্বের প্রথম নাটক 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুমে'র বীজ।

'প্রবাসী', ১৩২২, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার, 'ভাষার অত্যাচার' প্রবন্ধে সুকুমার ভাষা সম্পর্কে, সুস্পষ্টভাবে তাঁর বক্তব্য ব্যক্ত করলেন। বললেন, ভাষা চিন্তারই বাহন। কিন্তু আমরা প্রায়শঃ শ্রম সাপেক্ষ চিন্তার পথ পরিহার বা সংক্ষেপ করবার জন্য 'শ্রুতি বা আপ্তবাক্যের আশ্রয়' নিয়ে থাকি। অনবদ্য ভাষায় সুকুমার মন্তব্য করলেন, 'ছাতার নিচে চটি চলিতেছে দেখিয়া লোকে বুঝিত বিদ্যাসাগর চলিয়াছেন। আমরা

দেখি ভাষার ছাতা আর চটি, জীবন্ত বিদ্যাসাগরকে আর দেখা হয় না' পুরাণে আছে 'গন্ধর্বেরা বাক্যভোজী', তারা নাকি 'শব্দ আহার' করে থাকে। 'এই হিসেবে', সুকুমারের মতে, 'গন্ধর্ব শ্রেণীর জীব আমাদের মধ্যে বড় কম নয়। কিন্তু অর্থই যে বাক্যের সার এবং অর্থটাকে সম্যক রূপে পরিপাক' না করতে পারলে 'শব্দটা যে মনের পুষ্টি-সাধনের অন্তরায়' হয়ে উঠতে পারে 'এই সহজ কথাটা অনেকের মনে থাকেনা।' ফলে, 'চিন্তার কুপুষ্টি জনিত নানান রকম রোগের সৃষ্টি হয়।' অর্থাৎ, 'ভাষা যে নিজের অর্থ গৌরবেই সত্য' একথা ভুলে 'সে যখন কেবলমাত্র শব্দ গৌরবে' বা অর্থহীন ধ্বনি গৌরবে বড় হতে চায় তখন তার 'অত্যাচার অনিবার্য।' সন্দেহ নেই এই প্রবন্ধেই আছে সুকুমারের দ্বিতীয় পর্বের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নাটকের বক্তব্যের মূল সুর। উল্লেখযোগ্য পরবর্তী তথ্য হচ্ছে, 'ভাষার অত্যাচার' ও 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম' নাটক—দুটোই লেখা হয়েছিল ১৯১৫ সালে।

'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুমে'র প্রধান চরিত্র গুরুজি ও তার শিষ্যবৃন্দ। শিষ্যদের দুটো দল। একদিকে হরেকানন্দ ও জগাই। অন্যদিকে বেহারী ও পটলা।

আশ্রমে উপস্থিত বিশ্বম্ভর স্পষ্টতঃই Outsider, আগন্তুক। যেমন ভবদুলাল, 'চলচিত্তচঞ্চরি'তে। নাট্যকারের প্রতিভূ-চরিত্র সৃষ্টির অপরিণত যে প্রচেষ্টার সূত্রপাত 'ঝালাপালা'য় কেষ্টা ঘটিরামের ভিতরে, বিশ্বম্ভর তারই অপেক্ষাকৃত পরিণত ফসল। তবে পরিণততর ও উজ্জ্বলতর, বলাই বাহুল্য, হল ভবদুলাল।

বেহারীর স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে বিস্মিত বিশ্বম্ভর চোখ ছানাবড়া করে বলে 'কি আশ্চর্য! আপনার গুরুজিকে জিজ্ঞেস করবেন ত—'। স্মরণ করা যায়, রবীন্দ্রনাথের 'গুরুবাক্য' প্রহসনেও বদনের মনে 'রাত্রে' 'আহার নিদ্রা' ভোলানো প্রশ্ন জেগেছিল, "জটায়ু যে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে ম'ল তার অর্থ কী, তার কারণ কী···, যদি কোন অর্থ না-ই থাকে, তাই বা কেন?" সহজ যে উত্তর সকলেই জানে তাতে 'মন সন্তুষ্ট' হয়না বলেই শিরোমণি মশাইকে জিজ্ঞাসা। এবং শিরোমণিও গুরুসুলভ গাম্ভীর্যে তার গভীর ব্যাখ্যান করেছিলেন।

এক্ষেত্রেও গুরুজি আসতেই দু'দল উঠে পড়ে লাগল, কে কার আগে স্বপ্নের কথা পাড়তে পারে। পটলা যদি সাক্ষ্য দেয়, 'নাক ডাকতে ডাকতে সারে গামা পাধা নিসা ···করে সুর খেলাচ্ছে', তবে বিশ্বম্ভর যোগ করে: 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আর সাতটে সুরের সঙ্গে রামধনুর সাতটে রং একবার ইদিকে আসছে, একবার উদিকে যাচ্ছে।' অগত্যা, নিজের স্বপ্নই বেহাত হয়ে যায় দেখে বেহারী তাকে ভেঙে দিল। এরপর বিপক্ষ অর্থাৎ হরেকানন্দর দলের দিকে, তাদের দিক থেকে এই 'স্বপ্ন' বিষয়ে সম্ভাব্য সমস্ত সন্দেহের বিরুদ্ধেই, চ্যালেঞ্জের ভয়ংকর মুষল ছুঁড়ল বিশ্বম্ভর: 'যে বলে এটা বাজে স্বপ্ন, সে নাস্তিক'।

বিশ্বম্ভরের কৌশল ফলপ্রসূ হল। কারণ, 'তর্কস্থলে, প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করা যখন আবশ্যক হয়, তখন এইরূপ ('অস্পষ্ট তত্ত্ব অনির্দিষ্ট সংস্কারের') দু একটি জুজুকে অকস্মাৎ আসরে নামাইলে তাহার ফলটি হয় ঠিক চলন্ত রেলগাড়ির মুখে

লালবাতি দেখাইবার অনুরূপ, ('দৈবেন দেয়ম')। এখানেও তাই। 'নাস্তিক' শব্দের জুজু বাজিমাত করেছে।

গুরুজি সাগ্রহে স্বপ্নের বিবরণকে স্বাগত জানালেন। বললেন, 'শব্দই আলোক! শব্দই বিশ্ব—শব্দই সৃষ্টি—শব্দই সব!' সন্ন্যাসীর নাকের যে গম্ভীর গর্জন, '…এ সেই শব্দ।' শুধু 'একথাটুকু বলবার জন্যই এতদিন' তিনি 'দেহধারণ করে' আছেন।

এতক্ষণ বিশ্বম্ভর উস্কানী দিয়ে এসেছে অনেকটা এজেন্ট প্রভোকেটরের মতন। তত্ত্বকথার চাপে হাওয়া ভারী হয়ে ওঠা মাত্রই তার কাজ হয়ে দাঁড়াল গুরুগম্ভীর তত্ত্বের বেলুন চুপসে দেওয়া। গুরুজির কথায় হঠাৎই তার ভাব জেগে উঠল, মনে পড়ে গেল 'ছেলেবেলায়' লেখা এক 'পদ্য' ঃ 'ভবপান্থবাসে এসে/ভুগে ভুগে কেশে কেশে/…টাকা মেরে পালালি শেষে'।

কান না দিয়ে গুরুজি ব্যাখ্যা করেই চললেন ঃ 'সৃষ্টির গোড়াতে প্রাণ, কারণ, আকাশ সব মিলে যখন হব হব কচ্ছিল তখন যদি 'ওম' শব্দ করে প্রণব ধ্বনি না হত, তবে কি সৃষ্টি হতে পারত? শব্দে সৃষ্টি শব্দে স্থিতি, শব্দে প্রলয়।…যা ভাববে তাই শব্দ—শাস্ত্রে বলেছে 'শব্দ ব্রহ্ম'।' এ পর্যন্ত গুরুজির সব কথারই সমর্থন আছে ভারতীয় ভাববাদী দর্শনশাস্ত্রে। বক্তব্য ছাড়াও বাচনভঙ্গির কিছু সাদৃশ্য বোঝাবার জন্য বিবেকানন্দের 'স্বামি-শিষ্য সংবাদ' থেকে একটা উদ্ধৃতি ঃ "…সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্ম প্রথম শব্দাত্মক হন, পরে ওঁকারাত্মক বা নাদাত্মক হয়ে যান। তারপর পূর্ব পূর্ব কল্পের নানা বিশেষ বিশেষ শব্দ, যথা 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ' বা, 'গো মানব ঘটপট' ইত্যাদি ঐ ঐ শব্দ ক্রমে এক একটা ক'রে হবা মাত্র ঐ ঐ জিনিসগুলো অমনি তখনি বেরিয়ে এসে বিচিত্র জগতের বিকাশ হয়ে পড়ে। এইবার—বুঝলি শব্দ কি রূপে সৃষ্টির মূল?" (রচনাবলী ৯ম খণ্ড, পৃ ৪১-৪২)

নাটকে হাওয়া আবার যথেষ্ট ভারি ও গম্ভীর। সুতরাং বিশ্বম্ভর এবার 'শব্দব্রহ্ম'র সূত্র ধরে সোজা চলে গেল 'মতিলাল' এর বানানো 'ভুঁই পটকা'র শব্দে এবং সেখান থেকে গুরুজির 'ন্যাজে'।

এ জাতীয় চাপল্যে গুরুজির অবশ্য বিকার নেই কোনো। শব্দ নিয়ে ছেলেখেলা করার জন্য ভক্তদের সামান্য সস্নেহ ভর্ৎসনা করলেন তিনি। তাঁর মতে, শব্দ অর্থের বাঁধনে-বন্দী। 'এক একটি শব্দ এক একটি চক্র।…এই অর্থের বন্ধনটি ভেঙে চক্রের মুখ যদি খুলে দেওয়া যায় 'তবেই সে মুক্তগতি স্পাইরাল মোশান হয়ে কুণ্ডলীক্রমে উর্দ্ধমুখে উঠতে থাকে।' কুল-কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগিয়ে মূলাধার পদ্ম থেকে একের পর এক পদ্ম বা চক্র ভেদ ক'রে মস্তিষ্কস্থিত সহস্রার পদ্মে উপস্থিত হবার যে তান্ত্রিক তত্ত্ব, এখানে মনে হয় তারই ইংগিত।

শব্দচক্রে মন্ত্র ঠুকে অর্থের বাঁধন ঢিলে করবার সাধনায় বসলেন গুরুজি। অর্থ বন্ধনমুক্ত শব্দশক্তির 'উর্দ্ধগতি কুণ্ডলী' আশ্রয় করে সশিষ্য গুরুজী স্বর্গ পথে ধাবমান। 'শব্দের বিষদাঁত যে অর্থ' তাকে ভাঙতে হলে প্রয়োজন অর্থহীনতার হাতুড়ি, 'নির্বিশেষ মন্ত্র'—'গো গোবৌ গাবঃ'।

পরিশেষে বিশ্বকর্মার উচ্চারণ : 'শব্দযজ্ঞ হবিকুণ্ড অফুরন্ত ধূম এই মারি শব্দ-কল্পদ্রুম' এবং 'দ্রুম' শব্দে 'সশিষ্য গুরুজি'র নিমেষে স্বর্গ হতে মাটিতে পতন।

সুকুমার লিখেছিলেন, 'অর্থগৌরব' ভুলে ভাষা যখন শুধু 'শব্দগৌরবে বড় হইতে চায়' তখন 'তাহার অত্যাচার অনিবার্য।' এই অত্যাচারকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর সময়ের মানুষের সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে, ধর্মচর্চায়, রাজনীতির অঙ্গনে, সাহিত্যিক ও আরো নানান অভিব্যক্তিতে। অর্থহীনতার উন্মাদ উপাসক 'গুরুজি'র তাণ্ডব সে সবেরই অতিরঞ্জিত রূপকভাষ্য, একথা বলা বাহুল্য।

'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম'-এর আরো পাঁচ বছর পরে, ১৯২৭ সালে 'আবাক জলপান' নাটকটির প্রকাশ।

অবাক জলপান

সম্ভবত এটিই সুকুমারের সবচাইতে পরিচিত নাটক। এর পাকাপাকি আসন ইস্কুল বইয়ে বহুকালের। ফলে 'শিশু সাহিত্যে'র ছাপটা একটু বেশি পরিমাণেই পড়েছে এর উপরে। অবশ্য ছোটোদের এতে ক্ষতি হয়নি। বরং আত্মবঞ্চিত থেকেছে বড়রাই।

'তৃষ্ণার্ত হইয়া চাহিলাম এক ঘটি জল / তাড়াতাড়ি এনে দিল আধখানা বেল'। 'কৌতুকহাস্যে'র উৎস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূতে'র ক্ষিতি মন্তব্য করেছিল, "তৃষিত ব্যক্তির প্রার্থনা মতে তাহাকে এক ঘটি জল আনিয়া দিলে সমবেদন প্রবৃত্তিপ্রভাবে আমরা সুখ পাই, কিন্তু তাহাকে হঠাৎ আধখানা বেল আনিয়া দিলে, জানিনা কী প্রবৃত্তিপ্রভাবে, আমাদের কৌতুক বোধ হয়।' 'একটু জলপাই কোথায়?'—এই আকুল প্রার্থনার উত্তরে : 'এ তো জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম চান তো দিতে পারি'—শুনে পথিকের যে প্রথম অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা হয়, তারই ভিতরে এই সহজ কৌতুকের একটা অব্যর্থ ঝাঁকুনি সুকুমার সযত্নে মজুত রেখেছিলেন। তার অনায়াস টানেই অতঃপর আমরা ঢুকে পড়ি খাপছাড়া মানুষদের রাজত্বে।

'অবাক জলপানে'র (সন্দেশ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭) দু বছর আগে 'খাই খাই' কবিতায় (সন্দেশ, কার্তিক, ১৩২৫) 'খাওয়া' —শুধু এই একটি ক্রিয়াপদকে নিয়ে মজার চূড়ান্ত করেছিলেন সুকুমার। আর 'অবাক জলপানে'র কাছাকাছি সময়ে, একই বছরে, তিনি লিখেছিলেন 'ফাজিলের ডিকসেনারী', যার অপর নাম 'শব্দকল্পদ্রুম' ('ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রুম্...', সন্দেশ, আশ্বিন, ১৩২৭)। সেখানেও নিছক খেলার ছলে বাংলা ক্রিয়াপদের (ফুল 'ফোটা', গন্ধ 'ছোটা', হিম 'পড়া', রাত 'কাটা'... ইত্যাদি) কৌতুককর রূপ সুকুমার এঁকেছিলেন। পাশাপাশি 'অবাক জলপানে' জল 'পাওয়া' এবং 'মেলা'—এই দুই ক্রিয়াপদের দাপটে পথিকের হয়েছে প্রাণ যাবার উপক্রম। পূর্বাভাস অবশ্য নয়বছর আগেকার 'ঝালাপালা' নাটকেই ছিল :

খেঁটু।...আজকাল মশাটা কেমন বল দেখি?

রামকানাই। বরাবর যেমন থাকে, ছোট ছোট কালো মতন, উড়ে বেড়ায়...

খেঁটু। আহা, বলি লাগে কেমন?

রামকানাই। তা কি করে বলব? কখনও ভাজাও করিনি চচ্চড়িও খাইনি।

পার্থক্যও স্পষ্ট। 'নাছোড়বান্দা' পরগাছাদের তাড়ানোর উদ্দেশ্যে শব্দ নিয়ে সচেষ্টভাবে খেলা করেছিল রামকানাই। আর, 'অবাক জলপানে', শব্দের অর্থের এক একটা স্তরে আবদ্ধ অসচেতন চরিত্রদের ভিতরে সুকুমার ফুটিয়ে তুলেছেন এক গভীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যাধির রোগ-লক্ষণ।

ক্ষুধার মতন তৃষ্ণাও মানুষের স্বাভাবিকতার, সুস্থতার এক সরলতম প্রকাশ। বাস্তবতা ও ভারসাম্যের এই অবস্থানেই দাঁড়িয়ে আছে 'অবাক জলপানে'র পথিক ও তার অভিজ্ঞতার শরিক পাঠক/দর্শকেরা। নাটকের বাদবাকি আর সব চরিত্রই স্বাভাবিকতাবিচ্যুত, ভারসাম্যহীন, নিজের নিজের চিন্তার, ও স্বার্থের সংকীর্ণ বৃত্তে বন্দী। সেটা ভেঙে বেরিয়ে এসে মানুষের সুস্থ সংগত প্রয়োজনকে স্বীকৃতি জানাতে তারা অসমর্থ। দুপক্ষের ভিতরে তৈরী হয়ে গেছে একটা ভাষা-সমস্যা, ভাব আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে এক অনতিক্রম্য ফারাক। ফলের ব্যাপারী ঝুড়িওয়ালার কাছে 'জলপাই'-এর একটিই অর্থ। মামারবাড়ি ও স্বগ্রামের মিঠে জলের অনুরাগী বৃদ্ধের চিন্তায় জলের দ্বিতীয় কোন অনুষঙ্গ নেই। জ্ঞানাভিমানী দাম্ভিক বৃদ্ধ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার চিন্তাতেই বিভোর। ছন্দ-পাগল কবির কাছে কবিতার 'মিল'টুকুই হল একমাত্র ভাববার বিষয়। আর গ্রন্থকীট বৈজ্ঞানিকের মতে তৃষ্ণার্তের কাছে জলের চাইতেও জল সম্পর্কে জ্ঞান অনেক জরুরী। লক্ষণীয়, এরা কেউ-ই কিন্তু 'হাঁসজারু' বা 'বকচ্ছপে'র মতন দৃশ্যতই উদ্ভট নয়। সকলেই পুরোদস্তুর আমাদের চেনা জানা। এমনকি তাদের অসংগতির ছোট খাট চেহারাও আমাদের কাছে, নিজেদেরই অসংগতির অংশ হিসেবে, সুপরিচিত। অথচ সামান্য অতিরঞ্জন-এর ফলে মুহূর্তের মধ্যে তারা যেন ভিনগ্রহের প্রাণীর চাইতেও অপরিচিত ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে।

সঙ্গত কারণেই 'হাস্যকৌতুকে'র (১৯০৭) 'চিন্তাশীল', 'সূক্ষ্মবিচার' 'আশ্রমপীড়া' ইত্যাদি প্রহসনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। ক্ষিদে বা খাওয়া ব্যাপারটাকে রবীন্দ্রনাথও জীবনের একটা স্বাভাবিক ধর্ম হিসেবে দেখতেন। তাই অবাস্তবতার পাশে তিনিও বারবার তাঁর প্রহসনগুলোতে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন। 'চিন্তাশীল' নাটকের শুরুতেই নরহরি চিন্তায় মগ্ন। "ভাত শুকাইতেছে। মা মাছি তাড়াইতেছেন।" নরহরি দিদিমার বক্তব্য শুধরে দিয়ে বলেছিল, "...সূর্য তো অস্ত যায় না। পৃথিবীই উলটে যায়। বসো আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।" তার উৎসাহে দিদিমা জল ঢেলে ছিলেন, "নাও আর আমায় বোঝাতে হবে না। এদিকে ভাত জুড়িয়ে গেল, মাছি ভন ভন করে।" 'আশ্রমপীড়া'তে 'প্রেম'-পাগল নবকান্ত 'ধরে' "প্রেমের কী মহান শক্তি" বোঝাতে শুরু করলে নরোত্তম বলেছিল, "খিদের শক্তি তার চেয়ে বেশি। আমি খেতে যাই, আমাকে ছাড়ো—।" 'সূক্ষ্ম-বিচারে'র চণ্ডীচরণ 'অবাক জলপানে'র খাপছাড়া মানুষদের সমগোত্রীয়। সোজা

কথা সে-ও সোজা ভাবে বোঝে না। "মশায় ভালো আছেন"—তাকে এই এক প্রশ্ন ক'রে কেবলরাম বিপাকে পড়ে। 'ভালো আছেন' মানে কি?" "স্বাস্থ্য কাকে বলে", "আমি কে?"—ইত্যাদি সূক্ষ্মবিচারের ধাক্কায় তার নাওয়া খাওয়া মাথায় উঠে যায়। হতাশভাবে সে এক সময় বলে, "মীমাংসা আপনিই করুন, আমার খিদে পেয়েছে।" তাতেও ছাড়া না পেয়ে কেবল রাম শেষে "পায়ে ধরে" রেহাই চায়ঃ "আপনি কেমন আছেন' এই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের উত্তর কবে দিতে পারবেন একটা দিন স্থির করে দিন…।" 'অবাক জলপানে'র 'পথিক' অবশ্য 'পায়ে ধরে' কোন আপোস করেনি। সে জলের গ্লাস কেড়ে নিয়েই জল খেয়েছে এবং গাল দিয়েছে 'পাগল' আর 'জোচ্চোর' ব'লে।

সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনার মতন প্রহসনগুলোর প্রভাবও সুকুমারের উপর যথেষ্ট। যদিও প্রভাবটুকুকে আত্মস্থ ক'রে নিয়ে যে সাফল্য তিনি দেখিয়েছেন তা তাঁর নিজস্ব; বস্তুতঃ, 'জল'—এই একটি মাত্র শব্দকে অবলম্বন ক'রে জীবন ও সময়ের সুস্থ, স্বাভাবিক দাবির সামনে চোখ বুজে পিছন ফিরে দাঁড়ানো সমসাময়িক মানুষদের স্বভাবগত অসংগতির অমন অবিশ্বাস্য ও অমোঘ উন্মোচন আর ক'জনের পক্ষেই-বা সহজ ও সম্ভব ছিল?

চলচিত্তচঞ্চরি

সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পর 'বিচিত্রা' পত্রিকার শ্রাবণ, ১৩৩৪ (১৯২৭) সংখ্যায় 'চলচিত্তচঞ্চরি' প্রথম প্রকাশিত হয়। এই নাটকটিরও সঠিক রচনাকাল নিয়ে মতবিরোধ আছে। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯১১ সনে এর অভিনয় দেখেছেন ব'লে লিখেছেন 'বৈতানিক' (বৈশাখ, ১৩৭২) পত্রিকায় এক স্মৃতিচারণে। 'আনন্দ' ও 'এশিয়া' প্রকাশিত দুটি 'সুকুমার রচনাসমগ্রে'র সম্পাদকই একে চিহ্নিত করেছেন 'শ্রীশ্রীশব্দ-কল্পদ্রুম'-এর (১৯১৫) 'সমকালীন' হিসেবে।

প্রথমত, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। অন্য প্রসঙ্গে তাঁর স্মৃতিভ্রমের নজীর ঐ লেখাতেই আছে। তার চাইতেও বড়কথা—ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ও প্রয়োগের মধ্যকার সামঞ্জস্যহীনতা, তার 'নৈতি'-মূলক সময়বিরুদ্ধ ভূমিকা, নেতৃত্বের 'অব্যাহত নায়কতন্ত্র' ও নানান গোষ্ঠিগত কোন্দল—ইত্যাদি সম্পর্কে ১৯১১-তে সুকুমারের পক্ষে সচেতন থাকার বা হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। স্বাভাবিকও ছিল না। অথচ এই সমস্ত নিয়ে তাঁর পরবর্তী মোহভঙ্গেরই সুনিশ্চিত ছাপ রয়েছে 'চলচিত্ত-চঞ্চরি'তে। ইতস্ততঃ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কোন অজ্ঞাতলোকে, এর আকস্মিক সূত্রপাত কিছু আগে থেকে হলেও হতে পারে। কিন্তু তার স্পষ্ট রূপ সুকুমারের চেতনায় ১৯১৫-র পূর্বে, ১৯১১তেই, দানা বেঁধেছিল এমন কথা অনুমান করা রীতি-মতন শক্ত।

সুকুমারের নিজস্ব ও নির্মোহ চিন্তাভাবনা বিকাশের ক্ষেত্রে, বিশেষত ১৯১৪-১৫-র পর থেকে একটা তাৎপর্যপূর্ণ পরিণতির কথা আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি। দ্বিতীয়

পর্বের আলোচনার শুরুতে তার নজীর হিসেবেই এসেছিল 'ভাষার অত্যাচারে'র প্রসঙ্গ। 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম' নাটকটি ছিল, আমরা দেখেছি, ঐ প্রবন্ধের বক্তব্যের উদ্ভট ও নৈর্ব্যক্তিক রূপায়ণ। 'চলচিত্তচঞ্চরি'ও আমরা দেখব, মূলত একই তত্ত্বের বাস্তবগ্রাহ্য, সামাজিক নাট্যরূপ। তাই এর রচনাকাল সম্পর্কে দুই 'সুকুমার রচনা সমগ্র'র সম্পাদকদের মতামতকেই মনে হয় সত্যের বেশি কাছাকাছি।

ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি ও বিশ শতকের গোড়ায়, এই কলকাতা শহরেই, নানান সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় আন্দোলনকে উপলক্ষ্য ক'রে তৈরী হয়ে উঠেছিল হরেক রকম 'সমাজ', 'দল', 'সভাসমিতি' 'ফ্র্যাটার্নিটি'। তাদের অনেকের ভিতরকার সম্পর্কের তিক্ততা ও দলাদলি বহু সময়ই তখন পরিবেশকে আবিল করে তুলেছিল। তৎকালীন ইতিহাসের সামান্য ঘনিষ্ঠ পরিচয় থেকেও সে কথা জানা যায়। তাদের অধিকাংশের মারামারি ছিল পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা ও অশ্রদ্ধা-প্রসূত। নিছক 'কথার মারামারি'। নিজের নিজের সংকীর্ণ মতামতের ক্ষেত্রে সদম্ভে অনড় থেকেও অপরপক্ষের নিন্দায় তারা ছিল পঞ্চমুখ। এ বিষয়ে অভিজ্ঞতার যথেষ্ট সুযোগ নিজের পরিচিত গণ্ডির ভিতরেই সুকুমারের ছিল। বলাবাহুল্য, সব চাইতে কাছে থেকে আজন্ম যাঁদের তিনি জেনেছিলেন তাঁরা হলেন ব্রাহ্মসমাজেরই তিন পরস্পরবিরোধী শাখা—আদি, সাধারণ ও নববিধানের মানুষজন। সন্দেহ নেই, 'চলচিত্তচঞ্চরি'তে সুকুমারের আক্রমণ ব্যাপক ও নির্বিশেষ। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যক্ষ ও বিশেষ অভিজ্ঞতা থেকেই যে মূলত নাটকের প্রায়-রক্ত-মাংসের জ্যান্ত চরিত্রগুলোর সৃষ্টি তা অনস্বীকার্য।

ঈশানবাবুদের 'সাম্য-সিদ্ধান্ত সভা' ও শ্রীখণ্ডদেবের 'আশ্রম'-এর ভিতরে সম্পর্ক আজ আদায় কাঁচকলায়। কিন্তু এক কালে 'লালাজি দেওনাথে'র আমলে, তাঁরা একান্নবর্তী ছিলেন। 'খণ্ড-সাধন'পন্থী শ্রীখণ্ডবাবু 'বিজ্ঞানের আগড়ুম বাগড়ুম' নিয়ে একদিকে গড়েছেন 'আশ্রম'। অন্যদিকে ঈশানবাবুদের 'সভা' অব্যাহত রেখেছে 'অখণ্ড-সাধনধারা'। প্রসঙ্গত এখানে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'জ্ঞান' ও কেশব সেনের 'ভক্তিমার্গে'র সামান্য তির্যক উল্লেখ থাকা হয়ত সম্ভব। কিন্তু 'ধাঁধাঁ' তৈরীতে দক্ষ, রসিক সুকুমার একই সঙ্গে বিভিন্ন সাধনমার্গ, দর্শন ইত্যাদির আমদানি করে দু দলের পরিচয়কেই যথেষ্ট জটিল ও অনির্দিষ্ট করে তুলেছেন। উদ্দেশ্য, বলাবাহুল্য, আক্রমণের লক্ষ্যকে গোপন করা নয়, আক্রমণকে সর্বজনীন ক'রে তোলা। নাটকে উভয় পক্ষই নিজের মত ও পথকে একমাত্র, যথাযথ ও অভ্রান্ত ব'লে দাবী করেছে। যেমন সত্যবাহন তেজের সঙ্গে শ্রীখণ্ডবাবুদের বলেছিলেন, 'অখণ্ড সাধনধারা…যদি কোথাও অক্ষুণ্ণ থাকে তবে সে হচ্ছে…সাম্য-সিদ্ধান্ত সভা।' বাস্তবেও এই রকম দাবি-পাল্টা দাবি বিরল ছিলনা। 'তত্ত্বকৌমুদী'র সম্পাদকীয়র একটা ঘোষণা, "…সাধারণ ব্রাহ্মসমাজই ব্রাহ্মধর্মকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করিয়াছেন…এখন একদিকে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী, অপরদিকে মহাপুরুষবাদ", অর্থাৎ কেশব সেনের দলের হাত "হইতে ব্রাহ্মধর্মকে রক্ষা করুন" (২৫ মে, ১৯১৫) যাই হোক এই দুই দলের

সদস্যদের আন্তরিকতা, হাস্যকর আচার আচরণ, বিরোধ বিসংবাদ ও বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই শ্লেষে তীক্ষ্ম পরিহাসে উজ্জ্বল নাটক 'চলচিত্তচঞ্চরি'।

নাটকের শুরুতে, 'সাম্যসিদ্ধান্ত সভাগৃহে' ব্যস্ততা। 'আলাভোলা বাবাজীর চেলা' ভবদুলালের সংবর্ধনার প্রস্তুতি চলছে। ঈশানবাবু গান লিখছেন। 'খুব মোটা মোটা' কয়েকটা বই নিয়ে তারই একটা মন দিয়ে পড়ে চলেছে ছাত্র সোমপ্রকাশ। শ্রীখণ্ডবাবুদের না আসার কারণ জানতে চাইলে নিকুঞ্জ বলে, 'ঈশানবাবু নাকি ও'দের কি ইনসাল্ট করেছেন।'

একদিকে যেমন শ্রীখণ্ডবাবুদের আশ্রমের সঙ্গে 'দলাদলি', অন্যদিকে নিজেদের ভিতরেও এদের রেষারেষি প্রচুর। গায়ক ঈশানবাবুর সঙ্গে সভার এক সদস্য চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক সত্যবাহন সমাদ্দারের ঠোকাঠুকি তো কথায় কথায়। আজ মাননীয় অতিথির সামনে লম্বা চওড়া এক প্রবন্ধ পড়া তাঁর ইচ্ছে। অবশেষে রফা হল, 'গানটাও থাকুক, লেখাটাও পড়া হোক।' অর্থাৎ কোন মতে আপোস করে বজায় রাখা গেল 'সভা'র 'সাম্য-ভাব'। একটা সংকট আপাতত কাটল। এরপর এসে পড়ল বহু-প্রতীক্ষিত মহামান্য অতিথি ভবদুলাল।

অসংগতি ও ভণ্ডামির রাজ্যে ঢুকে পড়ে তাঁর হয়ে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাধাবে এমনই এক চরিত্রের সন্ধানে ছিলেন সুকুমার বহুদিন। চরিত্রটি কেমন হবে সেটা তাঁর কিশোর বয়সের একটি ছোট্ট ঘটনাতেই প্রকাশ পেয়েছিল। ছোটদের ম্যানার্স শেখানোর নামে এক 'স্টাইলিশ' মাসীর 'কড়া শাসন' শেষ অব্দি সুকুমারের বিচিত্র প্রতিবাদের ফলে বন্ধ হয়েছিল। বোকা সেজে সুকুমার কীভাবে 'বিদ্রোহ' করে-ছিলেন, তার বিবরণ দিয়েছেন পুণ্যলতা চক্রবর্তী। অসংগতির বিরুদ্ধে সুকুমারের 'বিদ্রোহে'র এই একান্ত নিজস্ব ভঙ্গি নিয়ে নাটকের ক্ষেত্রে প্রথম দেখা দিয়েছিল 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুমে'র বিশ্বম্ভর। 'স্বর্গপথ' থেকে 'সশিষ্য গুরুজি'র 'দ্রুম' শব্দে পতনের পিছনে তার ভূমিকা নগণ্য ছিলনা। তবু চরিত্র হিসেবে বিশ্বম্ভর অসম্পূর্ণ। তার সচেতন ও বুদ্ধিমান ভাবটাও কখনো পুরোপুরি চাপা থাকেনি। সেদিক থেকে বিশ্বম্ভরেরই পূর্ণতর যথার্থ উত্তরসূরী হল এই অপরিণত বুদ্ধি, নির্বোধচূড়ামণি ভবদুলাল। সে নিজে যেমন হাস্যকর হয়ে উঠবে তেমনি অব্যর্থভাবেই উন্মোচন করবে চারপাশের ততোধিক হাস্যকরতাকে।

যাইহোক, 'স্বাগত সংগীতে'র পরই সত্যবাহন খাতা হাতে নিলেন। প্রবন্ধ পাঠের আগে ভবদুলালের গুরু 'আলাভোলা বাবাজী'র প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন এক স্বর্গীয় দৃশ্যের কথা স্মরণ ক'রে: হাস্যোজ্জ্বল মুখে 'পরম নির্লিপ্তির সঙ্গে' বাবাজী পোষা চামচিকেটিকে জিলিপি খাওয়াচ্ছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'শহরে বাদুড় পোষা' শীর্ষক একটি ছোট সংবাদ ছাপা হয়েছিল শ্রাবণ ১৩২২-এর 'প্রবাসী'তে।

এরপর সমস্যা দেখা দিল: শ্রীখণ্ডবাবুদের সম্পর্কে ভবদুলালকে ওয়াকিবহাল করা জরুরী। প্রতিদ্বন্দ্বী সত্যবাহনকে সে-সুযোগ না দিয়ে ঈশানবাবু আগ বাড়িয়ে সোমপ্রকাশকে বলতে বললেন। সুকুমার-কথিত 'ভাষার অত্যাচারে'র এক মূর্ত-

মান দৃষ্টান্ত এই সোমপ্রকাশ। 'শ্রুতি' বা 'আপ্তবাক্য' ছাড়া সে এক পাও চলতে পারে না। কথায় কথায় অর্থহীনভাবে 'পাশ্চাত্য দার্শনিক' বা 'বড় বড় পণ্ডিত'-দের কথা বলে সে, সুকুমারের ভাষায়, নিজের 'অজ্ঞতার উপর' 'পাণ্ডিত্যের রঙ' ফলায়। অপরদিকে 'আশ্রমে'র ছাত্রদের অশিষ্ট দুর্বিনীত আচরণ, ঔদ্ধত্য ইত্যাদি নিয়ে 'সাম্যসিদ্ধান্ত সভা'র সদস্যদের নিরন্তর অভিযোগের হাস্যকরতার মধ্যে সম্ভবত যুবসমাজ সম্পর্কে প্রবীণ ব্রাহ্মদের একাংশের অসহিষ্ণু মনোভাবই প্রতিফলিত। ব্রাহ্মসমাজের 'স্বাভাবিক নেতা' হিসেবে এ-বিষয়ে সুকুমারের অভিজ্ঞতার কোন অভাব ছিল না। আর তিনি নিজেও ক্রমশ আজন্ম যাঁদের স্নেহ পেয়েছেন—শ্রদ্ধেয় হিসেবে জেনে এসেছেন তাঁদেরই অন্যায়ের প্রতিবাদে নেমে, 'নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত' 'সমাজের' অনেকের চোখে হয়ে উঠেছিলেন একজন 'ব্যাঘাতকারী প্রতি-পক্ষ' (সুকুমার রায় ও প্রশান্তচন্দ্র মহালানবীশের চিঠি, তত্ত্বকৌমুদী, মে ১৯২১)। যুবকদের নিয়ে 'সমাজে'র উপরমহলের দুর্ভাবনার নজীর হিসেবে দু'-বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত 'তত্ত্বকৌমুদী'র দুটি 'সম্পাদকীয়'র উল্লেখ করা চলে। 'আমাদের যুবকগণ'— এই শিরোনামে ২রা ডিসেম্বর, ১৯১৪তে 'তত্ত্বকৌমুদী' লিখেছিল, 'অনেকে এই রূপ মনে করেন যে, ব্রাহ্মসমাজে যে-সকল যুবকের জন্ম হইয়াছে···তাঁহাদের দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ হইতেছে না। তাঁহারা যে শিক্ষা সাধনা, সংযম সেবা ও ধর্মভাব দ্বারা সমাজের সেবার উপযোগী হইবেন এইরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে না···।' 'ব্রাহ্ম যুবকগণের কর্ত্তব্য' নামে আর একটি সম্পাদকীয় (১৬ই নভেম্বর, ১৯১৬) উপদেশ দিয়েছিল, '···গুরুজনের কার্য্যেরও সময় সময় প্রতিবাদ প্রয়োজন হইতে পারে কিন্তু তাহা অতীব বিনয় নম্রতা ও শ্রদ্ধার সহিত করিতে হইবে।' পাশাপাশি 'আশ্রমে'র ছাত্রদের "শ্রদ্ধা গাম্ভীর্যাদি পরিপূর্ণ বিনয়াবনতির ঐকান্তিক অভাব" বিষয়ে সত্যবাহনের অভিযোগ স্মরণ করলে ছবিটা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে যায়।

এরপরই আলোচনা গড়িয়ে এলো 'সাম্যসিদ্ধান্তসভা'র বিশেষ দর্শনের কথায়, সমীক্ষাচক্র, সমসাম্যসাধন আর মৌলিক খণ্ডাখণ্ডের প্রসঙ্গে। সন্দেহ নেই, 'সাম্যসিদ্ধান্তসভা'য় 'খণ্ড' 'অখণ্ড' এবং 'খণ্ডাখণ্ড মীমাংসা'র তত্ত্বগুলো কার্যত দ্বৈত, অদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদকে নিয়েই ঠাট্টা। কিন্তু আপতদৃষ্টিতে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় দর্শন ও সাধনাকে সুকুমার মূলত বিদ্রূপ করতে চেয়েছেন মনে হলেও তা হয়ত ঠিক নয়। আসলে সুকুমার তাঁর 'এই দুর্ভাগ্য দেশকে জানতেন, যেখানে 'জীর্ণতার পরিত্যক্ত কঙ্কাল···প্রাণের চাইতে অধিক মূল্যে বিক্রীত' হয়ে থাকে। জানতেন সেই মানুষদের যারা 'ঝাপসা কথার ধোঁকা' দিয়ে 'আপন মনে এক একটা অস্পষ্টতার মোহে সৃজন করে এবং সেই মোহকে জীবনের মধ্যে সংক্রামিত' করে দিয়ে 'অকারণ আত্মতৃপ্ত বোধ করে ('দৈবেন দেয়ম্')। নিজের 'আত্মপ্রতারিত সমাজে'র (অপ্রকাশিত 'হিজিবিজি খাতা') গণ্ডির ভিতরে ও বাইরে পরিচিত এই সমস্ত ব্যাধিগ্রস্ত মানুষই সম্ভবত এখানে সুকুমারের আক্রমণের লক্ষ্য। মজা হল,

তন্ত্রসাধনা ইত্যাদিকে তিনি যেমন টেনে এনেছেন, তেমনি, ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বা অদ্বৈতবাদকে নিয়ে মস্করা করতেও তিনি পিছপা হননি। পরবর্তীকালের 'rampant…pessimism'-এর কোন পূর্বলক্ষণ এখানে পাওয়া যায় কিনা, তা ভেবে দেখা যেতে পারে। যাই হোক, 'খণ্ড', 'অখণ্ড', 'খণ্ডাখণ্ড', 'সমীক্ষা সাধন' ইত্যাদির সাহায্যে এমন এক মিশ্র ও নির্বিশেষ 'ভাষা' হয়ত তৈরী করতে চেয়েছিলেন সুকুমার যাতে একই সঙ্গে ধরা পড়বার কথা অনেকের।

দ্বিতীয় দৃশ্যে, সন্ধ্যাবেলায় সমীক্ষা মন্দিরের ভাবগম্ভীর পরিবেশে চক্রাচার্যের আসনে ঈশানবাবুকে দেখতে পাই। তিনি বলে চলেছেন তাঁর 'আত্মাঘুড়ি উধাও হয়ে শূন্যে উড়ে গোঁৎ খাওয়া'র অভিজ্ঞতার কথা। '…অন্ধকার যতই জমাট হয়ে উঠছে, ততই আমায় আস্তে আস্তে ঠেলছে আর বলছে, 'আছ নাকি? আছ নাকি?' আমি প্রাণপণে চিৎকার ক'রে বললাম—'আছি', কিন্তু কোন আওয়াজ হল না—খালি মনে হল অন্ধকারের পাঁজরের মধ্যে আমার শব্দটা নিঃশ্বাসের মতো উঠছে আর পড়ছে।' ভবদুলাল শিহরিত, 'উঃ বলেন কি মশাই?' ঈশান বলে চললেন, '…দেখলাম সৃষ্টির কারখানায় মালপত্রের হিসেব মিলছে না।…আমি চিৎকার করে বলতে গেলুম সর্বনাশ! সর্বনাশ! সৃষ্টিতে ভেজাল পড়েছে—কিন্তু কথাগুলো মুখ থেকে বেরোলই না। বেরোল খালি হাহা হাহা একটা বিকট হাসি। সেই শব্দে সমীক্ষা বন্ধন ছুটে গিয়ে সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করতে লাগল।'

ঈশানের এই 'সমীক্ষা'র পেছনে কোন বাস্তব অবলম্বন সুকুমারের কাছে প্রকৃতই ছিল কিনা সেটা গবেষণার বিষয়। কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছিয়েও আপাততঃ পাশাপাশি দুটো উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া যেতে পারে। প্রথমটি 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' থেকেঃ '…আমার মত রূপ একজন আমার শরীরের ভিতরে প্রবেশ কল্লে। আর ষট্‌পদ্মের প্রত্যেক পদ্মের সঙ্গে রমণ করতে লাগল।…এই রূপে মূলাধার, সাধিষ্ঠান, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাপদ্ম, সহস্রার সকল পদ্মগুলি ফুটে উঠল। আর নীচে-মুখ ছিল উর্ধ্ব-মুখ হলো, প্রত্যক্ষ দেখলাম' (৩য় ভাগ, পৃঃ ১৯৮)। দ্বিতীয়টি 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ' থেকেঃ 'স্বামীজী আসনে বসিবার অল্পক্ষণ পরেই একেবারে স্থির শান্ত নিস্পন্দ হইয়া সুমেরুবৎ অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন…প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে…শিব শিব বলিয়া ধ্যানোত্থিত হইলেন। (বলিলেন) …ধ্যান গভীর হইলে কত কি দেখতে পাওয়া যায়। বরানগরের মঠে ধ্যান করতে করতে একদিন ঈড়া পিঙ্গলা নাড়ী দেখতে পেয়েছিলুম' (বিবেকানন্দ রচনাবলী, নবম খণ্ড, পৃঃ ২৪২)। এই রকম কোন আসরে উপস্থিত থাকলে ভবদুলাল কি করত আমরা জানি না, তবে নাটকে ঈশান থামতে না থামতে সে সোৎসাহে বলতে শুরু করেছে, তারপর '…সেই যে লোকটা ভেজাল দিয়েছে সেই ভেজাল ক্রমাগতই ঠেলে উপরে উঠতে চাচ্ছে। উঠতে পারছে না, আর গুমরে গুমরে ফেঁপে উঠছে। আর কে যেন ফিস ফিস করে বলছে—'শেক দি বট্‌ল্, শেক দি বট্‌ল্'—সত্যি।'

সোমপ্রকাশ হঠাৎ একবার 'একদিকে হেরিডিটি আর একদিকে এনভাইরণমেণ্ট—এই দুয়ের প্রভাব' নিয়ে 'খুব বিজ্ঞের' মত স্বগতোক্তি করেছিল। 'শ্রুতি বা আপ্তবাক্যের আশ্রয়'টুকু নিয়ে সে নিশ্চিত ভেবেছিল 'ঐ সকল তত্ত্বের সহিত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইল' ('ভাষার অত্যাচার')। তারপর আশ্রমের 'নিরিবিলি' আলাপের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবার বিপদটা কোথায় সেটা বোঝবার জন্য সে হার্বার্ট স্পেন্সারের ভারী একটা মতের উল্লেখ ক'রে ভবদুলালকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি হার্বার্ট স্পেন্সারকে জানেন তো?' সোমপ্রকাশের কাছে 'জানা'র অর্থই চিন্তাহীন-ভাবে 'মানা'। তার প্রশ্নের সুরেও সেটা ছিল। তাই ভবদুলাল বলল, শুধু হার্বার্ট বা স্পেন্সার কেন, 'হাঁচি টিকটিকি ভূত প্রেত'—সব কিছুই সে 'মানে'। এই প্রসঙ্গে একটা কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য এখানে উল্লেখ করা যায়। স্পেন্সারের যে মন্তব্য সোমপ্রকাশ উল্লেখ করেছিল তা হল, '...বিপদ মারাত্মক হয় সেখানে, যেখানে তার অন্তর্গূঢ় ভাবটিকে তার বাইরের কোন অবান্তর রূপের দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখা হয়।' অন্যদিকে সুকুমারের 'হিজিবিজি খাতা'র এক পৃষ্ঠাতেও চোখে পড়ছে একটা অসম্পূর্ণ উদ্ধৃতি, 'Fundamental ideal obscured by false analogies'। এবং তার পরেই, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ক্ষেত্রেও যে এটা সর্বতোভাবে প্রযোজ্য এই মর্মে, বন্ধনীর ভিতরে ছিল তাঁর নিজের মন্তব্য, 'This is true of practically all the various ideals of the S.B.S'।

তৃতীয় দৃশ্যে, শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রমে সত্যবাহন-সমভিব্যাহারে ভবদুলাল এসে হাজির। আশ্রমে তখন 'সেমি সার্কল' হয়ে ছাত্ররা দাঁড়িয়ে। শ্রীখণ্ডদেব টেবিলের উপরে বড় বড় বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। ঘরের একপাশে অদ্ভুত যন্ত্র, অর্থহীন চার্ট। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে একটা বিজ্ঞান-বিজ্ঞান গন্ধ।

সত্যবাহন ছাত্রদের একজনকে পাঠ্যসূচী জিজ্ঞেস করায় সে গড়গড়িয়ে বলতে থাকে, '...শব্দার্থ খণ্ডিকা, আয়স্কন্ধ পদ্ধতি, লোকাষ্ট প্রকরণ, সিম্নেকস কসমোপোডিয়া, পালস একস্ট্রাসাইক্লিক ইকুইলিব্রিয়াম অ্যাণ্ড দি নেগেটিভ জিরো—।' ১৯১৫ সালে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে'র পাঠ্যসূচী বা ঐ জাতীয় কিছু এখানে সুকুমারের ভাবনায় আদৌ ছিল কিনা জানা নেই। তবে 'তত্ত্বকৌমুদী' (২রা সেপ্টেম্বর, ১৯১৫) থেকে আংশিক উদ্ধৃতি হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে নাঃ সিনিয়র ক্লাসের পাঠ্য ছিলঃ (১) ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য,, শ্বেতাশ্বতর, ঐতরীয়, তৈতরীয় উপনিষদ... (২) ভগবদ্গীতা (৩) New Testament (৪) Philosophy of Brahmoism (৫) Two Essays on General Philosophy and Ethics (৬) ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা (৭) History of the Brahmo Samaj" ইত্যাদি। হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের এক প্রশ্নের জবাবে সুকুমার একবার বলেছিলেন 'জীবনের আদর্শ' হল 'সিরিয়াস ইণ্টারেস্ট ইন লাইফ' ('পরিচয়ের কুড়ি বছর', হিরণকুমার সান্যাল)। সভাবত তাঁর মতন একজন সুস্থ জীবনবোধসম্পন্ন মানুষের কাছে 'ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে'র ঐ জীবন-বিমুখ পাঠ্যসূচী যদি কখনো কার্যত শ্রীখণ্ডদেব-দের আশ্রমের পাঠ্যসূচীর মতনই কৌতুকপ্রদ, উদ্ভট

মনে হয়ে থাকে তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

লক্ষনীয়, 'সাম্যসিদ্ধান্ত সভা'র চাইতে যে বিশেষ কারণে শ্রীখণ্ড শ্রেষ্ঠত্ব ও অভ্রান্তির দাবিদার সেটা হল তাঁর 'বিজ্ঞান'-সম্মত সাধনপ্রণালী। 'আশ্রমে'র পাঠ্যসূচীতেও তার প্রকাশ ছিল। আমরা জানি এক সময় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষদের কাছে হিন্দুধর্মকে গ্রহণযোগ্য ক'রে তোলার জন্য শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ নব্যহিন্দু-আন্দোলনের নায়কেরা প্রায় প্রতি পদক্ষেপে, এমনকি 'টিকি-তত্ত্ব ও গঙ্গাজল-মাহাত্ম্যের সমর্থনেও' ('দৈবেন দেয়ম'—সুকুমার রায়) টেনে এনেছিলেন বিজ্ঞানকে। দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার প্রসঙ্গে 'হাঁচি টিক-টিকি' 'মানা' নিয়ে ভবদুলালের ঘোষণায় এর প্রতি কটাক্ষ ছিল। এসব নিয়ে প্রচুর ঠাট্টা বিদ্রূপ আছে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রহসনে, কবিতায়। ১৯১০ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'নবীন সন্যাসী' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবার সময় পাঁচটি সংখ্যায় ছবি এঁকেছিলেন সুকুমার। সেখানেও ছিল এক 'Society for the Propagation of Electrical Hinduism'-এর কাহিনী। আতপ চালের দাম বেড়ে যাবার জন্য বাচস্পতি মশাইকে বাধ্য হয়ে সিদ্ধচাল ধরতে হ'তে পারে শুনে 'Society'-র কয়েকজন সভ্য 'সমস্বরে' ব'লে উঠেছিল, "সর্বনাশ! সর্বনাশ! তা করবেন না বাচস্পতি মহাশয়, আপনার শরীরের ইলেকট্রিসিটি কমে যাবে" (প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩১৭)। যে ভঙ্গিতে শ্রীখণ্ড 'বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী'র কথা বলেছেন তার ভিতরে সুকুমারের কথায় বলতে গেলে রয়েছে একটা 'চূড়ান্ত মীমাংসার ভড়ং' ('ভাষার অত্যাচার')। 'ভাষার অত্যাচারে' সুকুমার লিখেছিলেন, 'এক একটা কথার ধুয়া আমাদের স্বাভাবিক চিন্তাশক্তিকে আড়ষ্ট করিয়া দেয়।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেছিলেন, লোকে "সনাতন ধর্মের নজীরকে অর্থাৎ ঐ 'সনাতন' শব্দটার নজিরকে এমন অকাট্যভাবে মনের সম্মুখে দাঁড় করায়, যেন ইহার উপর আর কথা বলা চলে না।" এখানেও তাই। 'প্রণালী' নয় 'বিজ্ঞান' শব্দটিকেই শ্রীখণ্ড 'অকাট্য' করে তুলতে চেয়েছে। যেমন করেছে 'হ য ব র ল'-র কাক্কেশ্বর কুচকুচে। তার বিজ্ঞাপনপত্রে 'সকল প্রকার গণনার কার্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন' হবার দাবির কথা নিশ্চয় মনে পড়ে যাবে।

চতুর্থ দৃশ্যে, সত্যবাহন, ঈশান, সোমপ্রকাশ মিলে যখন শ্রীখণ্ডবাবুদের দলে ভবদুলালের ভিড়ে যাবার-কথা আলোচনা করছে সেই মুহূর্তে 'আশ্রমে' তুলকালাম বাধিয়ে, আসার আগে 'একটা ছেলের কান মলে' দিয়ে 'টুইঙ্কল্ টুইঙ্কলে'র সুরে ঈশানের এক গান গাইতে গাইতে স্বয়ং ভবদুলাল ফের হাজির। লক্ষণীয়, আগের তিনটি দৃশ্যেই ভবদুলালের ভূমিকা ছিল পরোক্ষ, শুধুই উন্মোচনের। জিজ্ঞাসু মানুষ হিসেবে সে ঢুকে পড়েছিল দুই বিবদমান দলের ভিতরে এবং নেহাৎই হাঁদা-গঙ্গারামের মতন একটি দুটি মন্তব্য বা প্রশ্ন ক'রে তাদের বড় বড় অন্তঃসারশূন্য ভাব, তত্ত্ব ও পণ্ডপাণ্ডিত্যকে অনায়াসেই চুপসে দিয়েছিল। কিন্তু চতুর্থ দৃশ্যে তার ভূমিকা, এক কথায় বলা যায়, বিধ্বংসী। এর আগে একটু আধটু করে আঁচ করা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু এখানেই প্রথম তার 'madness'-এর ভিতরে সুস্পষ্ট 'method'-এর আভাস

পাওয়া গেল।

ভবদুলাল আশ্রমে এক দূরবীণ দেখে এসেছে, "তার এমন তেজ যে চাঁদের দিকে তাকালে চাঁদের গায়ে সব ফোস্কা ফোস্কা…পড়ে যায়।" সোমপ্রকাশের মতে, ওরা ভালোমানুষ পেয়ে সাপ বোঝাতে ব্যাং বুঝিয়েছে। এই 'ব্যাং'-এর সূত্র ধরে ভবদুলাল কাউকে 'কোলাব্যাং', কাউকে 'হাঁ-করা বোয়াল মাছ', কাউকে 'ডাবাহুঁকো' বলে চিহ্নিত করেছে ; সহ্য করতে না-পেরে সত্যবাহন বলে ওঠেঃ 'মশায় আপনি ওখানে ছিলেন—বেশ ছিলেন। আবার আমাদের হাড় জ্বালাতে এলেন কেন?' 'This is not altogether Fool, My lord'—কিং লিয়ার নাটকে 'Fool' সম্পর্কে কেণ্টের এই মন্তব্যই হয়ত সত্যবাহনের মনের কথা।

পরিস্থিতি এর পর আরো ঘোরালো হল যখন ভবদুলালের 'চলচিত্তচঞ্চরি'র পাণ্ডুলিপি চোখে পড়ল সবার। 'চলচিত্তচঞ্চরি'র আয়নায় যা ধরা পড়েছে সেটাই সত্যবাহন ও শ্রীখণ্ডদেব-দের আসল রূপ। নিজেদের অস্তিত্বকে এমন উদ্ভট ও অর্থহীন বলে স্বীকার করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। তাই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির সমান ভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে আয়নাটাকেই ভেঙ্গে ফেলতে চায়। আগেই এর তেইশটা পাতা ছিঁড়ে দিয়েছিলেন শ্রীখণ্ডবাবু। এবার 'সাম্যসিদ্ধান্ত সভা'র সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ে খাতার উপর। বাকী পাতাগুলোও গেল। তবে "খাতা ছিঁড়ে দিয়েছেন তো কী হয়েছে।" সে আবার লিখবে 'চলচিত্তচঞ্চরি'। সত্যবাহনদের 'সামঘণ্ট আর সিদ্ধান্ত-বিসূচিকা' তখন 'কোথায় লাগে' দেখা যাবে।

আমরা অবশ্য জানি, কোনদিনই শেষ অব্দি লেখা হবেনা 'চলচিত্তচঞ্চরি'। সর্বত্র ও সর্বসময়ে ছড়িয়ে থাকা সত্যবাহন আর শ্রীখণ্ডের দল বারবারই একে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিতে চাইবে। তবুও অদম্য ভবদুলাল আবার সত্য উন্মোচন করবে। 'আবার' লিখবে। 'আবার'।

অপ্রকাশিত 'হিজিবিজি খাতা'র অংশবিশেষ ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন শ্রীসত্যজিৎ রায়। তাঁর কাছে লেখক কৃতজ্ঞ।



আমাদের মনডে ক্লাব

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

আজকাল যেমন কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে, এমনকি, কলিকাতার বাহিরে গ্রামাঞ্চলেও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, এই বিংশ শতকের প্রারম্ভে বঙ্গ সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল এই কলিকাতা নগরীতে তাহার তেমন রেওয়াজ ছিল না। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়া জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে একটি এরূপ আসরের কথা শুনা যায়। সেখানে ফরাসী সাহিত্যে সুপণ্ডিত, রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুরাগী প্রিয়নাথ সেন, সাহিত্যিক অক্ষয় চৌধুরী, রসিকপ্রবর লোকেন্দ্রনাথ পালিত প্রভৃতির নিয়মিত বৈঠক বসিত। পরে বিংশ শতকের প্রারম্ভে সাহিত্য ও শিল্পসেবী মহলে ঘরোয়াভাবে কোনও এক সাহিত্য বন্ধুর ঘরে কিংবা কোনো এক সাময়িক পত্রিকার আফিসে কিংবা পর্যায়ক্রমে সদস্যবৃন্দের গৃহে বৈঠক বসাইয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি পরিচালনের রেওয়াজ ধীরে ধীরে দেখা দিতে আরম্ভ করে। এই শ্রেণীর বৈঠক 'মুনা' আফিসের বৈঠক 'মানসী'র বৈঠক, 'ভারতী'র বৈঠক, প্রভৃতির সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা ইতিপূর্বে হইয়াছে, এবং সুসাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায় এরূপ কতকগুলি বৈঠক ও গজেন্দ্রকুমার ঘোষের গৃহের বৈঠকের সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন এবং 'আমি যাদের দেখেছি' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বেশ হৃদয়গ্রাহী বিবরণ আছে। কিন্তু আমাদের কৈশোরকালে সুপ্রসিদ্ধ শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায়ের চেষ্টায় স্থাপিত 'ননসেন্স ক্লাব' ও 'মনডে ক্লাব' সম্পর্কে তেমন কোনও পরিচয় এ পর্যন্ত বাহির হয় নাই। অবশ্য শোনা কথার উপর নির্ভর করিয়া এসম্পর্কে অন্যত্র যে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে তাহা ভুলে ভরা।

সুকুমারের পত্নী সুপ্রভা দেবীর মৃত্যু উপলক্ষে তাঁহার পরিচয় দিতে গিয়া জনৈক লেখক লিখিয়াছেন যে সুপ্রভা দেবী শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় প্রতিষ্ঠিত 'মনডে ক্লাবে'র উৎসাহী সদস্যা ছিলেন। বলা বাহুল্য সংবাদ দুইটিই ভুল। মনডে ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা গিরিজাবাবু নহেন, তিনি মাত্র কয়েক বৎসর উক্ত ক্লাবের সদস্য ছিলেন সত্য, কিন্তু ক্লাব সংগঠন ও স্থাপন করেন সুকুমার রায়। এই ক্লাবে কোনো নারী সদস্য কখনও ছিলেন না, সেজন্য সুপ্রভা দেবীও কোনও দিন সদস্যা হন নাই। এই মনডে ক্লাব প্রকৃতপক্ষে সুকুমার রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ননসেন্স ক্লাবেরই বর্ধিত রূপ। রায় পরিবারের লোকজন ও পরিবারের নিকট আত্মীয়গণকে লইয়াই ঘরোয়াভাবে সুকুমার ননসেন্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার নিয়মিত বৈঠক বসিত সুকুমার রায়ের বাটি বাইশ নম্বর সুকিয়া ষ্ট্রিটে। নানারূপ আলোচনা সংগীতের আসর, ক্লাবের জন্য রচিত সুকুমার রায়ের ব্যঙ্গ নাটকের অভিনয়, হস্তলিখিত সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা' প্রকাশ প্রভৃতি এই ক্লাবের কার্যপ্রণালীর অঙ্গীভূত ছিল।

সদস্যদের অভিনয়

এই ক্লাবের সদস্যগণ যে অভিনয় করিতেন তাহা আত্মীয়স্বজনের সম্মুখে অভিনীত হইত। 'ঝালাপালা', 'অবাক জলপান', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'চলচিত্ত চঞ্চরী', ও 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম' অভিনয়ার্থে সুকুমার রচনা করেন। অধুনা সিগনেট প্রেস হইতে 'ঝালাপালা' নামে এই নাটকগুলি একত্রে গ্রথিত হইয়া লোকরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছে। এগুলি ব্যতীত এই ক্লাবের সদস্য সুকুমারের পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায় রচিত ও 'সখা ও সাথী' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত 'কেনারাম ও বেচারাম' অভিনয় আরম্ভ করেন। সেই অভিনয় দর্শকদের খুব মনোরঞ্জক হওয়াতে সুকুমার ক্লাবের জন্য নূতন নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এগুলি রচনা করেন। লেখার পর অভিনয়ের পূর্বে ক্লাবের মাসিক পত্রিকা 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'য় এগুলি প্রকাশিত হয়। হস্তলিখিত এই পত্রিকাগুলি সুকুমারের সহধর্মিণী অতি যত্ন সহকারে রাখিয়াছিলেন বলিয়া এগুলি বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। ওই পত্রিকা হইতে কপি করিয়া 'ঝালাপালা' বাহির করা সম্ভব হইয়াছে। 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'য় সুকুমারের লেখা ব্যতীত অন্য সভ্যদেরও লেখা প্রকাশিত হইত। তবে সেগুলি ছদ্মনামেই প্রকাশ লাভ করিত।

উদ্ভট নাম দেন সুকুমার রায়

ক্লাবের প্রতিটি সদস্যেরই এক একটি উদ্ভট নাম ছিল এবং সেগুলির উদ্ভবকর্তা স্বয়ং সুকুমার রায়। উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটি নামের উল্লেখ করিতেছি যথা— 'মঙ্গলা মাসোরার গোচ্ছো' 'জাপানর্মা সাবানসোর' 'স্লাইফক্স মেটেহেন' 'মাখনলাল ভজুয়া' প্রভৃতি। অবশ্য এই সমস্ত নামকরণের পশ্চাতে সদস্যগণের জানিত এমন কারণ সব বর্তমান ছিল যে সকলেই নামগুলিকে খুব সুপ্রযুক্ত মনে করিতেন। সম্ভবত

পত্রিকার ফাইল সুকুমারের পুত্র বিখ্যাত চলচ্চিত্রশিল্পী সত্যজিৎ রায়ের নিকট এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে।

'অনুপ্রাসের অনুক্রোণ'

সুকুমার 'শ্রীশ্রীবর্ণমালা তত্ত্ব' নামে অনুপ্রাসের খেলায় কবিতা রচনা আরম্ভ করিয়া শেষ অক্ষর পর্যন্ত এরূপ অনুপ্রাসের খেলা খেলিতে ইচ্ছা তাঁহার ছিল। তাঁহার পূর্বে গদ্যে কেহ কেহ এরূপ রচনার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং অধ্যাপক ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এরূপ গদ্য রচনার জন্য যথেষ্ট প্রশংসিত হইয়াছেন, কিন্তু সুকুমারের এই পদ্যে অনুপ্রাসের ছটা সম্পূর্ণ হইলে যে কি অনবদ্য রচনা হইত তাহার সামান্য পরিচয়ের জন্য চ বর্গ পর্যন্ত তিনি যতটুকু পদ সমাপ্ত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতে কিছু ছিছু তুলিয়া দিতেছি। যেমন 'ঙ' বর্গ লইয়া রচনা অত্যন্ত কঠিন। সুকুমার লিখিয়াছেন—

বিকল অঙ্গ, ভগ্ন জঙ্ঘ, এ কোন
পঙ্গু মুনি ?
কেন ভাঙা ঠ্যাঙে ডাঙায় নামিল
বাঙলা মুলুকে শনি ?
রাঙা আঁখি জ্বলে, চাঙা হয়ে বলে,
ডিঙাব সাগর গিরি,
কেন ঢঙ ধরি, ব্যাঙাচির মতো
ল্যাঙুল জুড়িয়া ফিরি।

আর একটি সম্পূর্ণ অংশ 'ক' বর্গ হইতে তুলিয়া দিলে পরে এই রচনাটি কত অনবদ্য ও কত উচ্চ শ্রেণীর হইয়াছিল, ভাষার উপর সুকুমারের কিরূপ দখল ছিল, সে সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত হইবে—

আয় নেমে আয় কণ্ঠ বর্ণে
কাকুতি করিছে সবে,
আয় নেমে আয় কর্কশ ডাকে
প্রভাত কাকের রবে।
নমো নমো নমো সৃষ্টি প্রথম
কারণ জলধি জলে
স্তব্ধ তিমিরে প্রথম কাকলি
প্রথম কৌতুহলে,
আদিম তামসে প্রথম বর্ণ
কনক কিরণমালা,

প্রথম ক্ষুধিত বিশ্বজঠরে
প্রথম প্রশ্ন জ্বালা।
কহে কই কেনো, কোথায় কবে গো
কেন বা কাহারে ডাকি?
কহে কহ কহ কেন অহরহ
কালের কবলে থাকি?
কহে কানে কানে করুণ কুজনে
কল কল কত ভাসে,
কহে কোলাহলে, কলহ-কুহরে
কাষ্ঠ কঠোর হাসে।
কহে কটমট কথা কাটা কাটা
কে ও কেটা কহ কারে?
কাহার কদর কোকিল কণ্ঠে
কুন্দ কুসুম হারে?
কবি কল্পনে কল্পকলায়,
কাহারে কচ্ছি সেবা?
কুবের কেতনে, কুঞ্জ কাননে
কাঙাল কুটিরে কেবা?
কায়দা কানুনে কর্মে কারণে
কীর্তি কলাপ মূলে,
কেতাবে, কোরানে, কাগজে কলমে
কাঁদাবে কেরাণী কুলে?
কথা কাঁড়ি কাঁড়ি কত কানাকড়ি,
কাজে কচু কাঁচকলা
কভু কাছা কোছা কোর্তা কলার
কভু কৌপীন ঝোলা।
কুটিলে কৃপণে, কুৎসা কথনে,
কুলীন কন্যাদায়ে
কর্মক্লান্ত কালিমাক্লান্ত ক্লিষ্টকাতর কায়ে
কলে কৌশলে কপাট কোঁদলে
কঠিনে কোমলে মিঠে
কেন্দ্র কুৎসিত, কুষ্ঠ কলুষ
কিলবিল কৃমি কীটে।
'ক' এর কাঁদনে কাংসক্বণনে
বস্তু চেতন জাগে,

অকাল ক্ষুধিত খাই খাই রবে
বিশ্বে তরাস লাগে।
আকাশ অবধি ঠেলিয়া জলধি
খেয়াল জেনেছে খ্যাপা।
কারে খেতে চায়, খুঁজে নাহি পায়,
দেখ কি বিষম হ্যাঁপা,
(খালি) কর্তালে কভু কীর্তন খোলে ?
খোলে দেও চাঁটি পেটা।
নামাও আসরে ক-এর দোসরে
সেঁদালো সেঁদালো সেটা।

ইহার পর খ বর্গের আরম্ভ। এক বর্ণ হইতে পর বর্ণে গমন ও কেমন সুকৌশলে নিপুণভাবে গ্রন্থনে সুকুমার সফল হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিতে আশ্চর্য লাগে। এই কঠিন কার্য যেটুকু তিনি শেষ করিতে পারিয়াছেন তাহা হইল স্বরবর্ণের অ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যঞ্জন বর্ণের 'চ' পর্যন্ত স্বরবর্ণ শেষ করিয়া ব্যঞ্জন বর্ণের আরম্ভ এই প্রকার করিয়াছিলেন—

শাস্ত্র বিধান কর প্রণিধান,
ওরে উদাসীন অন্ধ,
ব্যঞ্জন স্বরে যেন হরি হরে
কোথাও রবে না দ্বন্দ্ব।
মরমে মরমে সরমপরশে
বাতাস লাগিল হাড়ে,
ভাষার প্রবাহে পুলক কম্পে
জড়ের জড়তা ছাড়ে।
(তবে) আয় নেমে আয়, জড়ের সভায়
জীবনমরণ দোলে
আর নেমে আয় ধরণী ধূলায়
কীর্তন কলরোলে।

ইহার পর কণ্ঠ্য বর্ণের আরম্ভ। তাহা পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। কত কঠিন এই কাজ, কাজে কাজেই অতি ধীরে ধীরে রচনা অগ্রসর হইতেছিল। যতটুকু রচিত হইত তাহা আমাদের আসরে শুনাইতেন। আমরা নির্বাক বিস্ময়ে সুকুমারের ভাষা ও ছন্দের উপর দখল উপভোগ করিতাম। রচনা 'চ' অবধি অগ্রসর হওয়ার পর নানা কাজের চাপে উহা বন্ধ থাকে। সুবিধামত সময়ে উহাকে সম্পূর্ণ করিবার তাঁহার ইচ্ছা সফল হয় নাই। অর্ধ সমাপ্ত এই রচনা তাঁহার আশ্চর্য ক্ষমতার নিদর্শন হইয়া আছে। আর একটি কীর্তির সূচনা এই ননসেন্স্ ক্যাবেই ঘটে। বিলাতী 'ননসেন্স

রাইম'-এর অনুসরণে কবিতা রচনা আরম্ভও এই 'সাড়ে বত্রিশ ভাজায়'। সেগুলি ও আরও কতকগুলি সন্দেশের জন্য লিখিত কবিতা সংযোজিত করিয়াও তাহা চিত্রিত করিয়া সুকুমারের অনবদ্য রচনা 'আবোল তাবোল' পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

পোর্ট আর্থার ডিনার

এই ক্লাবের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা হইল, জাপান কর্তৃক পোর্ট আর্থার জয়ের পর শক্তিধর পাশ্চাত্য রাষ্ট্র রাশিয়ার প্রাচ্যের এক ক্ষুদ্র জাতি জাপানের নিকট এরূপ পরাজয় এশিয়া নবজাগরণের দ্যোতক জ্ঞানে ক্লাবের সদস্যবর্গ উৎসাহের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী স্ট্রীটের সমবায় বিল্ডিংয়ে তৎকালস্থিত ইম্পিরিয়াল হোটেলে পোর্ট আর্থার ডিনার দ্বারা উৎসব সম্পাদন। ক্লাবের সদস্যগণ অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল, ভবে পদ্মপত্রের জল, সদা কর্চ্ছি টলমল' গানটি গাহিতেন। এইটিকে তাঁহারা ক্লাবের প্রতীকী সংগীত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সদস্যগণ পরম উৎসাহে ক্লাবের অধিবেশনে যোগ দিতেন এবং উহার মাধ্যমেই তাঁহাদের মনে সাহিত্য রসের স্ফুরণ ঘটে। কয়েক বৎসর চলার পর কয়েকজন সদস্য কার্যব্যপদেশে কলিকাতা ত্যাগ করিলে, এবং কতিপয় সদস্যের অকাল মৃত্যু ঘটিলে বাহিরে বন্ধুমহল হইতে সদস্য সংগ্রহের তাগিদ অনুভূত হয় এবং সেজন্য ক্লাবের কাঠামোও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া ননসেন্স ক্লাব 'মনডে ক্লাব'-এ রূপান্তরিত হয়। সদস্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সদস্যগণ অনুভব করিলেন যে ক্লাবের অধিবেশন কেবলমাত্র সুকুমার রায়ের গৃহে হইলে তাঁহার উপর অত্যাচার করা হয়, কেননা, ক্লাবের একটি চলতি আচার প্রায় নিয়মে পর্যবসিত হইয়াছিল যে, অধিবেশনের হয় পূর্বে, না হয় পরে সদস্যগণকে ভুরিভোজনে আপ্যায়িত করা। সেজন্য স্থির হয় পর্যায়ক্রমে সদস্যদের বাড়িতে অধিবেশন বসিবে, কবে কাহার বাড়িতে অধিবেশন বসিবে তাহা সুকুমার ঠিক করিয়া পত্র মারফৎ সদস্যগণকে জানাইবেন। যাঁহার গৃহে অধিবেশন হইবে তিনি সদস্যগণ ব্যতীত নিজের ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুসারে বাহির হইতে সুধীজনকে আমন্ত্রিত করিতে পারিবেন।

সদস্যদের তালিকা

পরিবর্ধিত এই ক্লাবের প্রাথমিক সদস্য ছিলেন সুকুমার রায়, তাঁহার দুই ভ্রাতা সুবিনয় ও সুবিমল, আমি (প্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলী), অমলচন্দ্র হোম, হিতেন্দ্রনাথ বসু, ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, শিশিরকুমার দত্ত, কালিদাস নাগ, প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ, হিরণকুমার সান্যাল, শ্রীশচন্দ্র সেন, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, অতুলপ্রসাদ সেন, গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী, ধীরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত ও জীবনময় রায়। কালিদাস নাগের আহ্বানে, তাঁহার মাতুলের আলয় আলিপুরে জুলজিক্যাল সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত গৃহের প্রাঙ্গণে ওই গৃহে অধিবেশনের

পূর্বে একটি আলোকচিত্র গৃহীত হয়। ক্লাবের সদস্যগণের একত্রে গৃহীত সেইটি একমাত্র আলোকচিত্র। অতুলপ্রসাদ সেন লক্ষ্ণৌতে প্রত্যাবর্তন করিলে ও গিরিজাশঙ্কর আসা বন্ধ করিলে কিরণশঙ্কর রায়, কুমুদশঙ্কর রায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সদস্যরূপে ক্লাবে মনোনীত হইয়া যোগদান করেন। তখন কিরণশঙ্কর রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই; প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। এরূপ গুণীজন সমাবেশে আলোচনা সে অত্যন্ত উচ্চদরের ও খুব হৃদয়গ্রাহী হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে মধ্যে মধ্যে এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাও হইত, যাহার মর্ম সকলের বোধগম্য হইত না। আমার এরূপ একটি ঘটনা বেশ মনে আছে। তখন ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ সবেমাত্র সংখ্যাতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। উহার রস আমাদের ন্যায় অভাজনের কাছে পরিবেশনের মহৎ উদ্দেশ্যে প্রশান্তচন্দ্র আমার গৃহেরই এক অধিবেশনে 'ইফ প দেন কিউ' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধে নাকি সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তি লইয়া আলোচনা ছিল। সম্ভবত তাহা গভীর অনুশীলনের ফল, কিন্তু আমরা অনেকেই তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিনি। অতুলবাবুর গৃহের অধিবেশনে অতুলবাবুর রচিত গান সুকণ্ঠে এবং তাহার অতিথি সুবিখ্যাত কবি হরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গীত হইয়া আমাদের আনন্দ বর্ধন করিত। হরীন তখন খুবই অল্পবয়সী। তখন সবেমাত্র সংগীতচর্চা ও কবিতা রচনা শুরু করিয়াছেন। তবে সেই সময়েই তাঁহার সংগীত প্রতিভা যে উচ্চাঙ্গের তাহার পরিচয় পাইয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমার গৃহে অতিথিরূপে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম ও অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে ভিন্ন বৈঠকে উপস্থিত থাকিয়া, শরৎবাবু আলোচনায় যোগ দিয়া এবং নজরুল ও কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া সদস্যদের আনন্দবর্ধন করিয়াছিলেন। বৈঠকের সম্পাদকরূপে শিশিরকুমার দত্ত নির্বাচিত হইয়া অধিকারী নাম গ্রহণ করিলেও সুকুমার কবে কাহার গৃহে অধিবেশন হইবে স্থির করিয়া সদস্যগণকে আমন্ত্রণলিপি প্রেরণ করিতেন। তাঁহার প্রতিটি আমন্ত্রণ লিপি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর ছিল।

বিচিত্র আমন্ত্রণলিপি

এই বিচিত্র আমন্ত্রণলিপিগুলি যেমন রসপূর্ণ তেমনই অভিনব। আমার সংগ্রহে এখনও যে দুই চারিটি লিপি আছে তাহা হইতে সুকুমারের রস সৃষ্টি করিবার অপূর্ব ক্ষমতার এক নূতন পরিচয় লাভ করা যাইবে—যেমন সাহিত্যালোচনায় তেমনই ভোজনে সদস্যগণের সমান উৎসাহ ছিল। সুকুমার তাঁহার এক আমন্ত্রণলিপিতে তাই রহস্য করিয়া লিখিয়াছিলেন ঃ

কেউ বলেছে খাবো খাবো
কেউ বলেছে খাই,
সবাই মিলে গোল তুলেছে
আমি তো আর নাই।

চুটকু বলে রইনু চুপে
কমাস ধরে কাহিল রূপে
জংলি বলে রামছাগলের
মাংস খেতে চাই।
যত বলি সবুর কর,
কেউ শোনে না কালা।
জীবন বলে কোমর বেঁধে
কোথায় লুচির থালা।
খোদন বলে রেগে মেগে
ভীষণ রোষে বিষম লেগে
বিষ্যুৎবারে গড়পারেতে
হাজির যেন পাই।

একবার সম্পাদক শিশিরকুমার কার্যোপলক্ষে পাটনা গিয়াছিলেন, অমনি নিমন্ত্রণ-পত্রে বাহির হইল, 'হায়! হায়, সম্পাদক হারাইয়া গিয়াছেন, নতুবা তহবিল তছরূপ করিয়া পলাতক হইয়াছেন। সদস্যগণ গড়পারে হাজির হইয়া কিংকর্তব্য যেন নির্ধারণ করেন।' সেই সময়ে শিশিরবাবু গ্রেসাম ইন্সুরেন্সে কোম্পানীর বাঙলা বিহারের সংগঠক ছিলেন। তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া পত্রটির এককোণে লেখা হইল **'Insure with Gresham at once.'**

আর একটি পত্র ছিল—

'একদা নিশীথে সম্পাদক গোবেচারা
পোঁটলাপুঁটলী বাঁধি হইলেন দেশছাড়া।
অনাহারী সম্পাদকী হাড় ভাঙা খাটুনী সে
জানে তাহা ভুক্তভোগী
অপর বুঝিবে কি সে?
ক্লাবের সকল সভ্যে বেশ দিয়া ফাঁকি
বেচারা ভাবিল মনে—
বিদেশে লুকাইয়া থাকি।
এদিকেতে ক্রমে ক্রমে মাস সব হয় শেষ
নোটিশ দিলাম কত সম্পাদক নিরুদ্দেশ।
সভ্যগণ দলে দলে রুষিয়া কহিল তবে
জ্যান্ত হোক, মৃত হোক ব্যাটারে ধরিতে হবে।
একদা কেমনে জানি সম্পাদক মহাশয়।
পড়িলেন ধরা—আহা দুরদৃষ্ট অতিশয়।
তারপরে কি ঘটিল, কি করিল সম্পাদক
সে সকলের বিকিরণে নাহি কোনো আবশ্যক।

মোটকথা হতভাগ্য সম্পাদক অবশেষে।
বসিলেন আপনার প্রাচীন গদিতে এসে।'

এই কবিতাটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে সিগনেট প্রেস হইতে প্রকাশিত 'বর্ণমালা তত্ত্বে' প্রকাশিত হইয়াছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথও ক্লাবের ভোজনবিলাসের কথা স্মরণ করিয়া একটি অনবদ্য কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি তাঁহার তিরোভাবের পর প্রকাশিত একটি কবিতাপুস্তকে সেটি প্রকাশিত হইয়াছে, যেমন তাঁহার সাঁতার ক্লাবের বর্ণনা 'জলক্লাবের জলসায়' কবিতাটি পরে 'বিদায় বেলার গান' পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতাটি সবটা আমার স্মরণে নাই, তবে এই লাইন কটি মনে আছে—

'আমাদের মণ্ডে সম্মেলন,
হায়রে আমাদের মণ্ডা সম্মেলন।
চারুবাবুর দধি,—কারু ঘোলের নদী
জংলি ভায়ার সরবতে মন মাতাল
অদ্যাবধি ইত্যাদি।'

চারুবাবু জাফরান ও অন্যান্য কতিপয় মসলা সহযোগে হরিদ্রাবর্ণের একপ্রকার দধি করিতেন, এইটি তাঁহার খাদ্য-তালিকার বৈশিষ্ট্য ছিল। সুনীতিবাবুর নানা প্রকার ঘোলের সরবতে সকলের মন পরিতৃপ্ত হইত। আমার বাড়ির বিশেষত্ব ছিল নানা প্রকার সরবৎ ও পেস্তা বাদাম প্রভৃতির সহযোগে চিড়া ভাজা ও নানাপ্রকারের পিঠাগুলি। অধিবেশনের জন্য বাড়ির মেয়েরা অতি পরিশ্রমের সহিত এসব খাদ্য প্রস্তুত করিতেন। সুকুমারগৃহিণী নানাপ্রকার রন্ধনে অতিশয় নিপুণা ছিলেন এবং নানাপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিয়া সম্মানিত অতিথিদের আপ্যায়ন করিতেন। প্রত্যেকেই বাড়িতে কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খাদ্যতালিকা সভ্যবর্গের রসনা তৃপ্তি করিত। ভোজন বিলাস এত বাড়িয়া যায় যে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রস্তাব করেন যে অধিবেশনে ভোজন বিস্তার রহিত করা হউক। কিন্তু সদস্যগণ তাহা সমর্থন করেন না, কেননা তাঁহাদের প্রতি এই সম্মেলন যেমন সাহিত্য, সংগীত, তবলা অনুশীলনের জন্য, তেমনই রসনা দপ্তর ইহার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইহা একাধারে Literary and Gastronomical Club ছিল। কোনও কোনও সদস্য বাহির হইতেও নানা সুখাদ্য বিশেষত মিষ্টান্ন আনিয়া পরিবেশন করিতেন। সুকুমারের আমন্ত্রণলিপি যে কেবল কবিতাতেই রচিত হইত তাহা নহে. কবিতাহীন ব্যাঙ্গচিত্রেও এরূপ লিপি প্রেরিত হইত। আমার বাড়ীর অধিবেশনের একটি ব্যঙ্গচিত্র এই সঙ্গে প্রদান করিলাম।

ছবিতে খাবার প্লেট হস্তে ও পাশে বাঁয়া তবলা যে লোকটির ছবি তাহার সহিত ক্লাবের অধিকারী শিশিরকুমার দত্তের আকৃতিগত মিল খুব বেশি।

গত ২৩-শে আষাঢ়ের সাময়িকীতে 'মনডে ক্লাব' নামক সভার যে বিশেষ দুইটি দিক কৌতুকরস ও ভোজনরস সম্পর্কে কিছু পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইয়াছি, তাহা হইতে এই সভার সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের কোন আলোচনা না থাকাতে

উহা ক্লাবটির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় হয় না। যে ক্লাবে সুকুমার রায়, অজিত কুমার চক্রবর্তী, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, অতুলপ্রসাদ সেন, কিরণশঙ্কর রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস নাগ, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রভৃতি বিদগ্ধজন সদস্য ছিলেন সেই সভা কেবলমাত্র লঘু আনন্দ পরিবেশন করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেন, চিন্তার খোরাক ও রসবোধ বৃদ্ধির অয়োজন করিবেন না, ইহা সম্ভবপর নয়। সভায় কত উচ্চশ্রেণীর আলোচনা চলিত, তাহার কিছু পরিচয় ক্লাবের প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক মুদ্রিত বিবরণী হইতে সেজন্য দেওয়া প্রয়োজনবোধে তাহা করিতেছি। আমার নিকট মুদ্রিত বিবরণ ছিল না, অন্যতম সদস্য ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের পুত্র শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ আমার লেখাটি পাঠ করিয়া প্রথম দুই বৎসরের বার্ষিক বিবরণী ক্লাবের প্রাথমিক সদস্যগণের আলোকচিত্র ও কয়েকটি আমন্ত্রণলিপি প্রেরণ করাতে তাহার সাহায্যে ক্লাবে কত গুরুত্বপূর্ণ বিচিত্র বিষয়ে আলোচনা চলিত তাহার ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে কিছু আলোকপাত সম্ভব হইল।

আমাদের ক্লাবের প্রথম বার্ষিক বিবরণী (আগস্ট, ১৯১৫—জুলাই ১৯১৬)-র মধ্যে 'আলোচিত বিষয়াদি' শীর্ষক অংশে নামের আদিবর্ণ অনুক্রমে সে তালিকা সন্নিবেশিত আছে, তাহা হইতে বাছিয়া কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিলে উহার বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব উপলব্ধির সহায়ক হইবে। প্রথমেই অজিতকুমার চক্রবর্তী যে সমস্ত বিষয় প্রবন্ধাদি পাঠ করেন, তাহার তালিকা আছে। তিনি ১৯১৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর হুইটম্যান ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তুলনামূলক এক মনোজ্ঞ আলোচনা উত্থাপন করেন ও তাহা পরবর্তী অধিবেশনে সমাপ্ত হয়। ওই বৎসর অজিতবাবু শেলী সম্পর্কে তিনটি প্রবন্ধ পাঠ ও রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকের উপর একটি আলোচনা উত্থাপন করেন। ওই বৎসর অতুলপ্রসাদ সেন নির্বাচিত কয়েকটি কবিতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অমলচন্দ্র হোম অস্কার ওয়াইল্ড সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। কালিদাস নাগ বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক ইতিহাস, কালিদাসের রঘুর দিগ্বিজয়ে ভূগোল ও মেঘদূতে ভূগোল সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী রামমোহন রায় অ্যাজ এ জুরিষ্ট, রামমোহন রায় অন রেভিনিউ অ্যাণ্ড জুডিসিয়্যাস সিষ্টেম, রামমোহনের সময়কার বাংলা দেশ, রামমোহন তান্ত্রিক ছিলেন কিনা, ক্রিমিন্যাল লজ অফ মনু, নীট্‌সে ও রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গ লইয়া একটি অধিবেশনে আলোচনা উত্থাপন করেন। সুকুমার রায় কেবল রসরচনা পরিবেশনে ক্ষান্ত থাকেন নাই। তিনি যে শিল্পকলা ও সৌন্দর্যতত্ত্বের একজন দিশারী তাহার পরিচয়স্বরূপ ওই বৎসর ক্লাবে দুইটি মনোজ্ঞ আলোচনা উত্থাপন করেন, যথা—এসথেটিক সুপারস্টিশন্‌স ফাংশন্স অব আর্ট। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ফাইললজি অ্যাজ এ সায়ান্স ও বর্ণমালা সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য পেশ করেন ও জার্মানি প্রত্যাগত দার্শনিক প্রবর ডক্টর শ্রীশচন্দ্র সেন একদিন নীট্‌সের দর্শন ও অপর দুদিন অয়কেনের দর্শন সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী সরল আলোচনা

করিয়া সকলকে তৃপ্ত করেন। এই তালিকা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে কত বিচিত্র বিষয়ে, কিরূপ গুরু বিষয়ে আলোচনা ততৎ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরিবেশন করাতে সদস্যবর্গের জ্ঞানের পরিধি বিস্তারে ক্লাব কত সহায়ক হইয়াছিল।

সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সৌন্দর্যতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি কত বিচিত্র বিষয় আলোচনা হইত। ইহা ব্যতীত রিপোর্টে আছে যে ওই বৎসর পনেরোবার সাধারণ জল্পনা ও গবেষণা, পূর্বানুবৃত্তি ও উপস্থিত প্রসঙ্গাদির আলোচনা, পাঁচবার সংগীতের আসর ও একবার উদ্যানযাত্রা (আলিপুর চিড়িয়াখানায়) হয়। এই উদ্যান-যাত্রায় সদস্যগণের যে গ্রুপফোটো তোলা হয়, তাহা এই সঙ্গে মুদ্রিত হইল। দ্বিতীয় বর্ষে আলোচিত বিষয়াদি হইতে জানা যায় যে, অজিতকুমার চক্রবর্তী শিল্প ও সাহিত্য, এ, ই-র কবিতা, ভাবী সাহিত্য সম্পর্কে জল্পনা কল্পনা, অতুলপ্রসাদ সেন চেষ্টারটনের ওয়ারশিপ অফ দি ওয়েলদি অমলচন্দ্র হোম কিপ্লিং-এর ব্যারাক রুম ব্যালাড, স্টোরি অফ প্রাণভক্ত ও বিদেশে বাঙালী জামোর, কালিদাস নাগ উড়িষ্যার প্রাচীন শিল্প, গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী বিবেকানন্দ ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও সাহিত্যে রূপক, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মোপাঁসার 'এ নাইট ইন স্প্রিন্‌গ', নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত তুর্গেনিভের নভেল, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'দি মার্চেণ্ট অ্যাড ভেনচারাস', প্রশান্তচন্দ্র মহালনবীশ 'ইফ পি দেন কিউ', শ্রীশচন্দ্র সেন 'নিওন্যাচারালিজম' এবং 'থটস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স' সুকুমার রায় স্বরচিত টাটকা নূতন সন্দেশ ও চলচিত্তচঞ্চরী পাঠ, 'ক্রিটিসিজম—ট্রু অ্যাণ্ড ফলস' ও রাস্কিনের 'মডার্ণ পেণ্টার্স', ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'ইতিহাসের ধারা' সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করিলে, তাহার উপর আলোচনা হয়। ইহা ব্যতীত নরবার জল্পনা কল্পনা, দুইবার সংগীতাদি, একবার ৪/৭/১৭ তারিখে রবীন্দ্র সংবর্ধনা ও ২৫/২/১৭ তারিখে অতুলপ্রসাদ সেনের লক্ষ্ণৌ শহরে প্রত্যাগমন উপলক্ষে বিদায় সংবর্ধনা ও একবার বরাহনগর ও একবার কোলাঘাটে উদ্যানযাত্রা হয়। কোলাঘাটে যাত্রা খুবই আনন্দ-প্রদ হইয়াছিল। ভোরবেলা স্টীমারে করিয়া কলিকাতা হইতে কোলাঘাট অভিমুখে যাত্রা, সারাদিন স্টীমারে আনন্দ উৎসব, আলোচনা, সংগীত ও ভুরিভোজনের পর অপরাহ্নে কোলাঘাটে অবতরণান্তে ডাকবাংলোতে পূর্ণিমা নিশিযাপনের এক সুন্দর অভিজ্ঞতা সদস্যগণের মনে বহুদিন পর্যন্ত জাগরূক ছিল। সে এক অবিস্মরণীয় উপলব্ধি যাহা বর্ণনা করার সাধ্য আমার নাই। জীবনে আমি বহু ক্লাবের সংস্পর্শে আসিয়াছি, এমন কি রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 'বিচিত্রা'-র সদস্য হইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, কিন্তু বলিতে দ্বিধা নাই যে মনডে ক্লাবের ন্যায় এত বিচিত্র এবং এত রসে ভরপুর কোনও ক্ল্যাব আমি আর দ্বিতীয় দেখি নাই, অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে সভার প্রাণ, সেই বিচিত্রায় পরিবেশিত রবীন্দ্রসৃষ্ট সাহিত্যের পরিবেশন ও রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য অভিনয় যে অতুলনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য ; উহা তুলনাতীত কিন্তু উহার রস পরিবেশন সীমিত, মনডে ক্লাবের ন্যায় বহুধা প্রসারিত নহে। সুকুমার রায়ের ন্যায় বিচিত্র প্রতিভার অধিকারীর পরিকল্পনায় যাহা সম্ভব হইয়াছিল

সেরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন যে খুবই কঠিন সন্দেহ নাই, তাই সুকুমারের অকাল বিয়োগে ইহার অবলুপ্তি অনিবার্য হইলেও বেদনাদায়ক সন্দেহ নাই। আজ ক্লাবের চব্বিশজন সদস্যের মধ্যে আমরা মাত্র সাতজন জীবিত আছি। আমি, অমল হোম, গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী, কালিদাস নাগ, জীবনময় রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও হিরণকুমার সান্যাল। তন্মধ্যে গিরিজাশঙ্কর ও অমল অত্যন্ত অসুস্থ। সুনীতিকুমার কালিদাস ও হিরণকুমার যদি তাঁহাদের স্মৃতি হইতে ক্লাবের অপ্রকাশিত অংশের প্রতি আলোকপাত করেন, তাহা হইলে একটি বিশিষ্ট সংস্থার পূর্ণতর পরিচয় বিস্মৃতির গহ্বর হইতে রক্ষা পায়।

এইবার আমি শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ প্রেরিত লিপি সমূহ হইতে কয়েকটি কৌতুককর বিষয় সম্পর্কে কিছু নিবেদন করিব। কবিতা ও চিত্রে আমন্ত্রণলিপিতে সুকুমার রায়ের যে নূতন পরিচয় দিয়াছি, এইবার গদ্যে রচিত আমন্ত্রণলিপির নূতনত্বের কিছু পরিচয় দিব।

কয়েকখানি বিচিত্র আমন্ত্রণলিপি

ক্লাবের তৃতীয় বার্ষিক জন্মোৎসবের আমন্ত্রণলিপি এইরূপ ছিল—

জন্মোৎসব ভক্তিবিনয়ভাবগদগদধূলিলুণ্ঠিতপ্রণতিপুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

আগামী ২১শে আগস্ট বুধবার আসন্ন গোধূলিলগ্নে শ্রীশ্রীক্লাবের তৃতীয় জন্মোৎসব উপলক্ষে মেয়ো হাসপাতাল ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের ইষ্টককুঞ্জে ভক্ত সমাগম ও প্রসাদ বিতরণ হইবে। মহাশয় উক্ত উৎসবক্ষেত্রে পদারবিন্দরজ অর্পণ করতঃ কীর্তন কোলাহলে যোগদানপূর্বক প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ভক্তমণ্ডলীকে ও এই দাসানুদাসকে কৃতকৃতার্থ করিবেন। ইতি

কৃতাঞ্জলি সেবকাধম

শ্রীশিশিরকুমার দত্তদাসস্য।

দ্বিতীয় বার্ষিক জন্মোৎসবের আমন্ত্রণলিপি আরও বিচিত্র। চিঠিতে তো একটি প্রতিবাদ সভা আহ্বান করিয়া সম্পাদক শ্রীশিশিরকুমার দত্তের বকলমে সুকুমার এই লিপিটি সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করেন। পত্রের বয়ানটি এইরূপ—সম্প্রতি ক্লাবের সর্বজনস্বীকৃত সম্পাদকরূপে আমি অধিকারী উপাধি গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে কোন কোন ঈর্ষাপরায়ণ সভ্য অসংগতভাবে আপত্তি করিয়াছেন। কালিদাস-বাবু আপত্তি করিতে চাহেন করুন, কিন্তু আমি স্বোপার্জিত উপাধি ছাড়িব না। এইপ্রকার অন্যায় আপত্তির বিশেষ প্রতিবাদ বাঞ্ছনীয়। অনেক হিসাব করিয়া দেখিলাম আগামী মঙ্গলবার, ২১শে আগস্ট, বাংলা তারিখ জানিনা, আমাদের ক্লাবের জন্মদিন অর্থাৎ প্রায় জন্মদিন। ঐদিনই সন্ধ্যার সময় ১০০নং গড়পাড় রোড, অর্থাৎ কালাবোবা ইস্কুলের পশ্চাতে সুকুমারবাবু নামক ক্লাবের একজন আদিম ও প্রাচীন সভ্যের বাড়ীতে সভার আয়োজন হইয়াছে। বক্তা প্রায় সকলেই, সভাপতি আপনি, বিষয় গম্ভীর সুতরাং খুব জমিবার সম্ভাবনা। আসিবার সময় একখানা সেকেণ্ড ক্লাস

গাড়ি সঙ্গে আনিবেন—আমায় ফিরিবার পথে নামাইয়া দিতে হইবে। খাওয়া গুরুতর হইবার আশঙ্কা আছে। ইতি

শ্রীশিশিরকুমার দত্তাধিকারী
সুযোগ্য সম্পাদক।

দ্বিজেন্দ্রবাবুর বাড়িতে এক বৈঠকের আমন্ত্রণলিপি এইরূপ—

সোমবার, ২২ এপ্রিল, ১৯১৮, সন্ধ্যা ৬৷৷ টা।

তবে 'রইল কথা',—
এবার
চাঁদিনী রাতে
মেয়োর ছাতে
গাঙের হাওয়ার
সঙ্গে গাওয়া;

সেথা
নাইকো বাধা
নাইকো আধা;
ভরাপ্রাণের ভরাপালে
সোমবার তরণীখানি
উজান স্রোতে
নেশায় মেতে
চলবে ছুটে দিক্ না মানি।

সম্পাদক মহাশয় নিরুদ্দেশের পর কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলে সুকুমার যে আমন্ত্রণলিপি প্রেরণ করেন তাহা শ্রীজীবনময় রায় আমাকে দিয়াছেন। তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

ভেবেছিনু গেছে গেছে
ভেবেছিনু নাই সে।
দাড়ি নেড়ে চাঁদা চায়
আষাঢ়ে তেইশে।

কৌতুক সৃষ্টি করিতে সুকুমার রায়ের অসামান্য দক্ষতার সামান্য কিছু পরিচয় 'মনডে ক্লাব' সম্পর্কে প্রবন্ধ দুইটি দিলেও একথা নিঃসংশয়ে সত্য যে, তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত

অসামান্য কীর্তি গৌরবের অনেক কথাই অনালোচিত রহিয়া গেল ; বিশেষত সৌন্দর্য তত্ত্বে তাঁহার গভীর অনুপ্রবেশ, সুকুমার কলা সম্পর্কে সংবেদনশীল সমালোচনা ও চিত্রাংকনী প্রতিভা এবং দর্শন ও ভগবদ তত্ত্বে গভীর অনুপ্রবেশ বিষয়ে কিছুই বলা হয় নাই। জীবন দর্শনের সেই সুগভীর উৎসের কিছু পরিচয় ব্যতীত মানুষটিকে ঠিক বুঝা যায় না। এইসব সদ্‌গুণরাশির জন্যই তিনি ব্রাহ্ম যুবকগণের অবিসংবাদিত নেতা হইয়াছিলেন এবং নিজের চারিপাশে নানা সম্প্রদায়ের নানাগুণের আধার বিবিধ ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহারই সামান্য একটু পরিচয় হইল আমাদের এই মনডে ক্লাব। পাদপীঠের সম্মুখে আসিতে বরাবরই তাঁহার সংকোচ ছিল ; তবে শিশু ও কিশোরগণ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল বলিয়া তাহাদের বিস্মৃত হইতে পারেন নাই ; তাহাদের মনে অনাবিল আনন্দরস পরিবেশনের জন্য আপনার প্রতিভাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন বলিয়াই বাঙ্গলার শিশু সাহিত্য আবোল তাবোল ঝালাপালা চলচিত্তচঞ্চরী লক্ষ্মণের শক্তিশেল প্রভৃতি দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে এ বিষয়ে বাঙ্গলা সাহিত্য ইংরেজী শিশু সাহিত্য অপেক্ষা যে ন্যূন নহে তাহার জন্য সুকুমারের দান অনেকখানি।

□ প্রবন্ধটি ১৩৭০ সনে প্রকাশিত হয় যুগান্তরে। প্রবন্ধটি শ্রী পার্থ বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

